বইমেলা সংখ্যা ১৪১৯

সন্দেশ

সম্পাদক সন্দীপ রায়

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - জয়ন্ত কর্মকার
স্ক্যান করেছেন - শুভায়ন দত্ত
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com

Surprisingly jute
the indian fibre

Classical Packaging

Designer Fabrics

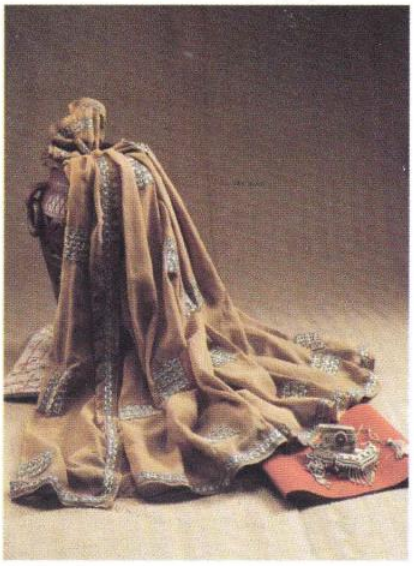

Jute Reinforced Composites

Lifestyle Jute Products

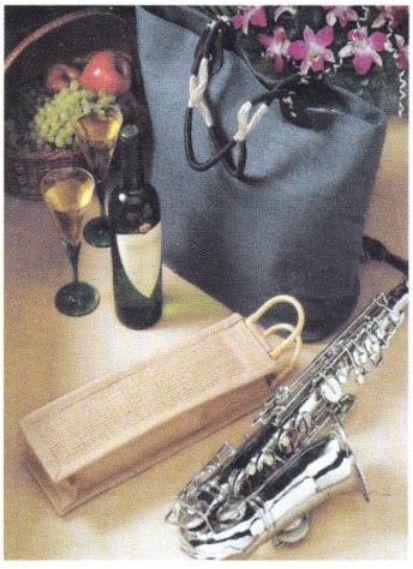

Geo-textiles

discover jute

NATIONAL JUTE BOARD

Ministry of Textiles, Govt. of India
3A&B, Park Plaza, 71 Park Street, | Kolkata - 700 016
Ph : 91 33 2226-3438/2217-2107 | Fax : 91 33 2217-2456
Email :jute@njbindia.com
Website : www.jute.com | www.njbindia.com

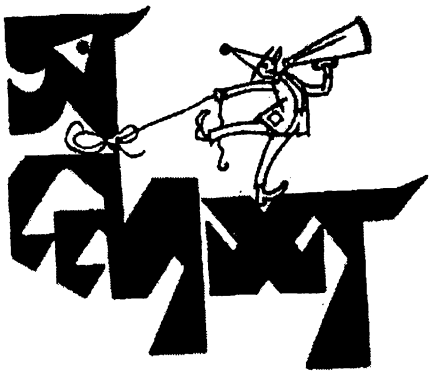

বইমেলা সংখ্যা

তৃতীয় পর্যায় ● বর্ষ-৫২

নভেম্বর ২০১২ - ফেব্রুয়ারি-২০১৩ ● কার্তিক- মাঘ -১৪১৯

বিশেষ আকর্ষণ

জাদু সম্রাট / অমিতাভ চৌধুরি ৩

'যাদুসম্রাট'/ পি. সি. সরকার (জুনিয়র) ৪

ছোটদের বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / পিনাকী ঠাকুর ৯

বোনবিবি / শানু লাহিড়ী ২৬

ধারাবাহিক উপন্যাস

বুরুন্ডির সবুজ মানুষ / হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত ১৫

নীল পাথর / শুভ্র দত্ত ৩৪

পেন ড্রাইভ রহস্য / অনির্বাণ বসু ৫৫

গল্প

ব্ল্যাক ফ্রাইডে / দীপক মুখোপাধ্যায় ৩০

ম্যাঙ্গো ট্রি / স্বাতী চট্টোপাধ্যায় ৫১

মেসি, রোনাল্ডো আর শরৎশশী স্মৃতি ফাইনাল/ দেবাশিস সেন ৭১

আয়রে পাখি লেজঝোলা / উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯

লোলো ডাকাত / সঞ্জয় সাহানা ৮২

কাকস্য বেদনা/ তাপস মৌলিক ৮৫

চাঁদির টাকা / সুনির্মল চক্রবর্তী ৯১

ছায়াবতী / সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৩

প্রবন্ধ /ফিচার

উটের সঙ্গে ওঠা বসা/ প্রসাদরঞ্জন রায় ১০

পিসার টাওয়ার কি হেলেই থাকবে? / মনোজ ঘোষ ৪৬

মৌটুসী খুব খুশি / ধীরা পালিত ৪৮

ছড়া কবিতা

রবিশঙ্কর / প্রণব মুখোপাধ্যায় ৮

রূপান্তর / পার্থ সিন্‌হা ২৯

গাঁয়ের কথা / বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী ২৯

তালেগোলে / সংঘমিত্রা কর ৫৪

দুইবন্ধু / অমলকান্তি ঘোষ ৫৪

জাদু বাস্তবতা / শান্তি সিংহ ৭৭

নির্দোষ/ শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৭

আঁকন বাঁকন / শৈলেনকুমার দত্ত ৭৮

বদল / মহুয়া ভট্টাচার্য গোস্বামী ৭৮

বইমেলার চিঠি ১৪

কার্টুন

মাছধরা / ঋতুপর্ণ বসু ২৫

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

প্রকৃতি পড়ুয়াদের সঙ্গে দিনভর দাবুতে / জীবন সর্দার ৮৭

বই চেনো ৮৯

চিঠিপত্র ৯৬

পাদপূরণ

জেনে রাখা ভালো / বিমল দেব ৪৫, ৬৯, ৭৬

প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক : সন্দীপ রায়

সহ-সম্পাদক : প্রণব মুখোপাধ্যায়

ছবি এঁকেছেন : শানু লহিড়ী, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত দত্ত ও রাহুল মজুমদার

সন্দেশ কার্যালয়-১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০২৯ থেকে সন্দীপ রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রী জগন্নাথ প্রিন্টার্স কলকাতা -৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত

স্বত্বাধিকারী - সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড

যোগাযোগ : ১৯, বিপিন পাল রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৬ মো : ৯৮৩৬২৫০৮২৯

জাদু সম্রাট

অমিতাভ চৌধুরি

পি সি সরকার সিনিয়র
বাড়ি ছিল টাঙাইল
দুনিয়াভর ঘুরলে তবু
ষোল আনা বাঙাইল।
জাপান গিয়ে ভোজবাজি
হলেন পুরো অদৃশ্য
দুনিয়া জোড়া নামের মালিক
ভোজবাজিতে অবশ্য
গণপতির শিষ্য ছিলেন
নিজেই শেষে গণপতি
জাদুসম্রাট হয়ে রইলেন
লহ মোদের প্রণতি।

‘যাদুসম্রাট’

পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

সকালে উঠিয়া দেখি টক্‌টকে লাল,
যেন প্রকাণ্ড বড় এক মুসুরীর ডাল।

—সুনির্মল বসু

সকালে যখন সূর্য ওঠে আর তার আলো জানালা দিয়ে এক জায়গায় এসে পড়ে, সেখানে দাগ রেখে যায়, যত সময় গড়িয়ে যায় দাগটা নিজে থেকেই সরে যায়। এটাকেই ম্যাজিক মনে হত ছোটোবেলায়।

খুব ছোটোবেলা থেকে, বলতে গেলে জন্মে থেকেই, ম্যাজিক দেখছি। ম্যাজিকটা আমার কাছে আলাদাভাবে আকর্ষণের বিষয় নয়।

ছোটবেলায় যে-বাবাকে দেখেছি অর্থাৎ বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর পি.সি. সরকারকে (প্রতুলচন্দ্র সরকার) তাঁকে ঘিরে আমার দুটো অনুভূতি ছিল—আমার বাবার দুটো রূপ। একজন আমার বাবা, অন্যজন পি. সি. সরকার। বাবাকে ভয় পেতাম কারণ সেই বাবা ধমক দিতেন পড়তে না বসার জন্য, অর্থাৎ সেই বাবা নর্মাল বাবা। অন্যজন পি.সি. সরকার, তাঁকে ভয় পেতাম না। তাঁর জন্য আমার গর্ব ছিল, ম্যাজিক যতই মিরাক্‌ল মনে হোক না কেন, জানতাম বাবা তো পারবেনই। আমি ছিলাম নির্বোধ নাম্বার ওয়ান। কোনও বোকামির জন্য বাবা হয়তো আমার কান ধরেছিলেন। আজও ভুল করে কানে হাত দিয়ে ফেলি, ফেলেই বুঝি কান-ধরা সেই হাতটি নেই।

আমাদের বাড়ির পরিবেশে ছোটো থেকেই অনেক কিছু শেখা হয়ে যেত। ছবি আঁকা, গান গাওয়া, ভাষণ দেওয়া, সেই সঙ্গে প্রকৃতিগত রসবোধ অর্জন।

মনে পড়ে অল্প বয়সেই আমি আর আমার সমবয়সি বন্ধুরা মিলে একটা মজার ম্যাগাজিন বের করে ফেলেছিলাম। নাম—‘হিস্টিরিয়া’, সম্পাদক শচীন ভট্টাচার্য যাকে আমরা বলতাম ‘উন্মাদশ্রী’। কাগজের ওপর লেখা, সম্পাদক ভিন্ন সবাই নগণ্য। তাতে কার লেখা মনে নেই, ডিটেকটিভ গল্পে ছিল রোমহর্ষক বর্ণনা—নিঝুম রাত একটা, পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনবার ঘণ্টা বাজল, ডিটেকটিভ দু-হাতে বন্দুক ও এক হাতে টর্চ নিয়ে অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে...।

ম্যাজিক নিয়ে ঘাঁটতে গিয়ে বই লিখে ফেললাম একটা—‘ম্যাজিক ম্যাজিক’! ১৩৭৪ সালের ২৪শে আষাঢ় রথযাত্রার দিন সেটা ছেপে বের করা হল আমাদেরই ইন্দ্রজাল পাবলিকেশন থেকে। দাম রাখা হল পাঁচ টাকা। সেই বই নিয়ে বাবার কাছে গেছি, বাবা চশমার ফাঁক দিয়ে দেখলেন সেই বই, তারপর বইটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফেলে রেখে গম্ভীরভাবে বললেন, ‘পড়তে যাও।’ পরে মায়ের কাছে শুনেছি, বাবা বই দেখে খুশি হয়েছিলেন, লাইন বাই লাইন পড়েছেন।

আমার পরের বই—কেমিক্যাল ম্যাজিক। ১৩৮১ সালে বাংলার নববর্ষে বেরিয়েছিল বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে। বাবার প্রথম বই—ছেলেদের ম্যাজিক, প্রকাশিত হয়েছিল এ. মুখার্জি থেকে।

স্টেজে অনেকদিন আগে থেকেই বাবার সাগরেদি করেছি। বেশ কিছু ম্যাজিক আমার আয়ত্তে ছিল। পণ করেছিলাম বাবার চেয়ে বড়ো কিছু করে দেখাব। ১৯৬৯ সালে বাক্সবন্দি অবস্থায় ডায়মন্ড হারবারের কাছে বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাবার খেলাটা দেখাই।

খেলা দেখানোটা বাবার কাছে গোপন রেখেছিলাম। কেননা, জানতাম বাবার অনুমতি পাওয়া যাবে না। মা কিন্তু সব জানতেন। আশ্চর্য মানুষ আমার মা—বলেছিলেন, ‘যদি তোমার আত্মবিশ্বাস থাকে তাহলে যতই বিপজ্জনক হোক কাজটা করো। না হলে মরো।’ দু-একদিন আগে যখন বাবা জানতে পারলেন তখন তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি রইল না। মা-কে বললেন, ‘ওকে তুমি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছ?’ মা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘ওর আত্মবিশ্বাস আছে,

ও পারবে।' বাবা আর আপত্তি করতে পারলেন না। আপত্তি করলেও ব্যাপারটা থেমে থাকত না, কারণ ততদিনে প্রস্তুতি সব শেষ। অবশেষে সেই দিনটা এসে গেল। শুনেছি সেদিন শুরুর থেকে বাবার উদ্বেগের সীমা ছিল না, বার বার ঘর বার করছেন। অল ইন্ডিয়া রেডিও একটা নিউজ রিভিউ করেছিল, আমার ছোড়দি সেটা শুনেছিল। শুনে বাবাকে জানায় প্রদীপ পেরেছে। আসলে আমার চ্যালেঞ্জ ছিল ৯০ সেকেন্ডের মধ্যে আমি সিল করা বাক্সটা থেকে বেরিয়ে আসব, অবশ্য তার আগেই আমি বেরিয়ে আসি। যখন আমি বাড়ি ফিরছি, দেখি বাবা একটা মালা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল এক ধাক্কায় বাবার কাছে গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেছি।

আমার বাবা পারতেন না এমন কোনও কাজ নেই। কবিতা লিখতে পারতেন, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি—সবই লিখতেন। ম্যাজিক নিয়ে ওঁর অজস্র লেখা আছে। আর ম্যাজিশিয়ান কেমন ছিলেন—সেটা এখনও লোকে বলে থাকেন। ওঁকে মাপতে গেলে একটা কাল্পনিক মেজারিং টেপ লাগবে। রূপকথা যতদিন থাকবে, কল্পনা যতদিন থাকবে—পি.সি. সরকারও ততদিন থাকবেন। তিনি মারা যাবার পর অনেকে বলেছিলেন, এটাও একটা ম্যাজিক! কেউ কেউ বলেছিলেন, উনি গ্রহান্তরে গেছেন ম্যাজিক শিখতে, শিখে আসতে দেরি হচ্ছে ভাষা না বোঝার জন্য। অথচ যখন বেঁচে ছিলেন তখন সরকারের কাছ থেকে কোনও স্বীকৃতি আসেনি। 'ভারতরত্ন' পেতে পারতেন, পাননি। বিপরীতে বলা যায় তাঁকে হাতে করে দেবার মতো লোক জন্মায়নি। ওঁর শতবর্ষ চলছে, তারই বা স্বীকৃতি কোথায়? শুধু ডাকবিভাগ স্মারক সম্মান জানিয়েছে। মাত্র উনিশ বছর বয়সে কলকাতায় চলে আসেন। আমাদের আসল বাড়ি পূর্ববঙ্গের টাঙ্গাইলে। পূর্ববঙ্গের লোক হওয়ায় তাঁকে কলকাতা শহরে এসে অনেক অসম্মান, অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। উনি ম্যাজিক দেখাতে অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন, সেখানে প্রেক্ষাগৃহে একটানা ম্যাজিক দেখানোর রেকর্ড ভাঙছে। এদিকে কলকাতায় পাড়ার মন্দ লোকেরা তাঁর নতুন কেনা গাড়িটা ভেঙে দিয়েছে।

বাবাকে ঘিরে আমার অনেক স্মৃতি। একটা কৌতুককর ঘটনা শোনাই। আমাকে আর ওঁর সহকারী মাধববাবুকে নিয়ে বাবা গেছেন বড়বাজারে মনোহরদাস কাটরায় পুজোর কাপড়চোপড় কিনতে। বাবার টাকাপয়সা একটা হ্যান্ড ব্যাগে থাকত। যেখানে যেতেন সেটা সঙ্গে যেত। যাই হোক, উনি দোকানে কাপড় দেখছেন, বাছাই করছেন। ব্যাগটা রেখেছেন দোকানের ফরাসের ওপর, সেটা মাঝে মাঝে কাপড়ে চাপা পড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল একটা লোক দোকানে এসেছে, বেশ সন্দেহজনক হাবভাব—

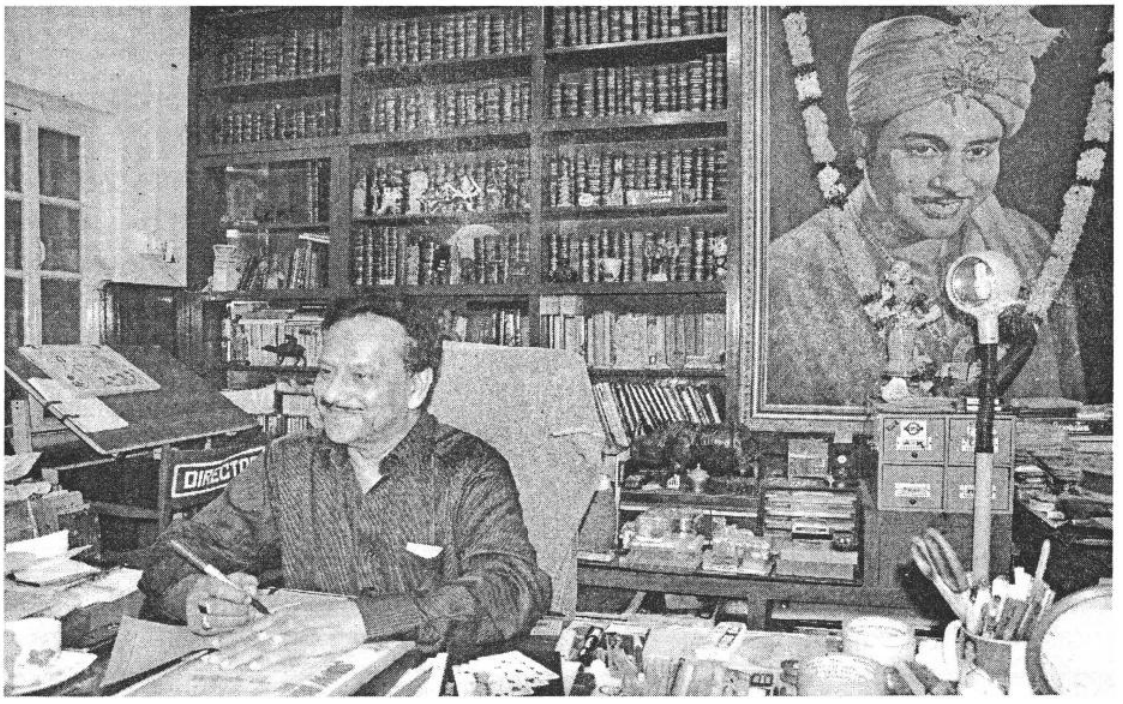

চোরছ্যাঁচোড় হতে পারে। আমি আর মাধববাবু দু-জনেই বাবার টাকার ব্যাগটার ওপর থেকে নজর সরাচ্ছি না। হঠাৎ সেই লোকটাই আমাকে ডাকল, আস্তে আস্তে বলল, 'উনি কি পি. সি. সরকার? আমি ওঁর ফ্যান...আমি একজন পকেটমার। ওঁকে আমি চিনে ফেলেছি, কিন্তু আমার বন্ধুরা তো চেনে না, কাজেই টাকার ব্যাগটা ওঁকে সাবধানে রাখতে বলুন।'

এ-রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল নিউ মার্কেটের কাছে। বাবা সেখানে গিয়েছেন গাড়ি করে। তারপর গিয়েছেন মার্কেটের ভেতর আর গাড়িটা বাইরে রাখা। গাড়ির কাচ ভেঙে সিটের ওপর রাখা বাবার অ্যাটাচি গায়েব! বাবা এসে ড্রাইভারকে বকাঝকা করতে লাগলেন—কেন সে গাড়ির বাইরে ছিল? যাইহোক, তারপর বাড়ি ফিরে এসেছেন। ঘণ্টাখানেক পর ফোন—যিনি ফোন করছেন তিনিই অ্যাটাচিটা চুরি করেছেন বলে জানালেন। অ্যাটাচিটা খুলে দেখেছেন টাকা ও বেশকিছু দরকারি কাগজপত্র আছে। টাকাটা উনি নিয়েছেন। কিন্তু যাঁর কাগজপত্র তাঁর অর্থাৎ পি.সি. সরকারের অসুবিধা হতে পারে ভেবে কাগজগুলো আমাদের বাড়ির লেটার বক্সে রেখে গেছেন। সত্যিই সেগুলো বাড়ির লেটার বক্সে পাওয়া গেল।

বাবাকে নিয়ে দারুণ একটা ঘটনা ঘটেছিল আসামের পাণ্ডুতে। ঘটনাক্রমে সেই ঘটনার সঙ্গে আমিও জড়িত ছিলাম। স্টেজে একটা ম্যাজিক ছিল—অন্ধকার মঞ্চে ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা ঘটতে থাকবে। তারমধ্যে ম্যাজিসিয়ান উধাও হয়ে যাবেন স্টেজ থেকে। পরমুহূর্তেই প্রেক্ষাগৃহের পিছন দিয়ে তিনি 'হেয়ার আই অ্যাম' বলে প্রবেশ করে দর্শকদের চমকে দেবেন। আসলে মঞ্চে খানিকটা সময় বাবার এক সহকারী বাবা সেজে ম্যাজিক দেখাতেন, ইতিমধ্যে বাবা চলে যেতেন মঞ্চের ও প্রেক্ষাগৃহের বাইরে, তারপর সুযোগ ও সময়মতো পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে আসতেন হলের মধ্যে।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা আমি কোনও কারণে হলের কাছাকাছি একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, জায়গাটা আধো আলো আধো অন্ধকার। কানে এল তিন-চারটি যুবকের আলোচনা— কোনও ভাবে ওরা বুঝতে পেরেছে আসল পি.সি. সরকার এই পথদিয়ে হেঁটে এসে প্রেক্ষাগৃহের পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকেন। ওদের মতলব আসল পি.সি. সরকারকে হলে ঢুকতেই দেবে না সেই সময়, জোর করে ওঁকে আটকে রাখবে। শুনে আমার চক্ষুস্থির! তৎক্ষণাৎ বাবাকে সব গিয়ে জানালাম, তাতে বাবার মনে কোনও ভাবান্তরই দেখলাম না। কিন্তু আমার মন থেকে ভীতি দূর হল না। নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ বাবা যখন ওই পথ হেঁটে অতিক্রম করে প্রেক্ষাগৃহে ঢোকেন ঠিক তার আগেই আমি একটা চাদর মুড়ি দিয়ে ওই রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে শুরু করলাম। আমার প্ল্যানটা খেটে গেল। লুকিয়ে থাকা ওই লোকগুলো আমাকে আসল পি.সি. সরকার ভেবে নিয়ে ঝপ্ করে আমাকে জাপটে ধরে কাছের একটা নির্জন জায়গায় নিয়ে গেল, আমি টুঁ-শব্দটি করতে পারলাম না। কিন্তু এই বিপদের মধ্যেও চোখে পড়ল বাবা নির্বিবাদে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকে গেলেন। লোকগুলো একটু পরেই জানতে পারল আসলে ম্যাজিসিয়ান বন্দি হননি, উনি মঞ্চে যথাসময়ে ফিরে এসেছেন এবং খেলা দেখাতে শুরু করে দিয়েছেন। তখন লোকগুলো ভাবতে লাগল— কাকে ওরা আটকে রাখল? তবে কি কোনও ভৌতিক কাণ্ড! ভয়ে ওরা আমাকে ফেলে দে চম্পট! তারপর বাবাকে গিয়ে আমি সব জানালাম। এইভাবে বাবাকে সেবার একটা মস্ত বিপদ থেকে বাঁচাতে পেরেছিলাম।

জাপানে 'এক্স-রে আইজ্'-এর খেলা দেখাবার সময় আবার একটা মুশকিল হয়েছিল। এক জাপানি দর্শক মঞ্চে এসেছেন, বোর্ডে অঙ্কের ফরমুলা লিখেছেন, বাবা বুঝতে না পেরে আমাকে বাঙাল ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ল্যাখ্সে?' আমি মৃদু স্বরে বাঙাল ভাষাতেই উত্তরটা বলে দিলাম।

আর একটা মজার ঘটনা বলি—বাবা বাড়ির অফিস ঘরে বসে আছেন, 'দলে মহিলা সহকারী চাই' বলে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, তার ইন্টারভিউ নেবার জন্য। সাক্ষাৎপ্রার্থীরা বাইরে অপেক্ষা করছেন। এমন সময় এক সুন্দরী মহিলা বাবার অফিস ঘরে ঢুকলেন, বাবা তাঁকে দেখে গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

ভদ্রমহিলা বাবার গাম্ভীর্য দেখে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছেন। বাবা তখন জিজ্ঞাসা করছেন, 'হাইট কত? বিবাহিত কি না?' ভদ্রমহিলা ঘাড় নাড়তে বাবা বললেন, 'আমরা অবিবাহিত মহিলা চাই।' ভদ্রমহিলা কোনওমতে বেরিয়ে গেলেন। পরে জানা গেল যিনি এসেছিলেন তিনি স্বয়ং সুচিত্রা সেন, তাঁর বাড়ির লক্ষ্মীপুজোয় বাবাকে নিমন্ত্রণ করতে নিজেই এসেছিলেন।

লক্ষ্মীপুজোর দিন উত্তমকুমারের বাড়িতেও বাবার নিমন্ত্রণ থাকত। প্রসঙ্গত বলি—অনেক গুণী, নামকরা লোকেরা এ-বাড়িতে এসেছেন বাবার কাছে, বাবাও যেতেন ওঁদের কাছে। কবি সুনির্মল বসু, শিল্পী রেবতীভূষণ, ধীরেন বল, শৈল চক্রবর্তী, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা বাবাকে নিয়ে কেউ লিখেছেন, কেউ ছবি এঁকেছেন।

বিখ্যাত যাদুকর গোগিয়া পাশা একবার রঙ্গি সিনেমায় ম্যাজিক দেখাচ্ছেন, বাবা দর্শকাসনে বসে খেলা দেখছেন। লিংকিং রিং-এর খেলা দেখাতে গিয়ে গোগিয়া পাশা রিংগুলো দর্শকদের কাছে পরীক্ষা করিয়ে নিতেন। বাবাকে দেখতে পেয়ে একটা রিং হাতে দিয়ে বললেন—এবার স্বয়ং জাদুকর পি.সি. সরকারকে দিয়ে রিং পরীক্ষা করিয়ে নিতে চান। রিং-এর মধ্যে কলাকৌশল আছে বাবা তা জানেন। কিন্তু ভালো করে দেখে বাবা বললেন, 'না, রিং ঠিকই আছে।' তারপর সেটা ফেরত দিলেন গোগিয়ার হাতে। আসলে বাবা কখনই চাননি নিজে জাদুকর হয়ে আর একজন জাদুকরকে অপদস্থ করতে।

আর একটা ঘটনার কথা বলি যাতে স্বয়ং পি.সি. সরকারের জীবনে যবনিকা নেমে আসতে পারত। সেটা এক মারাত্মক রেল দুর্ঘটনা, যাতে অনেক জীবনহানি ঘটেছিল। বাবা গিয়েছিলেন এক বিচিত্রানুষ্ঠানে জাদু প্রদর্শন করতে মাঝদিয়ায়। আরও শিল্পীরা আছেন। ফেরার সময় স্টেশনে এসে দেখেন ট্রেনে বিশেষত সেকেন্ড ক্লাস কামরায় প্রচণ্ড ভিড়। বাবার সঙ্গে দু-তিনটি লম্বা বাক্স, তাতে ম্যাজিকের সরঞ্জাম রয়েছে। বেগতিক দেখে বাবা আর অসিতবরণ, যিনি ফিল্মের অভিনয়ে আসার আগে পেশায় তবলচি ছিলেন, গানও গাইতেন, তাঁরা দু-জনেই একটা থার্ডক্লাস কামরায় গিয়ে উঠলেন। অন্য শিল্পীরা থার্ড ক্লাসে উঠতে রাজি হলেন না। সেই ট্রেনটাতেই দুর্ঘটনা ঘটল। বিশেষত সেকেন্ড ক্লাস কামরার অনেক যাত্রী মারা গিয়েছিলেন। ধাক্কা যখন লাগে তখন বাবা আর অসিতবরণ কামরা থেকে ছিটকে পড়েছিলেন কিন্তু সামান্য চোট লেগেছিল মাত্র। ব্যাপারটা ওপরওয়ালার ম্যাজিক ছাড়া আর কী বলব?

বাবা আমার প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা, আমার 'পি.সি. সরকার, জুনিয়র' নামটাও বাবার দেওয়া। বাবা চেয়েছিলেন এই পি.সি. সরকার নামটা তাঁর মৃত্যুর পরেও যেন থেকে যায়। আমাদের তিন ভাইয়ের নামকরণটাও সেই ভেবেই করা। আমি প্রদীপ চন্দ্র সরকার, দাদা প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার (মানিক সরকার নামে বিখ্যাত), ভাই প্রভাস চন্দ্র সরকার এখন পি.সি. সরকার ইয়ং নামে জাদু প্রদর্শন করছে। আসলে ও প্রশিক্ষিত নৃত্যশিল্পী। ওর ছেলে পৌরুষও পি.সি. সরকার নামে ম্যাজিক দেখিয়েছে। আমার মেয়েরা সবাই ম্যাজিক জানে। কিন্তু জাদুকে অবলম্বন করেছে মানেকা। মুমতাজ এবং মৌবনী অভিনয়ে গিয়েছে। মুমতাজ কিন্তু যথেষ্ট ভালো বক্সার ও রোয়ার, মৌবনী ভালো ওড়িশি নাচের শিল্পীও।

আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে একটা—ম্যাজিক ইউনিভার্সিটি করার। সম্ভবত ত্রিপুরায় সেটা করব। তার জন্য চাই উন্মুক্ত প্রকৃতি—মেঘ, গাছ, পাহাড়, ঝরনা সব মিলিয়ে একটা ম্যাজিকল্যান্ড, যেখানে অসম্ভবকে সম্ভব করা হবে।

বাবা চেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরও যেন ম্যাজিক চলতে থাকে। জাপানে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর আমি 'পি.সি. সরকার' নামক মহীরুহের ছায়ায় সেই ম্যাজিক করে যাচ্ছি। অর্থাৎ ম্যাজিক বন্ধ হয়নি, তা চলছে এবং চলবে।

অনুলিখন : বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়

ফোটো : দেবাশিস সেন

রবিশঙ্কর

প্রণব মুখোপাধ্যায়

তারগুলি তো বাঁধাই ছিল চিকন কাঠের বুকে
আঙ্গুলগুলি খেলে বেড়ায় কি যে পরম সুখে!
চরাচরে উঠল কাঁপন কিসের সে ঝংকার—
সুর উঠেছে সুর উঠেছে, মৌন থাকো আর
দেখবে হৃদয় পাবে সবার বিশ্বলোকে ছুটি
অনন্তে লীন হতে সবাই লাগায় হুটোপুটি।
স্রষ্টা তখন বুঁদ হয়েছেন আঙুলে আর তারে
থরথরিয়ে কাঁপছে ভুবন সুরের সে ঝংকারে।
মৌনমুখর স্রষ্টা যখন উথাল পারাবার
চিকন কাঠের বুকে হঠাৎ ছিন্ন হল তার।
রক্তঝরা অঙ্গুলি তাঁর, এলিয়ে পড়েন ঘুমে
সুর তবু তাঁর খেলে বেড়ায় এই মাটিকে চুমে।
সবার বুকে অনুরণন ইমন বেহাগ গীতে
তরঙ্গ তার বাজবে সবার মনের পৃথিবীতে।

ছোটোদের বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পিনাকী ঠাকুর

এমনিতে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মেলামেশা করতেন প্রধানত তরুণ কবি লেখকদের সঙ্গে রবিবার তাঁর বাড়িতে, সকালবেলায়, নিয়মিত ছিল যাঁদের সমাগম— তাঁরা বয়সে সুনীলদার থেকে অনেক ছোটো। রবিবারের আড্ডাতেও দেখেছি, একেবারে ছোটো কিশোর-কিশোরীরা দেখা করতে এসেছে তাঁর সঙ্গে। কেউ সই নিতে চায় বইতে, কেউ একবার তাঁকে একটু চোখে দেখতে চায়। তাদের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা ছিল সুনীলদার, বাড়িতে কেনা থাকত দামি চকোলেট, সবাইকে উপহার দিতেন। নিজের নতুন বই

উপহার দিতে দেখেছি অনেক ছোট্ট পাঠককে। তাদের মুখের হাসি সুনীলদাকে উজ্জীবিত করত। মনে পড়ছে, তাঁর চলে যাবার পর, তাঁরই একটা কবিতার লাইন— 'হে কিশোর, একা একা খেলা হল প্রিয়?'

কলকাতা বইমেলায় 'কৃত্তিবাস'-এর স্টলে রোজ সন্ধ্যেবেলায় আসতেন সুনীলদা। স্টলের বাইরে ঘাসের ওপর পাতা চেয়ারে বসতেন। তাঁকে ঘিরে ভিড় জমে যেত কিশোর-কিশোরী পাঠকদের। যাঁরা এককালে ছিলেন কিশোর বা কিশোরী পাঠক, এখন পরিণত; তারা সঙ্গে নিয়ে আসতেন নিজেদের ছোটো ছেলেমেয়েদের। সুনীলদার সঙ্গে ছোটোদের ছবি তোলার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। গত বছর বইমেলায় এক কিশোর পাঠক তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সামনের বছর কাকাবাবুর অভিযান কোন দেশে হবে?' সুনীলদা তাকে বলেছিলেন, 'তাই তো! তুমিই বলো না, কাকাবাবুকে কোথায় পাঠানো যায়?' সে চুপ করে আছে দেখে, তার বাড়িয়ে দেওয়া অটোগ্রাফ খাতায় নিজের ফোন নাম্বার লিখে বলেছিলেন, 'বেশ, ভেবেচিন্তে বরং আমাকে একটা ফোন করে দিয়ো। আমি কাকাবাবুকে জানিয়ে দেব!'

একবার এক কিশোরী একটা বাংলা বাইবেল কিনে তাঁকে দিয়ে সই করাতে এল বইমেলায়। সুনীলদা বললেন, 'এটা তো ভগবানের বই, তাঁকে দিয়ে সই করাতে হবে। আমি কী করে সই করব?' মেয়েটি দু-এক মিনিট পর তাঁকে বলল, 'ভগবানকে কোথায় পাব?' সেবার 'কৃত্তিবাস'-এর স্টলের উলটো দিকে ছিল ইংরেজি বইয়ের প্যাভিলিয়ন। সুনীলদা আঙুল তুলে বললেন, 'দ্যাখো, ওইদিকে কোনও স্টলে হয়তো বইয়ে সই দিচ্ছেন তিনি!' তারপর, কারও কাছ থেকে একটা সাদা কাগজ চেয়ে নিয়ে মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করে তাকে শুভেচ্ছা লিখে দিলেন।

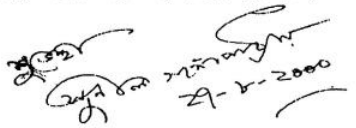

ছোটোদের যেমন ভালোবাসতেন তিনি, ছোটোরাও তাঁর কাছে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। একবার আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন সুনীলদা, বছর তিনেকের এক শিশু তাঁর কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। শিশুটির মা তাকে বলছেন, 'বল, কবিতাটা, সুনীলদাকে বল।' শিশুটি নার্ভাস। সুনীলদা তাকে একটা মিষ্টি দিয়ে বলেছিলেন, 'আগে এইটা খেয়ে নাও। তাহলে গায়ে জোর হবে—কবিতা বলতে পারবে!' বাচ্চাটা শেষ পর্যন্ত কবিতা বলতে পারেনি— কিন্তু সুনীলদার কোলে বসে ছবি তুলিয়েছিল। তুলেছিলেন তার মা। যেখানে গেছেন সুনীলদা, অনুষ্ঠানে কিংবা কারও বাড়িতে —ছোটোরা ছুটে আসত তাঁর কাছে। নানা বয়সের শিশুদের সঙ্গে নিজেও শিশু হয়ে হই হই করতেন সুনীলদা। তাই তো লিখতে পেরেছেন সন্তু, জোজো, দেবলীনা — আরও অজস্র শিশু-কিশোর চরিত্র।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'সন্দেশ'-এর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। ভারী সুন্দর সব গল্প লিখেছেন 'সন্দেশ'-এ। 'মায়াবন্দরের ঐরাবত', 'ভরত দাসের গণ্ডার', 'ক্ষতিপূরণ', 'ইষ্টিকুটুম' ইত্যাদি আরও অনেক গল্প আমরা ভুলতে পারি না।

এ বছর শারদীয়ায়, কাকাবাবুর শেষ উপন্যাসের সমাপ্তিতে কাকাবাবু সন্তুর চুল এলোমেলো করে দিয়েছেন পরম স্নেহে।

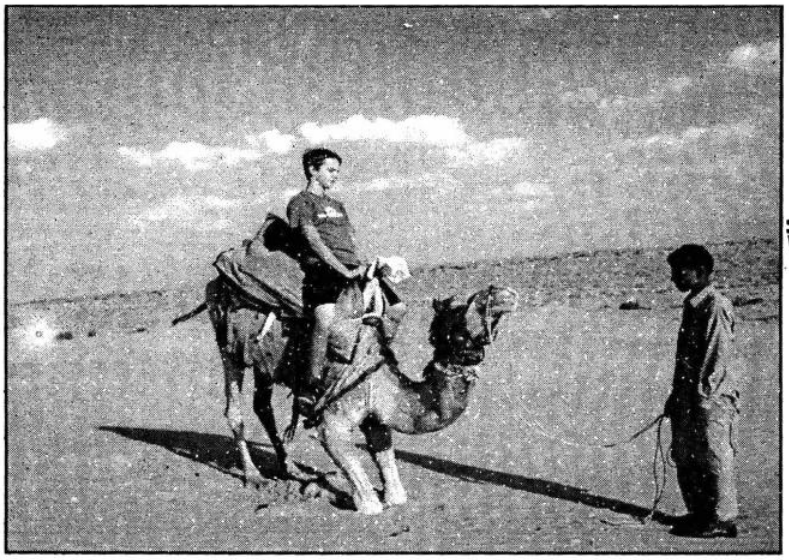

উটের সঙ্গে ওঠাবসা

প্রসাদরঞ্জন রায়

নাঃ, এ লেখাটি শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা নয়—তবে 'সোনার কেল্লা'র লালমোহনবাবু ওরফে জটায়ুর মতন উটে চড়ার অভিজ্ঞতা থাকলে তিনি এ নিয়ে কিছু লিখতেই পারতেন। চল্লিশ বছর আগের একটি দিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে একটি সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা জুড়ে এই লেখার সূত্রপাত।

তবে এই গল্পের শুরু উট দিয়ে নয়, এক অপূর্ব সুন্দর জৈন মন্দির দিয়ে। আবুর দেলওয়াড়া মন্দির ভারি সুন্দর (নিশ্চয় অনেকের দেখা), সুন্দর গুজরাটের পালিতানা-র শত্রুঞ্জয় মন্দিরও—তবে আমার দেখা সেরা কারুকার্যসম্বলিত জৈন মন্দির অবশ্যই রাজস্থানের রণকপুরের জৈন মন্দির। এটি জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের প্রতি উৎসর্গ করা—'চৌমুখা' মন্দির অর্থাৎ চতুষ্কোণ, বহু শিখরযুক্ত এবং প্রায় ১৪০০ মার্বেলের স্তম্ভ আছে, প্রতিটির কারুকার্য আলাদা। ১৫ শতকের মন্দির, মেবারের রাণা কুম্ভ-র আনুকুল্যে ধন্না শাহ তৈরি করিয়েছিলেন---এর স্থপতি দীপক নামের এক অনামা ভাস্কর। একটি তামার পাতে ইতিহাস খোদাই করা আছে, এবং আছে রাণা কুম্ভর যশোকীর্তন। রাণা কুম্ভ'র বিখ্যাত কুম্ভলগড় দুর্গের কাছেই মন্দিরটি, তবে যাওয়া বেশ কষ্টকর। উদয়পুর আর যোধপুরের মাঝ বরাবর রণকপুর একটি ছোট্ট গ্রাম, অবশ্য মাউন্ট আবু বা মাড়ওয়ার জংশন থেকেও যাওয়া যায়। তবে সব দিক থেকেই ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি। তবু সময়-সুযোগ থাকলে একবার দেখে আসা উচিত।

১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে আমরা তখন ভারতের একাংশে ঘুরছি এবং এক শীতের দুপুরে হাজির হয়েছি মাড়ওয়ার জংশনে। সেখান থেকে যাবার কথা রণকপুরে জৈন মন্দির দেখতে, এবং ফিরে এসে আমাদের ট্রেনের বোগিতে উঠলে সে বোগি ভোররাতে জুড়ে দেওয়া হবে কোনও ট্রেনে। চাঁদের আলোয় মন্দির দেখার ব্যবস্থা নাকি করা হয়েছে, কিন্তু ১৩০ কিলোমিটার যাওয়া হবে কিসে? আমাদের তখনকার গার্জেন ওখানকার তহশীলদার অক্লেশে বললেন, 'কেঁয়ো, উঁঠসে যাইয়ে।' শুনে আমাদের বাক্যরোধ হয়েছে দেখে তিনি আবার বললেন, 'আপলোগ তো মনসুরিসে ঘুড়সওয়ারি কর লেতে হ্যাঁয়, তো উঁঠমে চড়না কৌনসি বড়ি বাত হ্যায়?' অর্থাৎ মুসৌরিতে আমরা ঘোড়ায় চড়া শিখেছি যখন, তখন উটে চড়া আর এমন কী ব্যাপার? সত্যি আমরা ঘোড়ায় চড়া ততদিনে বেশ রপ্ত করেছি, কিন্তু তা বলে উটে চড়ে ১৩০ কিলোমিটার? শুকনো মুখে আমাদের দলনেতা বলল, 'ঠিক প্র্যাকটিস নেই তো...একটু চড়ে নিলে হয়তো...'। তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তহশিলদারজী বললেন, 'আভ্‌ভি মাংওয়াতে, সাব...'। এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে কুড়িটা উট হাজির।

পরামর্শ করে ঠিক হল যে ঘণ্টাখানেক আমরা ওই উটের পিঠে চড়ে ঘোরাঘুরি করব মাড়ওয়ার জংশনের আশেপাশে ফাঁকা মাঠে। তারপর একটু প্র্যাকটিস হলেই সোজা রণকপুর। ব্যাস, যে কথা সেই কাজ—কিন্তু মিনিটখানেকের মধ্যে বোঝা গেল উটে চড়া সহজ নয়। 'সোনার কেল্লা' উপন্যাসে জটায়ুকে দেওয়া ফেলুদার সেই অমর বাণী মনে পড়ল: 'উটের বসাটা লক্ষ্য করলেন তো? সামনের পা-দুটো প্রথমে দুমড়ে শরীরের সামনের দিকটা আগে মাটিতে বসেছে। তারপর পেছন। আর ওঠার সময় কিন্তু হবে ঠিক তার উল্‌টোটা। আগে উঠবে পেছন দিকটা,

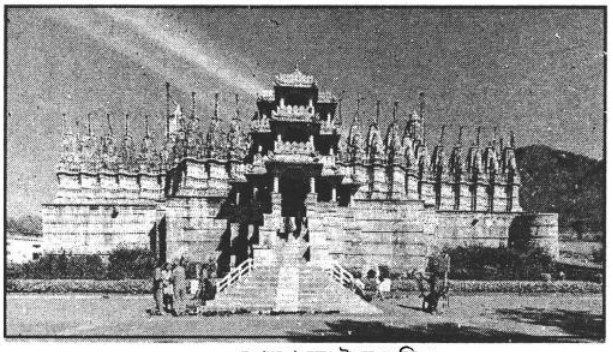

রণকপুরের জৈন মন্দির

তারপর সামনেটা। এই হিসেবটা মাথায় রেখে শরীরটা আগু-পিছু করে নেবেন, তা হলে আর কোনও কেলেঙ্কারি হবে না।' আমাদের এই অভিজ্ঞতার বছর দেড়েক আগে 'সোনার কেল্লা' লেখা হয়েছে, সিনেমা তখনও হয়নি। তবে এটুকু আমরা ধরে ফেলেছিলাম!

বাস্তবে দেখা গেল উটে চড়া বেশ সহজ, কারণ সে তখন বসে আছে—ঘোড়ায় আমরা চড়তাম দাঁড়ানো অবস্থায়। কিন্তু 'উট উঠো' না বললেও তার মালিকের ইঙ্গিতেই সে উঠে পড়ে। ওঠার সময় কিন্তু প্রথমে সামনের হাঁটুটা ভাঁজ করে খানিকটা ওঠায়, তারপর এক ঝটকায় পিছনটা। তাই প্রথমে একটু সামনে ঝুঁকেই আবার পেছনে হেলতে হয়—নইলে পতন প্রায় অনিবার্য আর ছয় ফুট উচ্চতা থেকে পতন মোটেই সুখপ্রদ নয়। আর উট যখন চলতে আরম্ভ করে তখন তার চলনের ভঙ্গীকে তোপসে বলেছিল 'তেরেবেঁকে ভীষণ একটা ল্যাগব্যাগে ভঙ্গী'—আর আমরা দেখলাম ঘোড়া 'ট্রট' বা 'ক্যান্টার, করার সময় আমরা আগে-পিছে বা উপর-নীচে দুলি (বিজ্ঞানের ভাষায় 'টু ডিগ্রিজ অফ্ ফ্রিডম') আর উটের চলনে শরীর দোলে তিন ভাবে। আগে-পিছে, উপর-নীচে আর ডাইনে-বাঁয়ে ('থ্রি ডিগ্রিজ অফ্ ফ্রিডম')। তাছাড়া যেতে যেতে কাঁটাঝোপ বা ঘাস দেখলে তার অভ্যাস মাথা নীচু করে খাওয়া—সেটা সামলানোও কঠিন। কতগুলো উট আবার বেশ বদরাগী। যখন তখন থুথু ছেটায় (টিনটিনের গল্পের লামার মতন), আবার ঘাড় ঘুরিয়ে বড় বড় দাঁত বার করে সওয়ারিকে কামড়াতে চায় বা ভয় দেখায়। মোট কথা, মোটেই তারা সুবোধ বালক নয়। প্রসঙ্গত বলি, ফেলুদা-তোপসের মতন আমাদের কিন্তু পিছনে চালক বসে ছিল না, নিজেরাই দড়ির লাগাম দিয়ে তাদের চালাতে চেষ্টা করছি—কুড়িটা উটের জন্য চার-পাঁচটা তদারকির ছেলে ছিল মাত্র। আর তারা তদারকি করবে কী, আমাদের কাণ্ড-কারখানা দেখে হেসেই অস্থির! ঘণ্টাখানেক বাদে মাড়ওয়ার জংশনের চত্তরে যখন নামলাম, তখন আমাদের কোমর ধরে এসেছে (প্রায় জটায়ুর মতনই) এবং আমরা স্থির নিশ্চিত যে এই বাহনে ১৩০ কিলোমিটার যাওয়া অসম্ভব। অগত্যা রণকপুর যাওয়া যাবে না একথা তহশীলদারকে জানাতেই বিনয়ের প্রতিমূর্তি বললেন, 'তব জিপ মাংওয়ায়, সাব?' এবং দশ মিনিটের মধ্যে পাঁচটা জিপ হাজির। তখন বোঝা গেল এই ব্যবস্থাই ছিল, আমাদের একটু টাইট করার জন্য উটের অবতারণা। লোকটাকে চাঁটানো উচিত কি না আলোচনা করতে করতে চাঁদনি রাতে মন্দিরের শোভা দেখে আমরা মুগ্ধ।

তখনও আমার জানা ছিল না যে 'সোনার কেল্লা' সিনেমা হচ্ছে। পরের বছর (১৯৭৪) তা মুক্তি পায় আর সিনেমায় ফেলুদা-জটায়ুর উট সম্পর্কে কথোপকথন আর 'উট বনাম ট্রেন' ধারাচিত্র আমার মতন অনেকের মনে গেঁথে যায়। এর বেশ কয়েক বছর বাদে 'সন্দেশী' কোনও অনুষ্ঠানে মানিকদার সঙ্গে আমার এই অভিজ্ঞতার বিষয়ে কথা হয়। শুনে মানিকদা হাঃ-হাঃ করে হেসে ওঠেন আর বলেন যে আগে জানা থাকলে নাকি এই 'থ্রি ডিগ্রিজ অফ্ ফ্রিডম্' কথাটা ফেলুদার মুখে ব্যবহার করতেন।

এই ঘটনার প্রায় ৪০ বছর বাদে দ্বিতীয় বার উটে চড়ার অভিজ্ঞতা ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাদাখের নুব্রা উপত্যকায়। আমরা গাড়িতে লেহ থেকে বিশ্বের সর্বোচ্চ বলে খ্যাত (এতে নাকি সন্দেহ আছে) ১৮,৩৮০ ফুট উঁচু খার্দুংলা পাস পেরিয়ে নুব্রা উপত্যকার ডেসকিট গ্রামে পৌঁছে শুনলাম কাছেই হুণ্ডার-এ উটে চড়ার অভিজ্ঞতা নাকি অপূর্ব! হুণ্ডার অঞ্চলে আছে 'শীতল মরু' বা কোল্ড ডেজার্ট আর আছে কয়েক'শ উট আর উটওয়ালা। অবশ্য এ মরুভূমির ভূ-প্রকৃতিও যেমন রাজস্থানের মরুভূমির থেকে আলাদা, এ উটও অন্য রকমের—দু-কুঁজওয়ালা ব্যাকট্রিয়ান উট, যারা

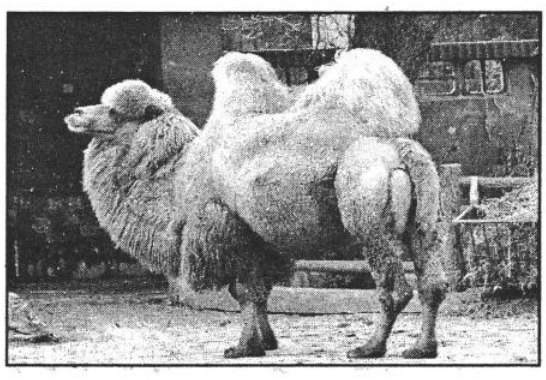

ব্যাকট্রিয়ান উট

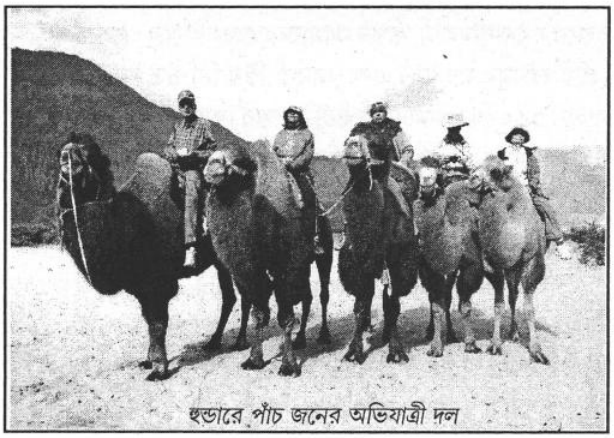

হুন্ডারে পাঁচ জনের অভিযাত্রী দল

মধ্য এশিয়ার অধিবাসী। অবশ্য এরাও 'বন্য উট' নয়, মধ্যযুগ থেকে উটের 'ক্যারাভান' মারফৎ সমরখন্দ-বোখারা থেকে কাশ্মীর হয়ে উত্তর ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চলত—তা বন্ধ হয়ে যাবার পর ক্যারাভানওয়ালারা সে সব উট ছেড়ে দেয় লাদাখ-তিব্বতের বিস্তীর্ণ রুক্ষ্ম অঞ্চলে। সেগুলিকেই আবার পোষ মানিয়ে উটওয়ালারা ব্যবহার করছে 'ট্যুরিস্টদের মনোরঞ্জনে। ব্যাকট্রিয়ান উট আমার দেখা ছিল ইউরোপ-আমেরিকার চিড়িয়াখানায়, তবে অনেকের কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। আকারে একটু ছোটো এই ব্যাকট্রিয়ান উট এবং মেজাজেও এরা অনেক শরিফ। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ভাবও করা যায় এদের সঙ্গে, এরা চকোলেট খেতে নাকি খুব ভালোবাসে। বসার ব্যবস্থা দুই কুঁজের মাঝখানে—আমার মতে বেশ সুবিধাজনক, তবে কারও কারও আবার একটু গায়ে হাতে-পায়ে একটু ব্যাথা হয়েছিল। ঘণ্টাখানেক উট ভ্রমণের খরচ মাথাপিছু ১০০ টাকা। তবে একটু দরাদরি করতে হয়। আমাদের পাঁচজনের পাঁচটি উটের জন্য বরাদ্দ ছিল উটচালক একটি বালক—সে কখনও দড়ি ধরে আবার কখনও মুখের ভাষায় উটদের চালনা করছিল সুন্দরভাবে। সন্ধ্যার মুখে নুব্রা আর শেওক নদীর মাঝখানে বালির স্তূপে ভরা সেই ছোট্ট মরুভূমিতে এ এক দারুণ অভিজ্ঞতা। তবে বলে রাখা ভালো, আমরা বিনা বিপদে এই উট চড়া সমাপ্ত করলেও ৪৮ বছর আগের আমাদের স্কুল ক্যাপ্টেন উট ওঠার সময়ে পপাত ধরণীতলে। তার উট নাকি হঠাৎই হড়বড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। তবে সাবাস দিই তাকে, কারণ পরমুহূর্তেই দু-পায়ে খাড়া হয়ে সে আবার সেই উটে উঠে পড়ে। স্কুল ক্যাপ্টেন তো! পরে আবছা শুনেছি যে 'সোনার কেল্লা'-র শুটিং-এর সময়ে নাকি ফেলুদারও একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সুযোগ পেলে একবার সৌমিত্রদাকে জিগ্‌গেস করে নিতে হবে।

ফেলুদার স্টাইলে উট সম্পর্কে দু-চারটে কথা বলার লোভ সম্বরণ করতেও পারছি না। উট-জাতীয় প্রাণী বা 'ক্যামেলিড'দের উদ্ভব নাকি উত্তর আমেরিকায় প্রায় চার কোটি বছর আগে, এর বহু ফসিল প্রমাণ আছে। ৩০ থেকে ৫০ লক্ষ বছর আগে এদের একটি গোষ্ঠী বরফে জমা বেরিং প্রণালী পেরিয়ে সাইবেরিয়াতে পৌঁছয় আবার সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে চীন ও এশিয়ায়, এবং ভারত থেকে মধ্য প্রাচ্যে আর উত্তর আফ্রিকায়। কালক্রমে এদের থেকে উদ্ভুত হয়েছে ব্যাকট্রিয়ান উট আর আরব দেশের (বা ভারতের) উট, যাদের 'ড্রমেডারি' বলা হয়। এরা দুটি স্বতন্ত্র প্রজাতি। প্রায় একই সময়ে আর একটি গোষ্ঠী পানামা যোজক পেরিয়ে হাজির হয় দক্ষিণ আমেরিকায়—এদের চারটি প্রজাতি আজও টিকে আছে : লামা, আলপাকা, ভিকুনা আর গুয়ানাকো। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে এদের চেহারা ও আচার-ব্যবহার কিছুটা ভিন্ন। দক্ষিণ আমেরিকার 'ক্যামেলিড'-দের কিন্তু চর্বিতে ভরা কুঁজ নেই। ফেলুদা উটদের চর্বি থেকে জল বানিয়ে নেবার ক্ষমতার কথা বলে গেছেন সেই 'সোনার কেল্লা'তেই, তবে বলে রাখি যে এরকম অভিযোজন আর কোনও জন্তুর মধ্যে দেখা যায় না। জীববিজ্ঞানীদের তাই বাড়তি আকর্ষণ এই 'মরুর জাহাজ'-এর প্রতি।

উটকে মানুষ পোষ মানিয়েছে প্রায় ৫০০০ বছর আগে আরব অঞ্চলে (ব্যাকট্রিয়ান উট তার কিছুটা পরে)। আজ পৃথিবীতে দেড় কোটি উটের মধ্যে প্রায় কোনওটিই প্রকৃত 'বন্য উট' নয়— কেবল গোবি মরুভূমি অঞ্চলে প্রায় ৮০০ বন্য ব্যাকট্রিয়ান উট আছে, তারা আজ 'অত্যন্ত বিপন্ন'। উটদের পোষ মানানো হয় প্রধানত মালবহনের জন্য বা উটের

বিকানীর ক্যামেল কোর প্রথম মহাযুদ্ধে মিশরে যুদ্ধ করেছে

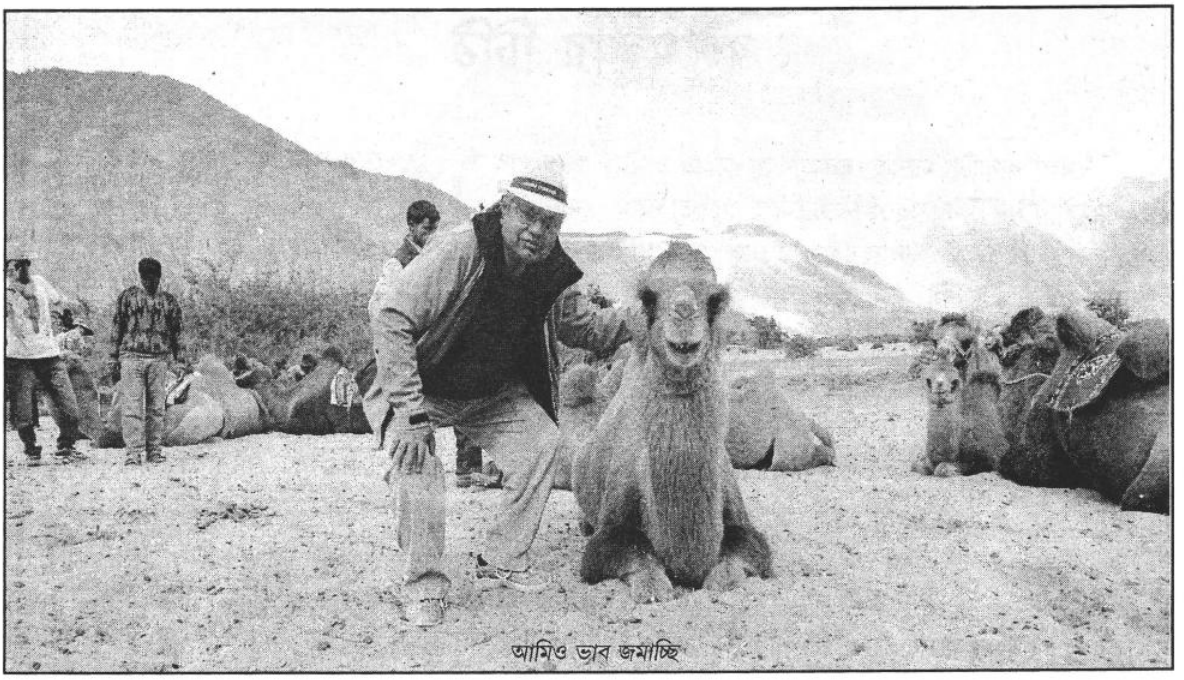

আমিও ভাব জমাচ্ছি

পিঠে মরুপথে পাড়ি দেবার জন্য। গরুর গাড়ির মতন উটের গাড়ি বেশ দেখা যায় গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব, এমন কি দিল্লীর রাস্তায়। চাষের কাজে জোয়াল কাঁধে এদের ব্যবহারও দেখা যায়। যুদ্ধে উটের বাহিনীর ব্যবহার শুরু হয়েছিল মধ্য প্রাচ্যে, উত্তর আফ্রিকায় এবং ভারতে শুধু নয়, ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিনী সেনাবাহিনীও এদের যুদ্ধে ব্যবহার করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের 'বিকানীর ক্যামেল কোর' যুদ্ধ করেছে, আজও সীমান্তরক্ষীদের উট-চালিত বাহিনী আছে। ঘোড়দৌড়ের মতন উটের দৌড় হয় মধ্য প্রাচ্য আর সাহারা মরুতে—'রেসিং ক্যামেল' নাকি ঘণ্টায় ৪০ কিমি পর্যন্ত দৌড়য়। এ ছাড়া উটের পিঠে চড়ে 'ক্যামেল পোলো' বা উটদের কুস্তির লড়াইও মধ্যপ্রাচ্যে বেশ জনপ্রিয়। মরু অঞ্চলে ব্যবহারের জন্য উট আমদানি করা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঞ্চলে আর অস্ট্রেলিয়ায়। পরে কাজে লাগছে না মনে করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হলে তারা 'প্রায় বন্য' হয়ে যায়। শুধু অস্ট্রেলিয়াতেই এরকম উট আছে সাত লক্ষেরও বেশী আর তারা পরিবেশের ক্ষতিও করছে যথেষ্ট।

এছাড়া উটের মাংস, দুধ, চামড়া, পশম সবই কাজে লাগে। উটের দুধ একটু ঘন এবং স্বাদও কিছুটা আলাদা তবে এতে ফ্যাট কম। উটের দুধে মাখন, চীজ সবই হয়—এখন এক ডাচ কোম্পানি উটের দুধের আইস ক্রীমও তৈরি করছে। উটের পশমের কম্বল বা কোটের চাহিদা যথেষ্ট। উটের মাংস ব্যবহৃত হচ্ছে বহুকাল ধরে—গ্রীকরা পারস্যে তা খেয়েছে বলে জানা যায়। রোমান সাম্রাজ্যেও এর ব্যবহার ছিল। সবচেয়ে বেশী ব্যবহার ছিল মধ্যপ্রাচ্যে। সৈয়দ মুজতবা আলি কাবুলে উটের মাংসের রোস্টের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত বলি, ওই ১৯৭৩ সালের ভারত দর্শনের সময় রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বরকতউল্লা খাঁ আমাদের এক ভোজে আপ্যায়িত করেন। মাঝখানে বিশাল টেবিলে শোয়ানো ছিল একটা আস্ত উট। অবশ্য তার চামড়া উপর থেকে আলগা করে দেওয়া ছিল, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি সাফ করে উটের মাংস রোস্ট করা হয়েছিল আর ভিতরে ভরা ছিল পোলাও। একটা ঝকঝকে তলোয়ার দিয়ে কেটে টুকরো করে দেওয়া হচ্ছিল। আমাদের দলের নিরামিষাশীরা একটু হকচকিয়ে গেলেও আমরা খেয়েছিলাম চেটেপুটে। মুসলমানরা উটের মাংস খায় পরবের সময়—ঈদ উপলক্ষ্যে কলকাতাতেও উট আসে জবাইয়ের জন্য। তবে ইহুদীরা উট খায় না। চুপিচুপি বলি, মাংসটা বেশ শক্ত ছিল তবে উটের মাংসের নাকি অনেক গুণ আছে। সোমালিয়া বা উত্তর কেনিয়াতে উটের রক্ত খায়। সেটা বোধ হয় পেরে উঠব না, তবে উটের মাংসের রোস্ট আবার খেলে মন্দ হয় না।

ফোটো : লেখক

বইমেলার চিঠি

'মেলা' কথাটির মাঝেই যেন লুকিয়ে রয়েছে একটা মেলামেশার টান। আর বইকে নিয়ে মেলা, সে তো পরম আনন্দের সময়। তাই আবার বইমেলা এসে গেল, আর আমরা মিলতে এলাম মেলামেশার মজায়। তার সঙ্গে চলেছে বইয়ের নাড়াঘাঁটা আর বিক্রির ব্যস্ততা। 'সন্দেশ' আবার এসেছে বইমেলায় মিলতে।

মনে পড়ে সন্দেশ স্টলের ছড়া—

মিষ্টি এ দোকানে
আয় খুকু খোকা নে
যত হাসি রঙ্গ
খুশির তরঙ্গ।

তবে সেদিনকার মেলার সন্দেশীরা অনেক বড়ো হয়ে গেছ। সেই সব বড়ো হয়ে যাওয়া সন্দেশীদের মাঝেও লুকিয়ে আছে শিশুর মন। তোমরা এসো সন্দেশের স্টলে, পরিচয়টা ঝালিয়ে যাও। সেই মেলা মাতানো শিশিরদা আর নেই। নেই নলিনীদি, অশোকানন্দ দাশ বা লীলাদি। পরেশদাও (পরেশ দত্ত) আর নেই, যিনি তাঁর টিফিন ক্যারিয়ারে লুচি আলুরদম ঠেসে আনতেন আমাদের জন্য। তার মজাই আলাদা! সে সময় খবরের কাগজ আর দড়ি দিয়ে বই মোড়া হত! সেই মোড়ার কাজ তেমন শক্ত ব্যাপার নয়, সহজেই বুড়োদাদুর (ফণীবাবু) কাছে শিখে নিয়েছিলাম। তবে একবার 'সন্দেশ' স্টলে কবি শঙ্খ ঘোষ ক'টা বই কিনেছিলেন। এক সন্দেশী উত্তেজনায় যা-তা করে কাগজ মুড়েছিল, হাতে তুলে দিতে সত্যিই লজ্জা হচ্ছিল। বই বাঁধার অপরিচ্ছন্নতার কথা বলে ক্ষমা চাইতেই উনি খুব মজা পেয়ে হাসতে লাগলেন। আমরাও খানিকটা স্বস্তি পেলাম।

ভিড়ের চাপে অশোক বেরার টেবিল চাপা পড়ে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হবার উপক্রম, অনিল মিত্র মহাশয়ের ঢক্‌ঢক্ করে এক বোতল ঠাণ্ডা চা জল ভেবে খেয়ে নেওয়া, এসব কথা পুরোনো সন্দেশীরা সবাই জানো বোধহয়। সন্দেশের স্টল খদ্দেরের সঙ্গে দিব্যি হাসি মজায় জমে যায়।

আজ মেলার স্থান বদলেছে 'মিলন মেলা' প্রাঙ্গণে। একদিকের মানুষের কাছে দূরত্ব বেড়েছে, তবে আর এক দিকের মানুষেরা মেলাকে পেয়েছে আরও কাছে। সব মিলে কিন্তু মেলা আগের চেয়েও জমজমাট। প্রাঙ্গণ অনেক উন্নত, বাঁধানো রাস্তা, ধূলো আর তেমন ওড়ে না। আগে সন্ধ্যের পর নাকে রুমাল বেঁধে বই বিক্রি করতে হত। অতি চেনা খদ্দেরটিও চিনতে পারতেন না সহজে।

দিনকে দিন মেলায় ভিড় বাড়ছে, আর গিল্ডের মেলা আন্তর্জাতিক মর্যাদায় পৌঁছে গেছে। আমরা খবর পাই ছোটোরা সারাবছর বই কেনার সময় পায় না, তাই সারা বছর ধরে তারা পয়সা জমায় বইমেলায় আসবে বলে। মনে মনে ঠিক করে রাখে যে সব বই কিনবে তাদের নাম। তারা বাবা মা-কে টানাটানি করে ছোটদের বইয়ের স্টলে ঢোকায়। বুড়োরাও শিশুদের বইয়ের খোঁজ করেন—'চাঁদের পাহাড়', 'টুনটুনির বই', সুকুমার-সত্যজিৎ সমগ্রের। মনে পড়ে নলিনীদির তৈরি স্লোগান—'পুরোনো 'সন্দেশ' নতুনের মতো মিষ্টি'। তরুণদার (চক্রবর্তী) বাহিনী 'সন্দেশ' বইয়ের গোছা নিয়ে হাত তুলে চেঁচাত—'জল ভরা সন্দেশ! সস্তায় কিনে নিন।' তাই শুনে দেখি ছোট্ট একটা ছেলে মায়ের আঁচল টেনে তাঁকে সন্দেশের স্টলে নিয়ে আসছে। আসলে আগের দিন বৃষ্টি পড়ে কিছু 'সন্দেশ' ভিজে গিয়েছিল।

আশা করি এবারেও বইমেলা জমবে। প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রথম 'সন্দেশ'-এর দিনটি ধরে 'সন্দেশ' ১০০ বছর পূর্ণ করতে চলেছে। তোমরা সবাই 'সন্দেশ' স্টলে এসে সে কথাটি স্মরণ করবে আশা করি। আর তোমাদের মধ্যে থেকেই গড়ে উঠবে আগামী শিশুসাহিত্যিকের দল।

শুভেচ্ছা নিও।

স. স.

ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস

গিরিকিশোর দাশগুপ্ত

ষষ্ঠ কিস্তি

হেরম্যান প্রাণীতত্ত্বে উচ্চতর শিক্ষার পর সারা পৃথিবী চষে বেড়ান নানা রহস্যময় প্রাণীর খোঁজে। ইয়েতির খোঁজে নেপালে গিয়ে সুদীপ্তর সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। আফ্রিকার রিফ্‌ট্ ভ্যালী অঞ্চলে অভিযানে হেরম্যানের সঙ্গী সুদীপ্ত—উদ্দেশ্য প্রবাদিত সবুজ বনমানুষের সন্ধান করা। পাদ্রী কলিন্স এই অঞ্চলে ঘুরেছিলেন। তাঁর ডায়েরিতে দু-পেয়ে দশ ফুট লম্বা 'সবুজ মানুষ'-এর উল্লেখ আছে।

তাঙ্গানিকা হ্রদের পূর্ব তীরে যাচ্ছে ওরা। সঙ্গে গাইড টোগো, চারজন মালবাহী কুলি ও চারজন বন্দুকধারী রক্ষী বা আস্কারি। একটি গ্রামে ওরা শুনল যে এই পথে গিয়েছে আফ্রিকাবাসী শ্বেতাঙ্গদের নেতৃত্বে একটি বড় দল। তারা বুরুন্ডিতে যাচ্ছে, খোঁজখবর নিচ্ছিল সবুজ বনমানুষের বিষয়ে। তাঙ্গানিকা হ্রদের উত্তর প্রান্তে পরদিন গিরিশিরার বেশ কিছুটা উঁচুতে উঠল ওরা। একদিকে রুজিজি নদীর উপত্যকা, আরেক পাশে জাইরি নদীর উপত্যকা। হরিণ মারতে বন্দুকের গুলি ছুঁড়তেই তার উত্তরে শুনতে পেল আরেকটি গুলির আওয়াজ। পরের উপত্যকায় আফ্রিকান্ডার দলটির তাঁবু। তাদের দলপতি ম্যাকুইনা ডায়ার সাত ফুট লম্বা, জাঞ্জিবারের বাসিন্দা ও এক হীরের খনির মালিক।

হেরম্যান বললেন যে তিনি এই অঞ্চলের জীবজন্তু নিয়ে গবেষণা করতে এসেছেন। ম্যাকুইনা বললেন, তাঁদের উদ্দেশ্য সিংহ শিকাব, কিন্তু মাসাইদের বন্দুকগুলি নতুন হলেও সিংহ শিকার করার মতো শক্তিশালী নয়। সন্ধের মুখে একটি সিংহ চকিতে এক মাসাইকে টেনে নিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে। অন্ধকার হবার মুখে অনেকগুলি আগুন জ্বালাল ওরা—তবু এক দল সিংহ এগিয়ে এল। শেষে সকলে মিলে চারটি সিংহ মরার পর বাকিরা পিছু হটল। পরদিন একসঙ্গে রওনা হল ওরা। সিংহশঙ্কুল বিস্তীর্ণ ঘাসবন পেরিয়ে ওরা চলল রুভুভু নদীর তীর দিয়ে। পৌঁছাল ওদের লক্ষ্যস্থলের কাছে, পশ্চিমের উপত্যকায়। পাহাড়ের উপর থেকে নিচে দেখতে পেল কলিন্সের বর্ণিত পিগমিদের গ্রামটা। পাহাড়ের উপরেই তাম্বু ফেলে পরদিন সকালে নিচে গেল ওরা।

গ্রামে শ'দুয়েক লোক, গোটা পঞ্চাশ কুঁড়ে ঘর। চারদিক ঘিরে গাছের গুঁড়ি আর পাথর দিয়ে বানানো পাঁচিল। ওদের বল্লম আর তীরে মারাত্মক বিষ মাখানো থাকে। গ্রামের প্রধান ওটুস্বার শর্ত—এই অঞ্চলে শিকার করতে গেলে ওদের দুটো বন্দুক দিতে হবে, উত্তরের পাহাড়ের গোরিলাদের মারতে সাহায্য করতে হবে, রাতে গ্রামের পাশে এতজনের থাকা চলবে না, আর পশ্চিমে ওদের পবিত্র পাহাড়ে শিকার করা যাবে না। গ্রামের মধ্যে ওঙ্গো দেবতার বীভৎস মূর্তি-বিশাল ভয়ঙ্কর মুখ-সর্বস্ব দেহ। পাশে বলি দেওয়া বানরের হাড়ের স্তূপ-একটা মানুষের খুলিও পড়ে। শর্ত মেনে গোরিলা মারতে গেল কিছু বন্দুকধারী মাসাই ও কিছু পিগমি, ওটুস্বা -সহ।

ওরা নিজেরা পশ্চিমের পাহাড়ে গিয়ে দেখল একটি গাছ থেকে ঝুলছে তিনটি কঙ্কাল, চামড়ার ফিতে দিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তাদের। দীর্ঘাকৃতি কঙ্কালটি ম্যাকুইনার চেনা কারোর, তিনি সঙ্গের লোকেদের বললেন, কঙ্কালটি নামিয়ে কবর দিতে।

মাঝরাতে ওদের তাঁবুর কাছে এসেছিল এক বিশালাকৃতি বনমানুষ, আট ফুট লম্বা, পায়ে চারটি করে আঙুল। পরদিন মাসাইদের প্রায় সবাই দক্ষিণের পাহাড়ে যাবে চিতা শিকারে—ওরা ক'জন আবার পশ্চিমের পাহাড়ে যাবে বনমানুষের খোঁজে।

পশ্চিম উপত্যকায় প্রবেশ মুখের সেই ফাঁসি দেওয়া গাছ পর্যন্ত পথটা সুদীপ্তদের চেনা। সে পথ গতকাল তারা নিজেরাই করে নিয়েছিল। কাজেই সেদিকে এগোতে অসুবিধা হচ্ছিল না।

চলতে চলতে সুদীপ্ত হেরম্যানকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তাঁবুর কাছে ওই পায়ের ছাপটা দেখে আপনার ওই প্রাণীটার সম্বন্ধে কী মনে হল?'

হেরম্যান বললেন, 'যদিও আমি এই ছাপের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই তবে চার আঙুল বিশিষ্ট বানর জাতীয় প্রাণীর কথা শুনিনি। সাধারণত গোরিলা, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদি মানুষের কাছাকাছি প্রাণীদের বুড়ো আঙুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পায়ের অন্য আঙুল থেকে ওই আঙুলটা একটু তফাতে ছড়ানো হয়। পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ঝোলার জন্য। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখছি। সম্ভবত এই সবুজ বানর বা কলিন্সের গ্রিন ম্যান গাছে চড়তে পারে না। পায়ের ছাপটাও মানুষের পায়ের ছাপের মতো লম্বাটে ধরনের। আরও একটা ব্যাপার হল—পাখি ও কিছু সরীসৃপ ছাড়া সবুজ রং কিন্তু অন্য প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না। ছাপ দেখে আর ওই রঙের কথা ভেবে মনে হচ্ছে প্রাণীটা কোনও নতুন শ্রেণীর দো-পেয়ে প্রাণী। আবার তার যা আকৃতি তাতে সে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া দানব-বানর 'জাইগান্টোপিথিকাসের' কোনও উত্তরসূরিও হতে পারে।'

এরপর জঙ্গল ভাঙতে ভাঙতে হেরম্যান বললেন, 'ক্রিপ্টো-জুলজির ব্যাপারে ছাপ সংক্রান্ত কয়েকটা ঘটনার কথা বলি—ঘটনাগুলো তোমাদের হিমালয়ের ইয়েতি সংক্রান্ত। আমরা যেমন অজানা প্রাণীর পায়ের ছাপ দেখলাম, তেমনই কোনও অজানা দো-পেয়ের ছাপ হিমালয়ের বুকে ১৮৮৯ সালে প্রথম দেখেন ইউরোপীয় অভিযাত্রী ওয়াডেল। তারপর ১৯২১ সালে রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির লেফ্‌টেন্যান্ট চার্লস হাওয়ার্ড 'এভারেস্ট রিকনয়সান্স' অভিযানে গিয়ে ২১০০০ ফুট উচ্চতায় 'লাকপা লা' গিরিসঙ্কটে দেখতে পান কোনও অজানা দো-পেয়ের বিশাল পদচিহ্ন। হাওয়ার্ডের পর ১৯২৫ সালে রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির টোমবাজি। জেমু হিমবাহে তিনি দেখলেন সাত ইঞ্চি লম্বা পায়ের ছাপ। আর ১৯৫১ সালে এভারেস্ট এক্সপিডিশনে গিয়ে এরিক শিপটন তুলে আনলেন বরফের মধ্যে আঁকা এক বিশালাকৃতি দো-পেয়ে দানবের পদচিহ্ন। আকারে তা একটা আইস এ্যাক্স বা তুষার গাঁইতির ফলার মতো। পদচিহ্নের পাশে ওই আইসএ্যাক্স রেখেই ছবি তুলেছিলেন তিনি। ইয়েতির পদচিহ্ন হিসেবে খ্যাত ওই ছবি আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল সারা বিশ্বে। হয়তো তুমিও সে ছবি দেখে থাকবে। এমনটাও তো হতে পারে—তুমি যে ছবি তুললে সেটাও একদিন বিখ্যাত হবে।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'যাদের কথা আপনি বললেন, তাঁরা কি শুধু ছবিই তুলেছিলেন? কেউই চাক্ষুষ দেখেননি প্রাণীটাকে?'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, দু'জন এ দাবি করেছিলেন। ইয়েতির কথা মানুষের আলোচনায় প্রথম আসে ১৮৩২ সালে। ওই বছর তোমাদের কলকাতা থেকে প্রকাশিত এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে নেপাল হিমালয়ের অভিযাত্রী 'হজসন-এর' এক প্রবন্ধ ছাপা হয়। তাতে তিনি দাবি করেছিলেন তাঁর সঙ্গীরা নাকি গাঢ় রঙের বিশালাকৃতি এক বানর জাতীয় প্রাণীকে তাদের সামনে দিয়ে দৌড়ে পালাতে দেখেছিল। আর দ্বিতীয়বার এ দাবি করেন ওই টোমবাজি। আমি যেমন প্রাণীটাকে গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, তেমনই টোমবাজি দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন মানুষের মতো দেখতে এক ঘন রঙের দো-পেয়ে প্রাণী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে খর্বাকৃতি এক রডোডেনড্রন গাছের মাথা ধরে ঝাঁকাচ্ছে। সামান্য দূর থেকে মিনিট তিনেক ধরে প্রাণীটাকে পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। তারপরই প্রাণীটা বরফাচ্ছাদিত পর্বত কন্দরে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রাণীটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে পৌঁছে ওই পায়ের ছাপের ছবি তোলেন শিপম্যান।'

হেরম্যান সুদীপ্তর প্রশ্নের জবাব দেবার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাবে বললেন, 'হজসন, ওয়াডেল, টোমবাজি বা শিপটন যে-কাজটা ইয়েতির ক্ষেত্রে করতে পারেননি, বুরুন্ডির সবুজ মানুষের ক্ষেত্রে সে কাজটাই করে দেখাতে হবে আমাদের। শুধু পায়ের ছাপের ছবি তোলা বা দূর থেকে তাকে দেখা শুধু নয়, তাকে হাজির করাতে হবে সভ্য পৃথিবীর সামনে। নিছক ব্যক্তিগত খ্যাতি লাভের জন্য এ কথা বলছি না, ক্রিপটোজুলজিস্টদের যুগ যুগ ধরে পণ্ডিত-প্রবরদের কাছ থেকে যে তাচ্ছিল্য-অপমান হজম করতে হয়েছে, যার থেকে শিপটন বা হেরম্যান কেউই বাদ যাননি—তার বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিবাদ হবে বুরুন্ডির সবুজ মানুষ।' কথাগুলো বলার সময় উত্তেজনায় চক্‌চক্ করে উঠল হেরম্যানের চোখ।

সুদীপ্ত তাঁর কথা শুনে মনে মনে বলল, 'তাই যেন হয়।'

ম্যাকুইন্না অবশ্য হেরম্যান ও সুদীপ্তর সঙ্গে আলোচনায়

অংশগ্রহণ করলেন না। তিনি তাদের কিছুটা তফাতে মাসাই রক্ষী দু-জনকে নিয়ে চলতে লাগলেন। এক সময় সেই শুকনো নদীখাতের কাছে পৌঁছে গেল তারা। তারপর খাত অতিক্রম করে পশ্চিম পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপস্থিত হল সেই জায়গাতে—যেখানে বিরাট গাছটাতে ঝুলে রয়েছে দুটো কঙ্কাল। তাদের অপর সঙ্গীর সদ্গতি গতকাল করেছে ম্যাকুইনা। ম্যাকুইনা জায়গাটাতে পৌঁছে একবার তাকালেন, কিছু দূরে ঝোপের ওপাশে যেখানে গত বিকালে সেই কঙ্কালটাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। তারপর সে জায়গা অতিক্রম করে সামনের দিকে এগোল সবাই।

এ পথ সুদীপ্তদের অচেনা। তারা যত এগোতে লাগল, ততই অন্যান্য গাছ কমে গিয়ে বাড়তে লাগল বাঁশের জঙ্গল। এক সময় জঙ্গল এত ঘন হয়ে এল, ঠিক যেন দুর্ভেদ্য প্রাচীর। যেদিকে চোখ যায় সুদীপ্তদের গতি রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে বাঁশের দেওয়াল। সে অরণ্যে প্রাণের কোনও স্পন্দন নেই। একটা পাখি পর্যন্ত কোথাও ডাকছে না! অজানা কোনও আতঙ্কে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে এ অরণ্য। অনেক চেষ্টা করে বাঁশঝাড় কেটে পথ করে নিয়ে মাইল খানেক এগোতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। দক্ষিণের জঙ্গল থেকে আকালাদের বন্দুকের শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। হয়তো তারা পূবের দিকে পৌঁছে গেছে। হেরম্যান হিসাব করে দেখলেন এ পাহাড়ের অর্ধেকও তারা অতিক্রম করতে পারেনি। একবার ঘড়ি দেখে নিয়ে ম্যাকুইনার উদ্দেশে বললেন, 'যা জঙ্গল দেখছি আর যেভাবে আমরা এগোচ্ছি তাতে সন্ধের সময়ও এ পাহাড়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারব কি না সন্দেহ। তাছাড়া এ জঙ্গলে যদি ওই দানব বানর লুকিয়েও থাকে দৈবাৎ তার সাক্ষাত না পেলে তাকে খুঁজে পাওয়াও অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।'

ম্যাকুইনা বললেন, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। অসভ্য পিগমিগুলো যদি প্রাণীটার সন্ধান না দেয় তাহলে তাকে খুঁজে বার করাও মুশকিল। ফিরে গিয়ে আমি সে চেষ্টাই করব।'

হেরম্যান জানতে চাইলেন, 'কীভাবে কাজটা করবেন আপনি?'

তিনি জবাব দিলেন, 'দেখি, প্রলোভনে কাজ হয় কি না! ওটুম্বাকে আলাদা তাঁবুতে ডেকে আনতে হবে, হিরে আর তামাকের লোভ দেখাতে হবে।'

'আর তাতে যদি কাজ না হয়?' আবার জানতে চাইলেন হেরম্যান।

এ কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে হেরম্যানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকালেন ম্যাকুইনা। হেরম্যানকে তিনি কী যেন জবাব দিতে গিয়েও চুপ করে গিয়ে শুধু বললেন, 'আর একটু পথ অন্তত এগোনো যাক।'

এগোতে থাকল সকলে। আরও আধ ঘন্টা চলার পর সুদীপ্তদের সামনের বাঁশবন হঠাৎই যেন ফাঁকা হতে শুরু করল। তাই দেখে সকলে একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল। তাহলে কি শেষ হতে চলছে এই অন্তহীন বাঁশবন! আর কিছুক্ষণের মধ্যে তারা উপস্থিত হল একটা উন্মুক্ত স্থানে। না, বাঁশবন শেষ হয়ে যায়নি। বনের ভিতর বাঁশের জঙ্গল কেটে একটা বৃত্তাকার জায়গা কারা যেন সাফ করে রেখেছে। আর সেই বৃত্তের ঠিক মাঝখানে বিরাট লম্বা একটা বাঁশের মাথায় বেশ উঁচুতে ঝুলছে আরও একটা কঙ্কাল! তাহলে কি এটা আরও একটা বধ্যভূমি!

সুদীপ্তরা গিয়ে দাঁড়াল কঙ্কালটা যেখানে ঝুলছে তার ঠিক নীচে। বাঁশটা যেন স্বাভাবিক নিয়মে এখানে জন্মায়নি, এখানে সদ্য পোঁতা হয়েছে তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। বাঁশের গোড়াতে বেশ কিছুটা জায়গাতে ছড়িয়ে আছে কাঁচা মাটি, তাতে অসংখ্য খুদে-খুদে পায়ের ছাপ। আর সেই ছাপের মধ্যে হঠাৎই একটা বিরাট পায়ের ছাপ দেখে চমকে উঠল সকলে। সেই ছাপ!! এরপর ভালো করে মাটির দিকে তাকাতেই বুড়ো আঙুলহীন আরও বেশ কয়েকটা ছাপ দৃষ্টিগোচর হল তাদের।

ম্যাকুইনা বললেন, 'তাহলে ওই সবুজ মানুষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র আছে পিগমিদের। তাদের সঙ্গে প্রাণীটাও এখানে এসেছিল।'

সুদীপ্তদের আশ্চর্য হতে আরও কিছুটা বাকি ছিল। এরপর হঠাৎ বাঁশের আগায় ঝুলতে থাকা কঙ্কালটার দিকে তাকিয়ে টোগো বিস্ময়ে বলে উঠল, 'আরে, এতো সেই কঙ্কাল, যাকে কাল কবর দেওয়া হল! ওই তো তার সেই জুতো, ভালো করে দেখুন ওর গায়ে এখনও মাটি লেগে আছে! ফাঁস দেওয়া লতাটাও টাটকা!' তার কথা কানে যেতেই তড়িতাহতের মতো ঝুলন্ত কঙ্কালের দিকে তাকিয়েই দুর্বোধ্য ভাষায় প্রচণ্ড একটা চিৎকার করে স্থির হয়ে গেলেন ম্যাকুইনা। হেরম্যান আর সুদীপ্ত কঙ্কালটার দিকে ভালো করে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন—টোগোর কথাই ঠিক, কালকের সেই কঙ্কালটাকেই কবর থেকে তুলে এনে ঝোলানো হয়েছে বাঁশের মাথায়! কী আশ্চর্য ব্যাপার! তবে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হল টোগো, কারণ ম্যাকুইনা উত্তেজনার বশে আফ্রিকান ভাষায়

চিৎকার করে যে-কথা বলে উঠলেন তার মর্ম উদ্ধার করতে অসুবিধা হল না তার। সে অবাক হয়ে তাকাল ম্যাকুইনার দিকে। আর তিনি পাথরের মূর্তির মতো চেয়ে রইলেন ওপর দিকে। শক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর চোয়াল, কোনও অজানা শত্রুর প্রতি আক্রোশে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে তাঁর চোখ দিয়ে!

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধভাবে কেটে যাবার পর হেরম্যান মন্তব্য করলেন, 'এ কঙ্কালটার প্রতি মনে হয় জাতক্রোধ আছে পিগমিদের, মৃত্যুর পরও তাই ওরা ওঁকে শান্তি দিতে চায় না। কবর থেকে তুলে আবার ফাঁসিতে চড়াল।'

একথা বলার পর সম্ভবত আর কৌতূহল সম্বরণ করতে না পেরে ম্যাকুইনার উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, লোকটার পরিচয় কী বলুন তো? যে কারণে আপনি কাল ওঁর কবরের ব্যবস্থা করলেন?'

ম্যাকুইনা কঙ্কালের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ফিরে তাকালেন হেরম্যানের দিকে। তারপর হেরম্যান আর সুদীপ্তকে হতচকিত করে ঠান্ডা গলায় জবাব দিলেন, 'ম্যাকলাস ডায়ার—আমার বাবা।'

'আপনার বাবা? তিনিও কি সবুজ বানরের সন্ধানে এখানে এসেছিলেন?' বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন হেরম্যান।

ম্যাকুইনা এ প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে শুধু বললেন, 'আমরা এবার তাঁবুর দিকে ফিরব।' এই বলে ঝুলন্ত কঙ্কালটার দিকে আর একবার তাকিয়ে নিয়ে ফেরার পথ ধরলেন তিনি। তবে ফেরার সময় কেমন যেন একটা অস্বস্তি হতে লাগল সুদীপ্তদের। মনে হতে লাগল কেউ যেন আড়াল থেকে অনুসরণ করছে তাদের।

ফিরতি পথে সুদীপ্তরা এক সময় উপস্থিত হল সেই গাছের কাছে, যেখানে দুটো কঙ্কাল ঝুলছে। সুদীপ্তরা একবার গিয়ে দাঁড়াল ঝোপের আড়ালে সেই কবরের জায়গাতে। শূন্য কবর, তার চারপাশে ঝুরো মাটিতে জেগে আছে পিগমিদের পদচিহ্ন আর বুড়োআঙুলহীন সেই অদ্ভুত ছাপ! অনেকক্ষণের নীরবতা কাটিয়ে ম্যাকুইনা বলে উঠলেন, 'প্রাণীটাকে সম্ভবত পিগমিরা পোষ মানিয়েছে, ও ওদের সঙ্গেই ঘোরে দেখছি।'

ম্যাকুইনার কথা শুনে হেরম্যান বললেন, 'কিন্তু আমাদের এ পাহাড়ে পদার্পণের খবর হয়তো এতক্ষণে ওটুম্বার কানে পৌঁছে দিয়েছে পিগমিরা। তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে কঙ্কালটাকে কারা গাছ থেকে নামিয়ে কবর দিয়েছিল। তবে আমার ধারণা ওরা এ ব্যাপারটা আজই বুঝতে পেরেছে, নইলে ওটুম্বা আমাদের সঙ্গে সকালবেলা ভালো ব্যবহার করত না। আমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি— এ ব্যাপারটা ও নিশ্চয়ই স্বাভাবিকভাবে নেবে না।'

ম্যাকুইনা আবার ফেরার জন্য পা বাড়িয়ে বললেন, 'আমাদের আর পাহাড়ের নীচে গ্রামের পাশের তাঁবুতে ফেরা ঠিক হবে না। ওরা অসভ্য জাতি, ওটুম্বারা সন্দেহবশত আমাদের তাঁবু আক্রমণও করে বসতে পারে। আমরা ফিরব পাহাড়ের মাথায় মাসাইদের তাঁবুর কাছে পুরোনো জায়গায়। আকালারাও সরাসরি ওখানেই ফিরবে। তারপর টোগো আর আকালা গ্রামে যাক ওটুম্বার কাছে। ওরা তাকে জানাক— আমরা ভালো শিকার পাচ্ছি না, তাই কালই এ তল্লাট ছেড়ে চলে যাব। ওটুম্বা যেন পাহাড়ের মাথায় তাঁবুতে এসে তার প্রাপ্য রাইফেল আর আজকের শিকার করা পশুর চামড়া নিয়ে যায়।'

হেরম্যান চলতে চলতে প্রশ্ন করলেন, 'ওকে ওপরের তাঁবুতে ডেকে কী করবেন?'

ম্যাকুইনা বললেন, 'হিরের লোভ দেখিয়ে সবুজ বানরের খবর জানার চেষ্টা করব। ওরা যে তার খবর জানে এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।'

'যদি ও খবর না দেয়, অথবা যদি এমন হয় যে, আমরা এ পাহাড়ে এসেছি জেনে ওটুম্বা আমাদের কাছে না এসে টোগো আর আকালাকে আক্রমণ করে বসে—তখন?'

'ওটুম্বা যদি মুখ না খোলে তাহলে আর কী করব? ওকে ছাড়া ওই প্রাণীকে এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। বিশেষত ওরাই যদি প্রাণীটাকে কোথাও লুকিয়ে রাখে!'

এরপর একটু থেমে তিনি বললেন, 'আপনার গাইড আর আকালাকে চট করে ওরা আক্রমণ করবে বলে মনে হয় না। আমরা যেমন ওদের ব্যাপারে সতর্ক ওরাও তেমনি। ঠিক যে-কারণে ওরা মাসাইদের তাঁবু গ্রামের পাশে ফেলতে দিল না। তাছাড়া ''আগুন-ছোঁড়া লাঠি''-র ক্ষমতা সম্বন্ধে ওরা ওয়াকিবহাল। দেখলেন-না তাই, ওটার ওপর ওটুম্বার কেমন লোভ!' এরপর আর কেউ কোনও কথা না বলে চলতে লাগল।

সুদীপ্তরা যখন পুবের পাহাড় মাসাইদের ছাউনিতে ফিরে এল তখনও সূর্য ডুবতে ঘণ্টাখানেক বাকি। বেশ দ্রুত ফিরছে তারা। সুদীপ্তদের কিছুক্ষণ আগে সেখানে আকালাও তার দলবল নিয়ে ফিরেছে। সঙ্গে বেশ কিছু শিকার, দুটো হাটারি চিতাও আছে তার মধ্যে। ম্যাকুইনা আকালাদের ডেকে

সুদীপ্তদের একটু দূরে দাঁড়িয়ে মিনিট পাঁচেক কী সব আলোচনা করে নিলেন। তারপর হেরম্যানকে বললেন, 'আপনার গাইড আর টোগোকে এবার ওটুম্বার কাছে পাঠানো যাক! সঙ্গে আরও দু-জন লোকও যাক। আমাদের তাঁবু দুটোও তো খুলে আনতে হবে।'

ম্যাকুইনার কথা শুনে হেরম্যান তাকালেন টোগোর দিকে। টোগো এবার হঠাৎ বলে উঠল, 'না,আমি নীচে যাব না।' টোগোর অনিচ্ছা প্রকাশের কারণ বুঝতে না পেরে হেরম্যান আর সুদীপ্ত তাকিয়ে রইল তার দিকে।

ম্যাকুইনা টোগোর কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কী যেন চিন্তা করার পর হেরম্যানকে বললেন, 'আপনার গাইড যদি না যেতে চায় তাহলে আমার কিছু বলার নেই। আকালা তাহলে একলাই যাবে। ও ভাঙা-ভাঙা বান্টু ভাষাতেও বলতে পারে।' কথাগুলো বলার পর একটু থেমে ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'আমার মনে হয় ওর সঙ্গে আপনার যে পয়সার চুক্তি হয়েছে তাতে আর ওর মনঃপুত হচ্ছে না। অথবা ও সত্যিই ভয় পাচ্ছে ওই আধা-জন্তু, আধা-মানুষগুলোর কাছে যেতে! ওতো আর মাসাই নয়। আসলে এদের মতো গাইডরা আপনাকে মাসাইমারার ওয়াচটাওয়ার থেকে নীর্চে জেব্রার পাল দেখাতে পারে, কিন্তু এসব অভিযানের পক্ষে এরা অনুপযোগী। একটু খোঁজখবর করলেই মাসাই গাইড পেয়ে যেতেন আপনি।'.

হেরম্যান সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকুইনার কথার প্রতিবাদ করে বললেন, 'না, সম্ভবত আপনি ঠিক বলছেন না। আপনার মাসাই রক্ষীদের তুলনায় ও কম সাহসী নয়। আর জঙ্গল সম্পর্কে ওর অভিজ্ঞতা প্রচুর। আমরা আপনাদের মতো দলে ভারী নয়, টোগোই কিন্তু আমাদের নিরাপদে গ্রেট রিফটে এনেছে। ওর যেতে না চাওয়ার পিছনে অন্য কোনও কারণ থাকতে পারে।' এই বলে টোগোর দিকে তাকালেন হেরম্যান।

ম্যাকুইনা আবার বিদ্রুপের স্বরে বললেন, 'নিয়ে এসেছে তো ঠিকই, কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে যায় কি না দেখুন। মাঝপথে ছেড়ে না পালায়।'

টোগো এবার ম্যাকুইনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যদিও আপনি আমার মালিক নন, আপনাকে জবাবদিহি করার কোনও প্রয়োজন পড়ে না, তবুও বলি আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা যে মিথ্যে তা সময় এলেই বুঝতে পারবেন। বরং নিজের লোকেদের কথা ভাবুন! ওরা না আপনাকে ছেড়ে পালায়! আমার মালিকের সাথে আপনার যখন কথা হয়েছে, আমি নীচে যাচ্ছি, তবে আমার কথাটা খেয়াল রাখবেন।'

টোগোর কথা বলার ধরন দেখে হঠাৎ দপ্ করে যেন জ্বলে উঠল ম্যাকুইনার চোখ, কিন্তু পরমুহূর্তে তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে দুর্বোধ্য হেসে বললেন, 'বাঃ, এই তো সাহসীর মতো কথা! দাঁড়াও তোমাদের সাথে যাবার জন্য অন্য দু-জন সঙ্গীর ব্যবস্থা করি।' এই বলে তিনি পা বাড়ালেন, কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আকালার মাসাই দঙ্গলের দিকে।

টোগো সেই সুযোগে চাপা স্বরে হেরম্যানকে বললেন, 'আফ্রিকান্ডারের মতিগতি আমার ভালো ঠেকছে না। আমি নীচে যাচ্ছি, কিন্তু আপনারা সাবধানে থাকবেন। ওর কয়েকজন লোকও বেপাত্তা দেখছি।'

টোগোর কথা শুনে হেরম্যান তাকে কী একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, 'কিন্তু তার আগেই ম্যাকুইনা আবার মুখ ফেরালেন তাদের দিকে। মিনিটখানেকের মধ্যেই টোগো, আকালা আর তার দু-জন সঙ্গীর সঙ্গে রওনা হল পাহাড়ের নীচে ওটুম্বার সন্ধানে।

তারা চলে যাবার পর ম্যাকুইনা গিয়ে ঢুকলেন কাছের একটা তাঁবুতে। হেরম্যান আর সুদীপ্ত বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁদের তাঁবু নীচ থেকে ফেরার সময় টোগোরা সঙ্গে আনবে।

ম্যাকুইনা তাঁবুতে ঢোকার পর হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'টোগো মনে হয় কিছু আঁচ করেছে তাই সাবধানে থাকতে বলল। আমারও যেন মনে হচ্ছে কিছু ঘটবে!'

সুদীপ্ত বলল, 'আমরা সংখ্যায় অল্প। কাজেই সকলের একসাথে থাকাই বাঞ্ছনীয়। যদি বিপদটা পিগমিদের দিক থেকে আসে তবে সেটা ম্যাকুইনার ওপরও আসবে। সে ক্ষেত্রে নয় একসাথে লড়া যাবে। কিন্তু ম্যাকুইনা যদি বিপদের কারণ হন তবে?'

হেরম্যান বললেন, 'আমিও সেই আশঙ্কাই করছি। তবে ঘাবড়ালে চলবে না। আমাদের যে-কোনও ঘটনার জন্য তৈরি থাকতে হবে।' কথাগুলো বলার পর হেরম্যান আস্কারি আর তুতসি কুলিদের কাছে ডেকে নিলেন। সকলকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে তাদের নিয়ে ঢালের ধারে বসলেন টোগোদের ফেরার প্রতীক্ষায়।

মিনিট চল্লিশ পর টোগোরা ফিরে এল। সঙ্গে ওটুম্বা আর তার চারজন দেহরক্ষী। টোগোরা সুদীপ্তদের তাঁবু দুটো আর ম্যাকুইনার তাঁবুও তুলে এনেছে।

তারা আসবার পর ম্যাকুইনা তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

হেরম্যান টোগোকে বললেন, 'ওরা কি আমাদের পশ্চিমের পাহাড়ে যাবার ব্যাপারটা জেনে গেছে?'

টোগো বলল, 'না, খবরটা সম্ভবত নীচের গ্রামে এখনও এসে পৌঁছয়নি। ওরা কিছু বলেনি এ ব্যাপারে। তবে ওপরে আসতে কিছুটা ইতস্তত করছিল। ওদের এখানে ডাকার পিছনে আমার কোনও দুরভিসন্ধি নেই, এ ব্যাপারে আমাকে শপথ করতে হয়েছে ওদের কাছে।'

ম্যাকুইনা সুদীপ্তদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে টোগোর কথা শুনে মুচকি হেসে বললেন, 'তাই নাকি!' তারপর তাকালেন ওটুম্বা আর তার সঙ্গীদের দিকে।

ওটুম্বাও ভালো করে সকলকে একবার দেখে নিয়ে টোগোকে বলল, 'কই, আমাদের শিকার আর আগুন-ছোঁড়া লাঠি কই? একটু পরই অন্ধকার নামবে, আমাদের গ্রামে ফিরতে হবে।'

টোগোর মুখ থেকে তার কথা শুনে ম্যাকুইনা বললেন, 'ওকে বলো সেগুলো আমরা দিচ্ছি, তার সঙ্গে আরও দামি জিনিস ওকে দেব। তবে ওর সঙ্গে কিছু কথা আছে, একটু বসতে হবে।'

টোগো ম্যাকুইনার কথা ওটুম্বাকে বলতেই ওটুম্বা একটু সন্দিগ্ধভাবে বলল, 'সাদা চামড়া আমার সঙ্গে কী আলোচনা করবে? তাহলে তাড়াতাড়ি কথা বলতে বলো।'

খাদের ঢাল থেকে একটু দূরে সরে এসে এর পর গোল হয়ে বসল সবাই। সুদীপ্তদের পিছনে হুটু আস্কারিরা দাঁড়িয়ে রইল আর ম্যাকুইনার পিছন ঘিরে দাঁড়াল আকালা সমেত মাসাইরা। যারা মাটিতে বসে আছে তাদের ঘিরে একটা বৃত্তাকার ব্যূহ রচনা করল হুটু আস্কারি আর মাসাইরা। আস্কারিদের পিছনে তুতসি কুলির দল।

টোগোর মাধ্যমে কথা শুরু হল।

ম্যাকুইনা ওটুম্বাকে বললেন, 'আমরা কাল তোমাদের এ তল্লাট ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তবে তোমার কাছ থেকে তার আগে একটা খবর জানতে চাই। যে খবর বললে তোমাকে অনেক দামি জিনিস দেব।'

'কী খবর?' সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করল ওটুম্বা।

'আচ্ছা, তোমাদের এ তল্লাটে কী কী প্রাণী আছে বলো তো?' প্রশ্ন করলেন ম্যাকুইনা।

'সে তো তোমাদের বলেইছি। আবার জানতে চাইছ কেন?' ভ্রু কুঁচকে বলল ওটুম্বা।

ম্যাকুইনা বললেন, ' হ্যাঁ, তুমি তা বলেছ বটে, কিন্তু তাছাড়া অন্য কোনও প্রাণী? এই ধরো, গরিলার মতো অন্য কোনও দু-পেয়ে প্রাণী?'

ওটুম্বা এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইল ম্যাকুইনার মুখের দিকে।

ম্যাকুইনা মৃদু হাসলেন। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট চামড়ার থলি বার করে সেটা খুলে হাতে ঢালতেই তাঁর হাতের তালুতে একরাশ সাদা ছোটো ছোটো পাথরকুচি শেষ বিকেলের আলোয় ঝলমল করে উঠল। হিরের কুচি! ওরকম একটা পাথর বসানো আছে তাঁর নিজের দাঁতেও। আঁজলা ভরা হিরের কুচি ম্যাকুইনা এক মুহূর্তের জন্য মেলে ধরলেন ওটুম্বার সামনে। সেগুলো দেখে ওটুম্বার চোখ দুটোও চক্‌চক্ করে উঠল।

এরপর ম্যাকুইনা আবার হিরেগুলো থলির ভিতর রেখে সেটা ওটুম্বার মুখের সামনে নাচিয়ে বললেন, 'এটা আমি তোমাকে দেব, যদি তুমি আমাকে প্রশ্নের উত্তর দাও। দো-পেয়ে দানব বানর, সবুজ রং?'

ওটুম্বা, ম্যাকুইনার সরাসরি প্রশ্ন শুনে মুহূর্তের জন্য চমকে উঠল। তারপর বেশ গম্ভীরভাবে বলল, 'না, ওরকম কোনও প্রাণী এ তল্লাটে নেই।'

ম্যাকুইনা তার কথা শুনে তাকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পাহাড়ের নীচের গ্রাম থেকে হঠাৎ ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া করল ওটুম্বা আর তার সঙ্গীরা। মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল তারা। ওটুম্বা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমরা এখনই ফিরে যাব, আর কথা বলব না।'

ম্যাকুইনা বললেন, 'কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর তো এখনও দিলে না?'

ওটুম্বা টোগোকে একটু রুষ্টভাবে বলল, 'সাদা চামড়ার আর কোনও কথার জবাব আমি দেব না। কালই যেন ওরা এ তল্লাট ছেড়ে চলে যায়। আমি এখন যাচ্ছি।'

ওটুম্বার কথা শুনে ম্যাকুইনা এবার একটা বাঁকা হাসি হেসে টোগোকে বলল, 'বামনটাকে বলো, আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে ও নীচে যেতে পারবে না। ও নীল বানরের সন্ধান জানে। সে কোথায় আছে তা না বললে ওকে আমি ছাড়ব না।'

টোগো এবার উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাকুইনার উদ্দেশে বলল, 'এ-কাজ কিন্তু ঠিক হবে না। ও যখন বলবে না বলছে তখন ওকে যেতে দিন। ওরা নিরাপদে নীচের গ্রামে ফিরবে, এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি ওদের এখানে এনেছি। জঙ্গলের একটা নিয়ম আছে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে ফল খারাপ হবে।'

ম্যাকুইনা উঠে দাঁড়ালেন। হেরম্যান আর সুদীপ্তও উঠে দাঁড়াল।

টোগোর কথায় ম্যাকুইনা কর্কশস্বরে বললেন, 'তোমাকে যা বলতে বলেছি বলো। বললাম তো, আমার কথার জবাব না দিলে ওকে আমি ছাড়ব না।'

হেরম্যান ব্যাপারটা সামাল দেবার জন্য ম্যাকুইনার উদ্দেশে বললেন, 'টোগো ব্যাপারটা ঠিকই বলেছে। আপনার মতো আমিও ওই প্রাণীটার সন্ধানে এতটা দূরে ছুটে এসেছি। তবুও বলছি, ওটুম্বাকে যেতে দেওয়াই ভালো। ভুলে যাবেন না— আমরা কিন্তু ওদের রাজত্বেই আছি।'

হেরম্যানের কথা শুনে ঝাঁঝিয়ে উঠে ম্যাকুইনা বললেন, 'আছি তো কী হয়েছে! ওদের তাই বলে ভয় পেতে হবে নাকি? আপনি চুপ করে থাকুন।'

ঢাকের শব্দ একটানা বেজেই চলেছে। টোগো-ম্যাকুইনা আর হেরম্যানের কথাবার্তা ওটুম্বারা কিছুই বুঝতে পারছে না, কিন্তু ঢাকের শব্দে ক্রমশই চঞ্চল হয়ে উঠছে ওরা।

ম্যাকুইনার কথা শুনে হেরম্যানও উত্তেজিত হয়ে তাঁর উদ্দেশে বললেন, 'আপনি কি আমাকে ধমকাচ্ছেন নাকি? আমি আপনার মাসাই গার্ড নই। আমারও এ ব্যাপারে কথা বলার অধিকার আছে। বিশেষত টোগোর প্রতিশ্রুতিতে যখন ওদের এখানে আনা হয়েছে তখন কথা বলবই। আমি আবারও বলছি ওদের যেতে দিন।' কথাটা জোরের সঙ্গে বললেন হেরম্যান।

হেরম্যানের কথার জবাবে ম্যাকুইনা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই একটা ঘটনা ঘটল। ওটুম্বা ও তার সঙ্গীরা সম্ভবত কোনও একটা বিপদ যে ঘটতে চলেছে তা আঁচ করে ছিল। মুহূর্তের জন্য ওটুম্বা ও তার সঙ্গীদের মধ্যে কী একটা কথা হল, আর তার পরমুহূর্তেই মাসাইদের ব্যূহ ভেদ করে তাদের লম্বা পায়ের ফাঁক গলে ওটুম্বা তাদের সঙ্গীদের নিয়ে তিরের মতো ছুটল পাহাড়ের ঢালের দিকে। মুহূর্তের জন্য অসতর্ক হয়ে গিয়েছিল সবাই। আর তার পরেই ম্যাকুইনা তাঁর কোমর থেকে রিভলভার টেনে বার করে চিৎকার করে উঠলেন, 'ধরো ধরো! শয়তান বামন সর্দার যেন পালাতে না পারে। ওকে কিন্তু জ্যান্ত ধরতে হবে!'

সুদীপ্তরা দাঁড়িয়ে রইল। ম্যাকুইনা আর তাঁর সঙ্গীরা ছুটল ওটুম্বাদের পিছনে। খাদের ধার ঘেঁষে নীচে নামার পথের দিকে ছুটছে ওটুম্বারা। প্রথমে দুজন পিগমি তারপর ওটুম্বা, তার পিছনে আরও দুজন পিগমি। তাদের কিছুটা তফাতে একটা লম্বা দড়ি হাতে আকালা ও অন্য মাসাইদের নিয়ে ম্যাকুইনা। ক্রমশই দূরত্ব কমে আসছে দু-দলের মধ্যে। ওটুম্বারা তখন প্রায় নীচে নামার পথের মুখে পৌঁছে গেছে, আকালার সাথে তাদের মাত্র হাত কুড়ির ব্যবধান, সে প্রায় তাদের ধরে ফেলেছে। ঠিক এমন সময় তাদের সর্দারকে বাঁচাবার জন্য একটা চেষ্টা করতে গেল ওটুম্বার পিছু নেওয়া পিগমি দু-জন। আকালাদের থামাবার জন্য তারা থেমে গিয়ে তিরধনুক খুলে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু তির চালাতে পারল না তারা। ম্যাকুইনার রিভলভার গর্জে উঠল। ধনুক হাতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল তারা। আর তার পর মুহূর্তেই আকালা তার হাতের দড়ির ফাঁসটা মাথার ওপর একবার ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল ওটুম্বাকে লক্ষ্য করে। যেমন করে ফাঁস দিয়ে জীবজন্তু ধরা হয়, ঠিক তেমনই দড়ির ফাঁসে ওটুম্বাকে ধরে ফেলল আকালা। মাসাইরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটুম্বার ওপর। ওটুম্বার অন্য দুজন সঙ্গী তখন ঢাল বেয়ে নীচের দিকে হরিণের মতো ছুটতে শুরু করেছে। এই পুরো ব্যাপারটা ঘটতে খুব বেশি হলে আধ মিনিট সময় লাগল। হতভম্ব অবস্থা কাটিয়ে হেরম্যান, সুদীপ্ত, টোগোরাও এবার ছুটল জায়গাটার দিকে।

দড়ির ফাঁসে আটক ক্রুদ্ধ সিংহের মতো ছটপট আর চিৎকার করছে ওটুম্বা। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে তার। আকালার দড়ির ফাঁস এঁটে বসেছে তার গলায়। ইতিমধ্যে আরও এটা দড়ি বেঁধে ফেলা হয়েছে তার কোমরে। দড়ির দু-প্রান্ত ধরে আছে দু-জন মাসাই। তাদের ঘিরে ম্যাকুইনাও অন্য মাসাইরা। কয়েক হাত দূরে মাটিতে চিত হয়ে পড়ে আছে ওটুম্বার দেহরক্ষী দু-জন। রক্ত আর ধুলোতে মাখামাখি তাদের দেহ। সুদীপ্তরা যখন জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছল তখনও পিগমি দুজনের মধ্যে একজনের দেহে প্রাণ আছে। থর থর করে কাঁপছে তার রক্তমাখা দেহ। তার ডান হাতে তখনও ধরা আছে ক্ষুদ্রাকৃতি তির। সেটা ছোঁড়ার সময় পায়নি সে। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাঁপতে কাঁপতে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে সকলের দিকে। বীভৎস দৃশ্য! সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে হেরম্যান তিরস্কারের ভঙ্গিতে ম্যাকুইনাকে বললেন, 'আপনি দুটো মানুষকে খুন করলেন?'

ম্যাকুইনা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জবাব দিলেন, 'এরা আবার মানুষ নাকি? এরা জন্তু। মানুষের চেয়ে বাঁদরের সঙ্গেই এদের মিল বেশি।'

ম্যাকুইনার কথা শুনে হেরম্যান উত্তেজিত হয়ে চিৎকার

করে বললেন, 'তাহলে কী আপনিও মানুষ? শুধু শুধু আপনি এদের খুন করলেন! আমি এসব সহ্য করব না। নীল বানর মানুষের প্রাণের চেয়ে দামী নয়। ওটুম্বাকে এখনই ছেড়ে দিন।'

ম্যাকুইনাও এবার চিৎকার করে বললেন, 'না, শয়তান বামনটাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। ওরাই নীল বানরকে লুকিয়ে রেখেছে। আমার হাতে তাকে তুলে দিতে হবে ওকে। নইলে ওর দশা ওর সঙ্গীদের মতো হবে। তাছাড়া ওর সঙ্গে আর একটা হিসাব বাকি আছে। ওরাই হত্যা করেছে আমার বাবাকে।'

হেরম্যান, ম্যাকুইনার কথার প্রত্যুত্তরে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আবারও একটা কাণ্ড হল! মাটিতে পড়ে থাকা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর পিগমিটা দেহের সব শক্তি দিয়ে জীবনে শেষবারের মতো একবারের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে হাতের ক্ষুদ্রাকৃতি তিরটা বাগিয়ে ধরে টলমল পায়ে ছুটে এল দঙ্গলের মধ্যে তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা আকালাকে লক্ষ্য করে। শেষ মুহূর্তে তাকে দেখতে পেয়ে সরে গেল আকালা। কিন্তু তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মাসাই আকালার বিরাট দেহের আড়ালে ছুটে আসা পিগমিটাকে দেখতে পায়নি। আকালা সরে গেল ঠিকই, তবে মৃত্যুপথযাত্রী পিগমিটা তার হাতের ক্ষুদ্রাকৃতি তিরটা বসিয়ে দিল সেই মাসাইয়ের উন্মুক্ত উরুতে। পিগমিটার দেহে মনে হয় ওইটুকুই জীবনশক্তি অবশিষ্ট ছিল। আঘাত করেই সে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই একজন মাসাই তার স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে দিল পিগমিটার নিথর দেহ লক্ষ্য করে, যদিও তার আর প্রয়োজন ছিল না।

মাসাইয়ের পায়ের বাহ্যিক আঘাত সামান্যই। উরুর চামড়ায় সামান্য কয়েকটা রক্ত বিন্দু ফুটে উঠেছে মাত্র। মৃতপ্রায় পিগমিটার দেহে তেমন জোর ছিল না। কিন্তু ওই ক্ষুদ্রাকৃতি অস্ত্রের সামান্য একটা আঁচড়ের পরিণতি কী ভয়ংকর তা কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রত্যক্ষ করল সবাই। নিশ্চল পিগমিটার দিকে সুদীপ্তরা তাকিয়ে ছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় ওটুম্বার চিৎকারও কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়েছিল। দড়ি বাঁধা অবস্থাতেই এবার সকলকে চমকে দিয়ে ওটুম্বা হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠল। সকলে ওটুম্বার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল সে তীরে খোঁচা- খাওয়া মাসাইটাকে লক্ষ্য করে হাসছে। আর পরমুহূর্তে মাসাইটার দিকে চোখ পড়তেই সকলে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। কাঁপতে শুরু করেছে মাসাইটা। তার মুখ বেঁকে যাচ্ছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে। তীব্র বিষক্রিয়ার আক্রান্ত হয়েছে সে। তিরের খোঁচায় মৃত্যু প্রবেশ করছে লোকটার দেহে। অতি দ্রুত বিষ ছড়িয়ে পড়েছে লোকটার শিরা-উপশিরায়। এরপর আধ মিনিটও দাঁড়াতে পারল না সে। কাঁপতে কাঁপতে

হঠাৎই কাটা কলাগাছের মতো দড়াম করে পড়ে গেল সে মৃত পিগমিটার দেহের ওপর। মাসাইটার মুখের কষ বেয়ে নেমে এল রক্তধারা। খুব জোরে একবার কেঁপে উঠে চিরদিনের মতো নিথর হয়ে গেল তার দেহ। কী ভয়ংকর মৃত্যু! শিউরে উঠল সকলে।

ওটুম্বা ম্যাকুইনার উদ্দেশে দুর্বোধ্য ভাষায় কয়েকটা শব্দ বলল। ম্যাকুইনা কথার মানে বুঝতে পারলেন না। কিন্তু টোগো সুদীপ্তর কানে চাপা স্বরে বলল, 'ও বলছে, সাদা চামড়া, তুমিও মরবে।'

ম্যাকুইনা কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইলেন মৃত মাসাইটার দেহের দিকে। তারপর নীচু হয়ে তার দেহ থেকে রাইফেলটা খুলে নিয়ে হেরম্যানের উদ্দেশে বললেন, 'ঘটনা দেখার পরও কি বলবেন জন্তু দুটোকে মেরে আমি ঠিক করিনি?'

হেরম্যান বিস্ময়ভাব কাটিয়ে দৃঢ়ভাবে ম্যাকুইনাকে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, এখনও বলছি আপনি ঠিক করেননি। আপনি ওটুম্বাকে আটকাবার চেষ্টা না করলে এসব ঘটনা ঘটতই না। এই মাসাইটাকেও এভাবে মরতে হত না। এ রকম ঘটনা আরও ঘটার আগে আপনি ওটুম্বাকে ছেড়ে দিন।'

হেরম্যানের কথা শুনে ম্যাকুইনা ক্রোধে চিৎকার করে উঠে বললেন, 'আপনি থামুন এবার। আমার কাজে বাধা দিতে আসবেন না। আমি শুধু দুটো বাঁদর মেরেছি। প্রয়োজন হলে এবার মানুষও মারব।'

ম্যাকুইনার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে অসুবিধা হল না হেরম্যান বা সুদীপ্তর। হেরম্যান প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে কোমর থেকে রিভলভার বার করে ম্যাকুইনাকে চেঁচিয়ে বললেন, 'আপনি আমাদেরও মারার ভয় দেখাচ্ছেন? এত বড়ো সাহস! তাহলে এখনই ফয়সালা হয়ে যাক।'

মুহূর্তের মধ্যে হাত দশেকের তফাতে দুটো দলে যেন আপনা থেকেই বিভক্ত হয়ে গেল সকলে। এক পাশে রিভলভার হাতে ম্যাকুইনা আর রাইফেলধারী জনা কুড়ি মাসাই, অন্যদিকে হেরম্যান, সুদীপ্ত, টোগো, চারজন হুটু আস্কারি ও চারজন তুতসি কুলিসহ মোট এগারো জন লোক। তবে শেষ চারজনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। বর্শা উঁচিয়ে তারাও দাঁড়াল সুদীপ্তদের পিছনের সারিতে।

মাঝখানে মাটিতে পড়ে থাকা পিগমি আর মাসাইটার মৃতদেহ আর তার দুপাশে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে সার বেঁধে দাঁড়ানো যুযুধান দু-পক্ষ। উভয়েরই রাইফেল-রিভলভারের নল তাগ করা অপর পক্ষের দিকে। হেরম্যান ও ম্যাকুইনা দু-জনেই নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন রিভলভার হাতে। ম্যাকুইনার মুখে হিংস্রতার স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠেছে, হেরম্যানের ভাবলেশহীন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুখ। এই মুহূর্তে যে কোনও ঘটনার জন্য প্রস্তুত তিনি। ম্যাকুইনারা সংখ্যায় ও শক্তিতে সুদীপ্তদের দ্বিগুণ। সংঘর্ষ হলে ম্যাকুইনাদের ক্ষতি হবে ঠিকই কিন্তু সুদীপ্তদের ক্ষতির পরিমাণ বেশি হওয়া স্বাভাবিক। সুদীপ্ত ভয় পায়নি, সে-ও রিভলভার খুলে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কী হতে পারে তা অনুমান করতে অসুবিধা হল না তার। যে ভাবে হেরম্যান ও ম্যাকুইনা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন তাতে যে-কোনও মুহূর্তে কোনও পক্ষ গুলি চালানো শুরু করলে কোনও পক্ষ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত এ লড়াই থামবে না। সুদীপ্ত বুঝতে পারল এ লড়াই থামাতে হবে। পরে কৌশলে চেষ্টা করতে হবে ম্যাকুইনাকে প্রতিহত করার। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধভাবে কেটে গেল। নীচ থেকে ভেসে আসা ঢাকের শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে। দম বন্ধ করে দু-দল তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। সুদীপ্ত হঠাৎ রিভলভার নামিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল দু-পক্ষের মাঝখানে। তারপর হেরম্যান আর ম্যাকুইনা উভয়ের উদ্দেশে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে কাজটা আমরা ঠিক করছি না। আমরা কেউই দুর্বল নই, লড়াইটা এখনই হতে পারে। কিন্তু তাতে কোনও পক্ষেরই লাভ হবে না। বরং ক্ষতিই হবে। আমরা লড়াই করতে এখানে আসিনি, এসেছি সবুজ বানরের খোঁজে। আমার মনে হয় এ লড়াইয়ে যে-ই জিতুক না কেন, লড়াইয়ের ফলে তার আসল উদ্দেশ্য পণ্ড হবে। বরং মাথা ঠান্ডা করে বিবাদের নিষ্পত্তি করাই শ্রেয়। আমার প্রস্তাবটা মিস্টার হেরম্যান ও মিস্টার ম্যাকুইনা উভয়কেই ভেবে দেখতে বলছি।'

আবার কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। সুদীপ্তর কথার যে যুক্তি আছে তা সম্ভবত বুঝতে পারলেন ম্যাকুইনা। তাঁর রিভলভারের মুখটা আস্তে আস্তে নীচের দিকে নেমে এল। হেরম্যানও তাঁর অস্ত্র নীচে নামালেন।

ম্যাকুইনা সুদীপ্তর উদ্দেশ্যে বললেন, 'ঠিক আছে আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি। রাতে বসে আলোচনা করা যাবে।'

সুদীপ্ত বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ মিস্টার ম্যাকুইনা। এ পথটাই ঠিক।'

'আমি আপনার প্রস্তাব মানলাম ঠিকই, কিন্তু কেউ

কোনও চালাকির চেষ্টা করলে তার পরিণতি পিগমি দু-জনের মতো হবে।' এ কথা বলে হেরম্যানের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন তিনি।

হেরম্যান ম্যাকুইনার কথার প্রত্যুত্তরে কোনও কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবার ঝঞ্ঝাট এড়াতে সুদীপ্ত হেরম্যানকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে ভিড়ের বাইরে বার করে আনল।

জমায়েতটা ভেঙে গেল। ম্যাকুইনা দলবলসমেত দড়ি বাঁধা ওটুম্বাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল, কিছু দূরে তাঁবুগুলোর দিকে। সুদীপ্ত হেরম্যান আর টোগো গিয়ে বসল, একটু দূরে একটা ফাঁকা জমিতে। তুতসি কুলিরা হুটু আস্কারিদের তত্ত্বাবধানে লেগে গেল সুদীপ্তদের তাঁবু ফেলার কাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য ডুব দিল পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে। সুদীপ্তদের চারপাশে পাহাড়ের মাথায় নেমে এল এক শান্ত সমাহিত ভাব। শুধু মাটিতে পড়ে থাকা পিগমি দুজন আর মাসাইরক্ষীর মৃতদেহ পাহাড়ের মাথায় ভয়ংকর ঘটনার চিহ্ন হয়ে রইল। সুদীপ্তরা দূর থেকে দেখতে পেল ওটুম্বাকে নিয়ে গিয়ে তাঁবুগুলোর পিছনে একটা গাছের গুঁড়ির সাথে বাঁধা হচ্ছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল। ম্যাকুইনাদের তাঁবুগুলোর সামনে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠল। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিক থেকে বাতাস বইতে লাগল। এ বাতাসের ব্যাপারটা এ পাহাড়ের মাথায় প্রথম দিন সুদীপ্তরা যখন তাঁবু ফেলেছিল তখনও দেখেছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বাতাস বাড়ে। সারা দিন ধরে আফ্রিকার প্রখর রোদে জ্বলেপুড়ে যাওয়া পৃথিবীর বুকে শান্তি এনে দেয়।

সুদীপ্তদের তাঁবু খাটানো হয়ে গেলেও খোলা আকাশের নীচেই তারা বসে রইল চুপ করে। হেরম্যানের মাথা ঠাণ্ডা হবার পর তিনি সুদীপ্তকে বললেন, 'কাজটা তুমি ঠিকই করেছ। অতটা উত্তেজিত হওয়া আমার উচিত হয়নি। আসলে অনর্থক ম্যাকুইনার জন্য মানুষ মরতে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।'

সুদীপ্ত বলল, 'যা হয়ে গেছে তা আর ভেবে লাভ নেই। এখন আমাদের কী করা উচিত তা আলোচনার প্রয়োজন।'

টোগো বলল, 'আমাদের বিপদ কিন্তু দু-দিকেই। একদিকে ওই আফ্রিকান্ডার আর অন্য দিকে পিগমিরা। যে পিগমি দু-জন পালাল তারা নিশ্চয়ই গ্রামে গিয়ে খবর পৌঁছে দেবে। ওরা কাউকে ছাড়বে না। আমি ওটুম্বাকে ডেকে এনেছি, তাই আমার প্রতি পিগমিদের আক্রোশ বেশি হবে।'

সুদীপ্ত শুনে বলল, 'আমার ধারণা ওটুম্বা দানব-বানরের সন্ধান দিলেও ম্যাকুইনা তাকে ছাড়বে না। ম্যাকুইনা সম্ভবত তাঁর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবেন।'

টোগো মন্তব্য করল, 'হ্যাঁ, আমারও ধারণা আফ্রিকান্ডার খুন করবে ওটুম্বাকে, তবে কাজটা সে চট করে করবে না। ওটুম্বার কাছ থেকে আগে সবুজ বানরের সন্ধান জানার চেষ্টা করবে। তবে সে কাজে আমার সাহায্য লাগবে আফ্রিকান্ডারের। ওই সুযোগটাই আমি কাজে লাগাবার চেষ্টা করব। ওটুম্বাকে জানিয়ে দেব আমরা ওর শত্রু নই, আমরা ওকে ছাড়াবার চেষ্টা করছি। ওটুম্বা আমার কথায় ভরসা করে এখানে এসেছিল, ওর জন্য প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নেব।'

সুদীপ্ত তার কথার জবাবে বলল, 'তোমার মতলবটা মন্দ নয়। তবে ম্যাকুইনার সংস্পর্শ ছেড়ে যত দ্রুত সম্ভব চলে যাওয়া প্রয়োজন।'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, এতক্ষণ ধরে আমিও এ-কথাই ভাবছিলাম। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে করে সবুজ বানরের সন্ধানে এ অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার সঙ্গে তোমরা যারা এসেছ, আস্কারি বা কুলিরা যারা এসেছে তাদের পেটের খিদে মেটাতে সামান্য পয়সার আশায় সকলের জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারটাও আমার লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন। আমি ভাবছি কালই আমাদের ফেরার পথ ধরব।' শেষ কথাটা বলার সময় হেরম্যানের গলায় স্পষ্ট বিষণ্ণতা ফুটে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সুদীপ্ত বলল, 'কি আর করা যাবে! তবে ম্যাকুইনার সঙ্গে মাথা ঠান্ডা রেখে শেষ একবার কথা বলে নেওয়ার প্রয়োজন। আমরা যে কাল চলে যাচ্ছি, সেটা তাঁকে জানানো যেতে পারে। আশা করি তার এ ব্যাপারে আপত্তি থাকবে না। আমরা চলে গেলে তিনি নিজের মতো কাজ করতে পারবেন। চলুন, এবার তাঁর তাঁবুর দিকে যাওয়া যাক।' এই বলে সুদীপ্ত উঠে দাঁড়াল। সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে হেরম্যান আর টোগোও উঠে পড়ল। তিন জনে হাঁটতে শুরু করল ম্যাকুইনার তাঁবুর দিকে।

(চলবে)

ছবি : সুদীপ্ত দত্ত

মাছধরা

ঋতুপর্ণ বসু

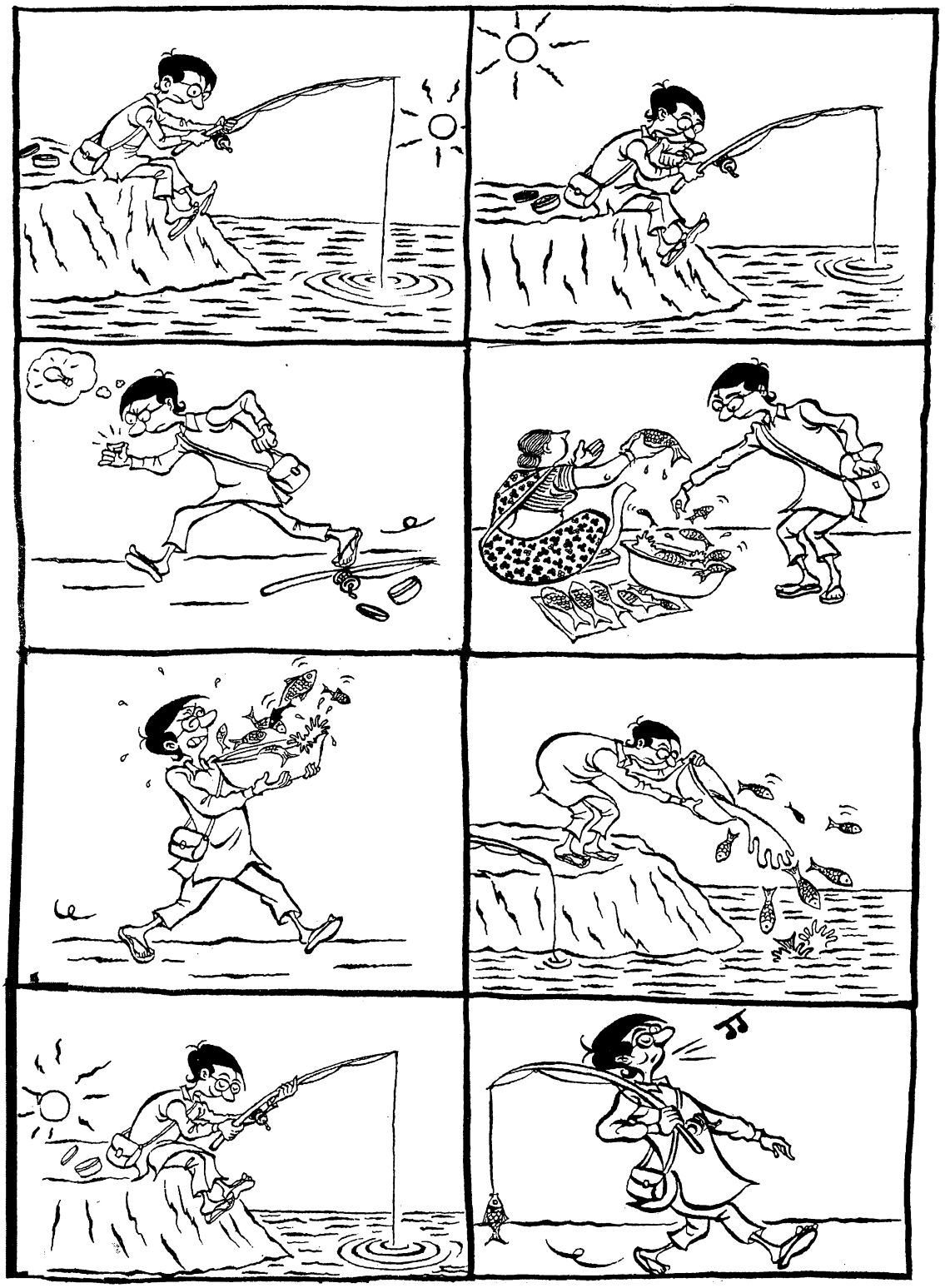

বোনবিবি

শানু লাহিড়ী

আমাদের বিড়ালের নাম বোনবিবি। একদিন আমার মেয়ে অফিস থেকে ফিরে আমাকে বলল, 'তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি।' খাবার টেবিলে ছোট্ট একটা কাগজের মোড়কে একটা খাওয়ার জিনিসই হবে—সিঙাড়া কিংবা কচুরী কিছু একটা, আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে খুলে দেখি—এঃ বাবাঃ কী রে? একটা পেতকুড়ি বিড়ালের বাচ্চা! দেখি বলল মিউ, খুব আস্তে শোনাই গেল না। সে একেবারে রোগা, হাড়গিলে সুন্দরী, ময়লা হয়ে আছে। তার ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখি সরু সরু হাড়গুলো হাতে ফুটছে। এতো রোগা সে। কী হল, কোথা থেকে পেলি? বলল অফিসের সামনে দিয়ে আসছি আমি আর অনু, দেখি ছোট্ট একটা বিড়াল রাস্তায় নামতে যাচ্ছে, এখনিই তো গাড়ি চাপা পড়ে মারা যাবে! ও আর ওর বন্ধু অনু গিয়ে সেটাকে নর্দমা থেকে তুলে আনল, তারপর একটা দোকান থেকে কাগজের ঠোঙা চেয়ে তাকে মুড়ে ব্যাগে ভরে বাড়ি। রাস্তায় আসতে আসতেই ওরা নাম দিয়েছে 'বোনবিবি'। আমার নামটা ভালোই লাগল। ফেলে দিতে পারি না—অত ছোট বাচ্চা, বেচারি একা হয়ে গিয়েছে, নিশ্চয়ই ওর মা-ও(বিড়াল) খুব খুঁজছে ওকে। ছোট তো, হারিয়ে গিয়েছে। তাকে পরিষ্কার করে একটু হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাইয়ে - তার সঙ্গে দুধ দিতে খেলো -। আর ছোট্ট একটা জায়গা করা হল ওর জন্য, ও ঘুমিয়ে পড়লো। এদিকে আমাদের দুটো কুকুর এলো আর আয়লা, তারা ভীষণ জানতে চায় কি এনেছো বাড়ীতে, আমরা পছন্দ করছি না। চেঁচাতে লাগলো। ছোট্ট বিড়াল - সে বেচারা ভয় পেয়েছে। পরদিন আবার ওষুধ, দুধ, একটু মাছ ইত্যাদি খাওয়ানো হলো - আস্তে আস্তে আমাদের কাছে আসতো - এবং একটু একটু সেরে উঠলো। একটু মোটা হলো, আর সেই ছুঁচ-খোঁচা হাড়ও আর হাতে ফুটতো না। ওর ভয়ও কেটে গেলো।

কিন্তু কুকুরদের সঙ্গে তার কিছুতেই ভাব আর হচ্ছে না। বড় এলোর তবু রাগ কমলো, ছোট আয়লার রাগ আর কিছুতেই কমে না, কারণ হয়তো আমরা একটু বেশী নজর দিচ্ছি বিড়ালটার ওপর, বেশি ভালবাসছি। বিড়াল কাছে গেলেই আয়লা হাউ হাউ করে প্রায় তেড়ে আসে আর বিড়ালও রেগে ফ্যাঁচ করে একটা উত্তর দেয় — তাতে আয়লা ভয় পায়। কিন্তু ক্রমশ ওদের ভাব হলো, তবে বেশ কিছু মাস পরে। তোমাদের বলি — ৫/৬ মাস পর বোনবিবির এখন চেহারাটা কেমন হয়েছে — সুন্দর মুখখানা, এদিক ওদিক সরু গোঁফ বেরিয়েছে, সাদা ধপধপে গায়ে মাঝে মাঝে হালকা খয়েরি আর কালো বড় বড় ছোপ, মাথাটা কালো, ল্যাজটা দারুণ — লম্বা লম্বা লোমে ভরা, ল্যাজের ডগাটা যখন উঠিয়ে নাড়ে তখন বোঝা যায় কি সুন্দর দেখতে। যখন আমাদের টেবিলে বসে থাকে আর ল্যাজটা বাইরে ঝোলে, সে নাড়ায় অল্প অল্প করে। এখন তো বোনবিবির কুকুরদের সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছে, তাই টেবিলে বসেই ও আয়লার সঙ্গে খেলা করে। তবে বেশির ভাগ দেখি ওকে বাঁ হাত দিয়ে মারছে, আয়লা তাতে রাগ করে না— মুখটা আরও কাছে আনে, মুখে মুখে ঠেকায় আবার চলে যায়। ওরা যখন লুকোচুরি খেলে তখন কেলেঙ্কারি — চারিদিক থেকে দেখবে

জিনিষ পড়ছে। বিড়াল তো সব জায়গায় চড়তে পারে, ওপর থেকে একটা সাজানো জিনিষ পড়ছে, কয়েকটা বই পড়ে গেলো, রথের মেলায় কেনা কিছু জিনিষ পড়ে গেলো, মাটির সাপটা কে দিল ছুঁড়ে ফেলে — এই সব অত্যাচার বেড়ে যেতে লাগলো।

বোনবিবি আমার মেয়ের সঙ্গেও টুকি খেলতো। মেয়েকে সবাই দিদি বলে চেনে। ও লুকিয়ে থেকে টুকি বললে বোনবিবি চনমন করে উঠতো, ল্যাজ উঁচু করে ছুটতো দেখতে কোথায়। যদি একবার বুঝতে পারত যে দিদি ঐ দরজার পাশে লুকিয়ে, তখন ও দরজার সামনে গিয়ে বসে পড়তো, বলতো এবার কোথায় যাবে! আর যদি টেবিলের পাশে চেয়ারের পেছনে লুকিয়ে থাকত, টুকি বললে দৌড়ে এসেই বুঝতে পারত কোথায় হতে পারে! টেবিলের ওপরে উঠে খুব ধীরে ধীরে এসে বাঁ হাতে (পা) দিয়ে দিদির মাথায় দুটো টোকা মারে, আর দিদি তো চমকে যায়। এলো, আয়লা, বোনবিবি, পাশের বাড়ির কুকুর— সে আমাদেরও কুকুর তবে সে পাশের বাড়িতে থাকে — এদের যদি বলি ঐ দিদি আসছে, ওরা সবাই কান খাড়া করে দাঁড়ায়, শুধু বোনবিবি টেবিলে কিছু বইয়ের পাশে গা ঘেঁষে বসে বেশ রসিয়ে রসিয়ে দিদিকে দেখে। অর্থাৎ দিদি এলে ওরা দারুণ খুশি হয়।

বোনবিবি যখন কুকুরদের সঙ্গে খেলে না তখন আমার আঁকা ছবির ওপর চড়ে বসে। কখনও আলমারির ওপর, কখনও রান্নাঘরের কাবার্ডের তলায়, নয় তো একেবারে জানলা দিয়ে লাফিয়ে ওপরে তার নিজস্ব বাগান বাড়ি আছে সেখানে পালায়। আমাদের জানলার বাইরে বেশ একটু জায়গা আছে, দু-চারটে ছোট গাছ আছে, সেইখানে বোনবিবি রোদ পোয়াতো। একদিন ও উঠে জানলার ওপরে যে প্যারাপেট তার ওপর চড়েছিল, নামতে পারছিল না— কোনও রকমে দিদি তাকে নামিয়ে ছিল। তারপর দিদি এই জানলা থেকে প্যারাপেটের ওপরে যাবার জন্য লম্বা একটা সরু কাঠের তক্তা লাগিয়ে রাস্তা করে দিয়েছে। বোনবিবির রাগ হলে বা অড়া খেলে ও সোজা জানলা দিয়ে বেরিয়ে রোদ পোয়াতে যায়, সারা দিন থাকে, যখন খিদে পায় আসে। জানলার ওপর ওর বাগান বাড়ি।

মাঝে মাঝে বোনবিবি কি করে জানো? প্লাস্টিক ব্যাগ যদি খালি পায় মাটিতে পড়ে বা কোথাও, তার মধ্যে ঢুকে বসে থাকে, অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়ে ওর মধ্যে। দিদি যখন অফিস যায় তখন দেওয়ালের গায়ে সব ব্যাগ সাজানো থাকে,

ভাঙে, পা ঝাড়তে ঝাড়তে আস্তে আস্তে চলে যায় জানলা দিয়ে বেরিয়ে ওর বাগান বাড়িতে। খাবার খেতে খেতে যদি দেখি ওর শেষ হয়ে গিয়েছে তখন যদি আরও একটু দিয়ে দি তখন ও কিন্তু আর খাবে না, ঠিক ঐ রকম কায়দায় উঠে চলে যাবে। তখন এমন রাগ হয় যে কি বলব।

কাল বোনবিবির জন্যে একটা শীতের জামা এনে দিয়েছে দিদি। তাতে বোনবিবি প্রথমটা আপত্তি জানায় — বলে কেন আবার এতো করতে গেলে তুমি, ইত্যাদি — কিন্তু পরে জামা পরিয়ে দেবার পর খুব খুশি। জামাটা কালো, দুটো হাত বাদ হলো, এবং ওর কোমর পর্যন্ত — বোনবিবি জামা পেয়ে খুব খুশি, তাই সে এবার দিদির হাতটা ধরে কিছুক্ষণ বসে রইলো, মিষ্টি মিষ্টি হাসি। কিন্তু আয়লা ওকে বুঝতে পারেনি — জামা পরা বোনবিবি তো কোনদিনও দেখেনি, ও ভেবেছে এ কোথাকার শেয়াল এলো। ওকে শুঁকতে লাগলো - চেনা গন্ধ অথচ চেহারা বদলে গিয়েছে - অনেকক্ষণ পর বুঝলো, নাঃ, এ আমাদের বোনবিবিই। কিন্তু রাত্রে এলো ওর জামাটা একটু দাঁত দিয়ে ফুটো করে রেখেছে — কি দুষ্টু বলো — ওদেরও তো জামা আছে, তবুও হিংসুটে এমন।

ঠিক সময় হাতে করে দু-একটা ব্যাগ নিয়ে বের হয়, অনেক সময় কিছু কেনাকাটা থাকে। কত সময় ঐ সব ব্যাগের মধ্যে বোনবিবিকে পাওয়া গিয়েছে। ওর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কত সময় তাকে খুঁজেই পাওয়া যায় নি— তখন খুঁজে খুঁজে দেখা গিয়েছে কোনও কুশন কভারের মধ্যে, নয় তো বাথরুমে কাপড়ের গাদার মধ্যে নয় তো আলমারির মধ্যে - কোন কিছু খুললেই সে তার মধ্যে ঢুকে বসবে - নয় তো ঘুমিয়ে পড়বে - আর আমরাও ভুলে যাই তখন ও কোথায়। তাই না? হয় তো আমার ছবিগুলোর ওপরে দিব্যি শান্তিতে ঘুমোচ্ছে একেবারে নিশ্চিন্ত মনে। আলমারি বা ড্রয়ার খুলতে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

খাবার সময় আসে—অনেক সময় ডাকতে হয় খাবার জন্য। খাওয়ার কথা বলি—মাছ সেদ্ধ খায়, আর একটা খাবার কেনা হয় অনেকদিন চলে, ছোট ছোট লাল সবুজ রংএর নানা মাছের একসঙ্গে তৈরি করা খাবার অনেকটা ডালমুটের মতো— আমি বলি চানাচুর - খায়। বেশ দুষ্টু কিন্তু বোনবিবি। কুকুরদের খাবার দিলেই গপ গপ করে খেয়ে শেষ করে ফেলে তখনই। ও কিন্তু তা নয় - সে অনেক দেখে শুনে নেবে কাছে কেউ আছে কিনা, তারপর একটু একটু করে খায়, কিছুক্ষণ খাওয়ার পর আর মন লাগে না খেতে। উঠে বসে, সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তারপর আড়মোড়া

একদিন বোনবিবিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কখন যে কি করে বেরিয়ে গিয়েছে জানিনা। আমাদের আগে একটা বিড়াল ছিল, সেও হঠাৎ এসেছিল আমাদের বাড়ি, ওর মা মরে যায়, তারপর আমার মেয়ে ওকে আনে। তার নাম ছিল পার্শে। পার্শেকে একদিন সারাদিন সারারাত প্রায় পাচ্ছি না। সেদিন আমাদের এদিকে বিরাট আলো দেওয়া হয়েছে রাস্তায় রাস্তায়, আর্জেন্টিনার ফুটবল খেলোয়াড় মারাদোনা আসছেন। হয়তো ওই আলো বাজনায় পাঁচিলে উঠে সেও তাকে দেখতে গিয়েছে। রাত ১২টা নাগাদ আমাদের চেনা একজন খবর দিলেন ফোনে, তোমাদের পার্শে ওই বাড়ির প্যারাপেটে বসে আছে। আমার মেয়ে গিয়ে দেখে সত্যি, সেও মারাদোনা আর আলো বাজনা সব ওখানে বসে দেখছে। আর একজন সাহায্য করতে মেয়ে গিয়ে তাকে অনেক ডেকে নিয়ে এসেছিল। তার এতদিন বাদে আবার একটা বিড়াল চলে গেল। মানে বোনবিবির কথা বলছি। সারাদিন তাকে খুঁজেই পেলাম না — দিদিকে আর অফিসে ফোন করে বলিনি। মনে হলো বিকেলে হয়তো এসে যাবে। বিড়ালরা অনেক সময় এমন পালায়, আবার ফিরে আসে, সেই ভেবে বসে আছি অথচ ভয় করছে। যদি আর না ফেরে? সারা দুপুর এল না—সন্ধ্যে বেলায় দিদি ফিরে এল। গাড়ি থেকে নামবার সময় দেখে ও নামার সঙ্গে সঙ্গে বোনবিবিও গাড়ি থেকে নেমে সোজা সিঁড়ি দিয়ে ছুটল। আমার মেয়ে তো অবাক — গাড়িতে উঠলো কখন? ওপরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ দেখেই বুঝল আমি কী ভয় পেয়েছি। কিন্তু তার মধ্যে সে আগে ভাগে ঢুকে সোজা টেবিলের ওপরে উঠে হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রইলো যেন কোনও দিন কিছুই হয়নি।

শোন তাহলে কী করেছে ও। দিদির বাজারের ব্যাগে করে চলে গিয়েছে। তখন নিশ্চয় ভয়ে চুপ করে ছিল। কিংবা হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছিল—অতক্ষণ গাড়িতে চড়ে ঘুম এসে গিয়েছিল। অফিসে গিয়ে দিদি ব্যাগ দুটো গাড়ি থেকে নিয়ে ঘরের একটা কোণায় রেখেছে যেমন রোজ রাখে। একটু পরে দেখে বোনবিবি ব্যাগ থেকে বেরিয়ে একটা ইঁদুরের পেছনে সোজা তাড়া করেছে। দিদি তো অবাক, ওকে এখানে দেখে। তাকে ধর-ধর! সকলে মিলে ধরার চেষ্টা করল, অনেকে ভীষণ ভয় পেল বিড়াল দেখে। শেষ পর্যন্ত বিড়াল সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে কোথায় যে উধাও হল কেউ জানে না। সকলে খুব খুঁজেছিল। দিদির তো মন খারাপ, পলাশবাবু অবাক, ইন্দ্রানীদি অবাক, মিসেস গোধুলী ব্যানার্জি অবাক, মিসেস দেবী কর প্রধান অধ্যক্ষা অবাক। সকলেই খুবই দুঃখিত কারণ দিদির বিড়াল বোনবিবির এতো গল্প শোনে — সে শেষ পর্যন্ত উধাও এখানে এসে। দিদি খালি ভাবছে আমাকে কী বলবে — হাতের কাছে পেয়েও ধরতে পারলো না। দিদির মন তো খুবই খারাপ। ভাবছে মা হয়তো জানেন না।

বাড়ি এসে তবে দিদি বুঝলো সে পালিয়ে গাড়িতে উঠে চুপ করে লুকিয়ে বলে ছিল, কেউ দেখতে পায়নি এমনকি সুরেশজীও নয়। আর দিদি নামার সঙ্গে সঙ্গেই সেও নেমে এলো। আর দিদি অবাক, দরজা খুলতে আমি অবাক, আয়লা-এলো অবাক। তারপর টেবিলে এসে হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা? কী দুষ্টু বলো! ফিরে পাওয়াতে আমরা সবাই খুশি, তোমরাও নিশ্চয়!

ছবি : লেখক

গাঁয়ের কথা

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

গ্রামে ছিল বাড়ি সেগুনের সারি
অদূরে স্টেশন ছোটে রেলগাড়ি।
ঝিলমিল জল নদী আঁকাবাঁকা
নৌকায় চড়ে যায় সব ঢাকা
সন্ধ্যায় জ্বলে প্রদীপের আলো
এক তিল মেঘে বাজ চমকালো।
তিরতির হাওয়া পালে দেয় টান
মাল্লারা গায় ভাটিয়ালী গান।
স্মৃতিটুকু ভাসে মেঘের ডানায়
পূর্ণিমা চাঁদ সালাম জানায়।

রূপান্তর

পার্থ সিন্‌হা

একটি পোকা হামা টেনে
এব্রিয়ে দিয়ে গা-টা;
বলল, 'আমার দে তো তুলে
শরীর থেকে কাঁটা।'

তুলেই চলি... তুলেই চলি...
পড়তে আভা আলোর;
ভিতর থেকে ঝিলিক মারে
রঙ-বেরঙের ঝালর!

ঝালর তুলে বেরিয়ে আসে
অ-রূপ রূপের জ্যোতি;
মখমলে দুই রঙীন ডানায়
ছোট্ট প্রজাপতি!

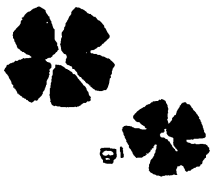

ছবি : রাহুল মজুমদার

ব্ল্যাক ফ্রাইডে

দীপক মুখোপাধ্যায়

দিনটা ছিল শুক্রবার। তারিখ ৮ই জানুয়ারি, ২০১০। দিল্লিতে ভীষণ ঠান্ডা পড়েছে। সারাদিন ধরে কুয়াশা। এক চিলতে রোদের দেখা নেই। এই শীতে রাত ন-টার সময়, খোলা আকাশের নীচে গুরগাঁওয়ের ফার্ম হাউসে প্রিয় বাঙালি বন্ধুর কন্যার বিয়েতে কাঁপতে কাঁপতে ডিনার খাচ্ছি।

বন্ধু চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেনি। লনে অনেকগুলো গ্যাস হিটার রাখাও ছিল। গানের জন্য ভালো আর্টিস্ট এসেছিল। কেউ হিন্দি গান গাইল, কেউ গাইল রবীন্দ্রসঙ্গীত, পাঞ্জাবি নাচগানও ছিল। খাবার গরম রাখার বন্দোবস্ত ইত্যাদি সবই ছিল। আর মেনুও ছিল দারুণ! সেই হিটারের নীচে দাঁড়িয়ে হাতে প্লেট নিয়ে গরম গরম খাবার খেতে শুরু করে দিলাম। একটু তাড়াতাড়িই খাচ্ছিলাম। গুরগাঁও থেকে ফরিদাবাদ ফেরার চিন্তাও মাথায় ছিল। আমার গাড়ির ড্রাইভার শের সিং আজকে আবার কিছুক্ষণের জন্য ছুটি চেয়েছিল। জয়পুরে জমি সংক্রান্ত কী একটা কাজ আছে তার। তাই আজকে সকালেই জয়পুরে চলে গেছে। তবে আমায় বলে রেখেছে— রাত সাড়ে ন-টার মধ্যেই গুরগাঁওয়ের এই ফার্ম হাউসে সে এসে পড়বে আর আমাকে মোবাইলে ফোন করে জানিয়ে দেবে। তাই খেতে খেতে শের সিংয়ের ফোনের অপেক্ষা করছিলাম। আসার সময় নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছি, কিন্তু ফেরার সময় যদি শের সিংকে পাই, তাহলে গাড়িতে বসে একটা মেজাজি ঘুম দেওয়া যেতে পারে।

শের সিং-এর কথা ভাবতে ভাবতেই তার টেলিফোন এসে গেল। জানাল, সে পার্কিং-এ আমার গাড়ির কাছেই রয়েছে। আমি যেন নিশ্চিন্তে খাওয়া শেষ করে এসে যাই। ফোন পেয়ে আমি আশ্বস্ত হলাম। ডিনার হয়ে গেলে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পার্কিং-এ এসে শের সিংকে গাড়ির চাবি দিয়ে আরাম করে পেছনের সিটে বসলাম।

শের সিং আমার মতো ফরিদাবাদেই থাকে। আমার বাড়ি থেকে দু-কিলোমিটারের মধ্যেই তার বাড়ি। সে সকাল বেলায় সাইকেলে আমার বাড়ি চলে আসে, আর সন্ধ্যাতে ডিউটি শেষ হয়ে গেলে, আবার সাইকেলেই বাড়ি ফিরে যায়। গাড়ি চালায় খুব ভালো। আমার সাথে সে কাটিয়ে দিল বছর পাঁচেক। তার বাড়ির সকলেই আমাদের জানে। তার বউ মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীর কাছে আসেও।

শীত যে পড়েছে, তা শের সিংকে দেখেও বুঝতে পারলাম। ওভারকোট পরে একটা মাফলার এমন করে গলায় আর মাথায় জড়িয়েছে যে, তার মুখ দেখাই যায় না বললে চলে। শের সিং বরাবরই কম কথা বলে। চাবি নিয়ে সে গাড়ি স্টার্ট দিতেই আমিও চোখ বুজে এটা ওটা চিন্তা করতে লাগলাম।

কিঁ-ই-ই-ই-ই-ই-ই-ইশ। বোধহয় একটু তন্দ্রা এসে গেছিল। হঠাৎ শের সিং-এর মোক্ষম ব্রেকের ঝাঁকুনিতে আমার সেই তন্দ্রার ঘোর ভেঙে গেল। চমকে উঠলাম।

বললাম, 'কেয়া হুয়া শের সিং?'

'সামনে দেখিয়ে সাব,' শের সিং বলল।

দেখলাম সামনে একটা গাড়িকে ঘিরে অনেক লোক ভিড় করে রাস্তা প্রায় আটকে দিয়েছে। শের সিং গাড়ি থেকে নেমে সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই অবশ্য সে এসে গেল, আর গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চালাতে চালাতে বলল, যে গাড়িকে ঘিরে অনেক লোক ভিড় করে রয়েছে, তার ভিতরে ড্রাইভারের সিটে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। লোকেরা বলছে ড্রাইভারের সিটে বসা সেই ভদ্রলোকের হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু শের সিং নাকি ওই লোকটাকে চেনে এবং তার ধারণা যে লোকটাকে খুন করা হয়েছে। তার কাকার মেয়ের

বিয়ের জন্য সে নিজের জমি বিক্রি করে কাকাকে পাঁচ লাখ টাকা ধার দিয়েছিল এক বছরের জন্য। এই ধারের একটা লিখিত কবুলনামাও রেখেছিল সে। এক বছর শেষ হয়ে যাবার পর অনেকবার ভদ্রলোক কাকাকে মনেও করিয়ে দেয় ধার শোধ করবার জন্য। কিন্তু তিন বছর পার হয়ে গেল, যখন কাকা ধার শোধ দিল না তখন ভদ্রলোক পঞ্চায়েতের কাছে সেই কবুলনামা সমেত লিখিত নালিশ করে। কাকা এবার প্রমাদ গুনলেন। এবং তাকে আজ টাকা শোধ দেবেন বলে ডাকেন। কাকার কাছে টাকা আনতে যখন ভদ্রলোক পৌঁছায়, তখন ভাড়া করা গুন্ডা দিয়ে গলা টিপে ভদ্রলোককে খুন করা হয়। এত শীতে তারপর তার মৃত দেহটাকে গাড়িতে কিছুদূর নিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের সিটে বসিয়ে দিয়ে সেই গুন্ডারাই এখন ভিড়ের মধ্যে থেকে বলছে তার মৃত্যু গাড়ি চালাতে চালাতে হার্ট অ্যাটাকের ফলে হয়েছে। এমনকী ভদ্রলোকের কাকার দুই ছেলেও এই একই কথা বলছে সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে। তারা সব এখন চাইছে যে, যত তাড়াতাড়ি হয় তাকে তার বাড়ির লোক যেন দাহ করে ফেলে।

এতসব জেনেও শের সিং কোনও প্রতিবাদ না করেই ভিড়ের থেকে বেরিয়ে এল কেন? নির্লিপ্তের মতো শের সিং বলল, 'ছোড়িয়ে না সাব, এ সব বাত আপকো বাতায়া, আভি উন লোগোকা বাতানেসে কেয়া ফয়দা, আপকা ভি ঘর পৌঁছনেমে দের হো জায়গা। যানে দিজিয়ে।' এই বলেই রাস্তা খালি পেয়ে শের সিং ফুল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে দিল।

আমিও আর কোনও কথা বললাম না। সত্যিই তো, আমার কী দরকার শুধুশুধু এর মধ্যে যাবার। হঠাৎ নিওন লাইটে একটা সাইন বোর্ডে দেখলাম লেখা রয়েছে MOTEL BEHROR, BEHROR, NH-8, RAJASTHAN। আমি চমকে উঠলাম। আমি তো যাচ্ছি গুরগাঁও থেকে ফরিদাবাদ। এখানে বেহরোর এল কোথা থেকে! শের সিংকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'শের সিং, বেহরোর কিঁউ লিখা থা ও সাইনবোর্ডমে, যো আভি পাস কিয়া?'

শের সিং সামনে তাকানো অবস্থাতেই উত্তর দিল, 'পতা নহি সাব, হামলোগ আভি মেহরৌলি বদরপুর রোড পৌঁছ গিয়া।' দেখলাম শের সিং ঠিক কথাই বলেছে। একটু পরেই চিরাগ দিল্লি ক্রসিং এসে গেল। ভাবলাম আমারই দেখার ভুল হবে। আমি আবার চোখ বুজে আরাম করে বসলাম।

বদরপুরের আন্ডার ব্রিজের নীচে গাড়ির ঝাঁকুনির চোটে আমার তন্দ্রা আবার ভেঙে গেল। দেখলাম ঝড়ের বেগে গাড়ি চালাচ্ছে শের সিং। তার অবশ্য গাড়ি চালানোর হাত খুব ভালো। বদরপুরের ক্রসিং পার হয়ে গেল এক মিনিটের মধ্যে। জৈতপুর ক্রসিং পার হতেই ঘড়িতে দেখলাম সময় রাত সওয়া এগারোটা। তারপর গাড়ি বাইপাসের রাস্তা ধরতেই আমার মোবাইল তীক্ষ্ণ স্বরে বেজে উঠল। দেখলাম আমার বাড়ি থেকে মেয়ে ফোন করেছে।

ফোন অন করতেই মেয়ের গলা শুনলাম, 'বাবা, খবর পেয়েছ, আজ বিকেলবেলায় প্রায় তিনটে নাগাদ তোমার

ড্রাইভার শের সিং মারা গেছে। তার ছেলে যোগীন্দর সন্ধ্যা ছ-টার সময় ফোনে জানিয়েছে। তখন থেকেই তোমাকে কত ফোন করছি, শুধু মেসেজ আসছে—নট রিচেব্‌ল্‌। আজকেই তাকে ক্রিমেট করবে, তাই তোমাকে খবর দিতে বলছিল। তুমি এখন কোথায়?'

মেয়ের ফোনের কোনও জবাব দেবার শক্তি আমার ছিল না তখন। আমার পায়ের থেকে একটা ঠান্ডা স্রোত যেন সারা শরীরে বয়ে যেতে লাগল। তাহলে কে আমার গাড়ি চালাচ্ছে? সামনে কে বসে আছে? ওর মুখ আজকে এত ঢেকেই বা চালাচ্ছে কেন? আর হঠাৎ আজকে বাই-পাসের রাস্তা ধরেছে কেন? আমি এই রাস্তায় এত রাত্রে তো কখনই যাই না। দেহের সব শক্তি এক করে বলে উঠলাম, 'তুম কৌন হো, গাড়ি রোখো।'

বলতে বলতেই গাড়ি থেমে গেল। আমি দেখলাম বাইপাসের উপর সেক্টর -৩৭ এর শ্মশানের গেটে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারের সিট খালি। শের সিং সেখানে নেই। আমি স্থবির হয়ে গেলাম। শের সিং বিকেলে মারা গেছে, তাহলে গুরগাঁও থেকে এতটা রাস্তা আমার গাড়িকে কে চালিয়ে নিয়ে এল? আর আমাকে এতটা এনে এই শ্মশানের গেটে কেন ছেড়ে দিল? ভাবতে ভাবতেই দেখলাম, কয়েকজন লোক হ্যাজাক জ্বালিয়ে একটা মৃতদেহ নিয়ে 'রাম নাম সত্য হ্যায়' বলতে বলতে এই দিকেই আসছে। আমি গাড়ির ভেতরেই বসে রইলাম। তারা কাছে আসতেই শের সিং-এর ছেলে যোগীন্দরকে দেখতে পেলাম। এবার সাহস করে আমি গাড়ি থেকে নামতেই আমাকে দেখে যোগীন্দর কাঁদতে কাঁদতে বলল, তার বাবা আজকে সন্ধ্যা ছ-টা নাগাদ মারা গেছে, আর তারা তার মৃতদেহ দাহ করতে এনেছে। আমি অবিশ্বাসের সাথে সেই মৃতদেহের মুখ দেখতে গিয়ে হতাশ হলাম। এতো শের সিং-এরই মৃতদেহ!

হঠাৎ শের সিং-এর ছেলের বয়সেরই প্রায় সমান বয়সের দু-জন ছেলে যোগীন্দরকে আর এক মুহূর্ত দেরি না করে এখনই দাহ করার কাজ শুরু করতে বলল। তারা কারা জিজ্ঞাসা করতেই যোগীন্দর জানাল যে তারা তারই কাকার ছেলে! তারা নাকি যোগীন্দরকে বলেছে যে গাড়িতে ফিরবার সময় বেহরোরের কাছাকাছি গাড়ি চালাতে চালাতে তার বাবার হার্টফেল করে মৃত্যু হয়েছে। তারা সেই গাড়ির পেছনের সিটেই বসে ছিল। তারা সেই সময়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফল কিনছিল, তাই বড়ো রকমের কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়নি। আর বেশীক্ষণ দেহ রাখলে অকল্যাণ হতে পারে ভেবেই তার কাকার ছেলেরা তাকে তাড়াতাড়ি দাহ করার কাজ শেষ করতে বলছে। তারা সেই বেহরোরের কাছাকাছি জায়গার থেকে এক ডাক্তারের দেওয়া ডেথ সার্টিফিকেটও নিয়ে এসেছে।

কথা শুনতে শুনতেই আমি তিওয়ারি সাহেবকে মোবাইলে ডায়াল করে দিয়েছি। তিওয়ারি সাহেব এই অঞ্চলের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ্‌ পুলিশ। কে আমাকে গুরগাঁও থেকে ফরিদাবাদ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে, এখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমার দেহে ঠান্ডা স্রোত বইতে শুরু করল ফের। আমাকে বিয়েবাড়ি থেকে নিয়ে আসার যে কথা সে আমাকে দিয়েছিল, মরে গিয়েও সেকথা ভোলেনি সে। তারই সাথে তার খুন হওয়ার পুরো ঘটনা সে আমাকে জানিয়ে গেছে অন্য লোকের কথা বলে। শের সিং বলেছিল মরে যাওয়া লোকটাকে সে চেনে কারণ সেই ভদ্রলোক তারই গ্রামের; তার অর্থ, সেই মৃত ব্যক্তি সে নিজেই। সেই তাঁর কাকাকে টাকা দিয়েছিল। আর হঠাৎ বেহরোরের সাইন বোর্ডের ঝলক দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে কোন জায়গায় সে খুন হয়েছে। এরপরেও আমি যদি চুপ করে বসে থাকি তাহলে শের সিং-এর প্রতি অবিচার হবে।

তিওয়ারি সাহেবকে পুরো কথাগুলো বলতে উনি তা বিশ্বাস করলেন কি না তা আমি বুঝতে পারলাম না। তবে এটা যে সাদামাটা কেস নয় তা উনি বুঝতে পারলেন। যদিও ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা ছিল হার্ট ফেইলিওর, কিন্তু শের সিং-এর গলার উপরের কালো দাগটা তিওয়ারি সাহেবের নজরে পড়েছিল। উনি মৃতদেহ পোস্ট মর্টেম করতে পাঠিয়ে দিলেন। আমাকে দিয়ে একটা স্টেটমেন্ট সই করিয়ে নিলেন, কারণ আমিই প্রথমে ওঁকে ফোনে খবর দিয়েছিলাম।

বাড়িতে ফিরে মেয়েকে, স্ত্রীকে অত কথা আর বললাম না। তারা ঘাবড়ে যেত আর আমাকেও হয়তো কোনও অশরীরী আত্মা ভেবে বসত। তাই শুধু বললাম, আমি নিজেই গাড়ি চালিয়ে ফিরেছি গুরগাঁও থেকে।

ছবি : রাহুল মজুমদার

ধারাবাহিক উপন্যাস

চতুর্থ কিস্তি

(মিত্তিরবাগানে পোড়ো বাড়িতে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল রামু। আগের রাতে এখানে একটা অদ্ভুত নীল আলো দেখেছিল সে। সিঁড়ির মাথায় দরজায় তালা, দরজার উপরে সামান্য ফাঁক দিয়ে সে কসরৎ করে ঢুকল, কিন্তু উঁচু থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল সে। জ্ঞান ফিরতে রামু দেখে ঘরের মধ্যে একটা নীল আলো। এক বৃদ্ধ, নাম তাঁর ভুনুচ বা ভুনুচদাদু। লুকিয়ে আছেন তিনি—নিম্মো আসছে, আরসাইনের যুবরাজ। সুদূর তারা আরসাইনের লোকেরা মানুষ নয়, ফুলোট। তারা বহুকাল আগে সভ্য হয়েছে— উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে লক্ষ মানুষের ইচ্ছাশক্তি পোরা আছে ওই নীল পাথরে। পাথরটা লুকিয়ে রাখতে হবে যাতে নিম্মো সেটা না পায়। পাথরটা ছোট হয়ে সুপুরির মাপের হয়ে গেল। উনি রামুকে দিলেন ওটা, বললেন খুব সাবধানে রাখতে।

পাড়ার নাটকের মহড়ার পাণ্ডা নিতাই চক্কোত্তি—ঝগড়া হয়ে সন্ধ্যের অন্ধকারে দৌড় মারল নকুড়। তারপরই নকুড়ের বাবা সত্য ভট্‌চায্ হাজির। তখন কয়েক জন ওরা নকুড়কে খুঁজতে বেরোল। ইতিমধ্যে নকুড় পথে দেখে দৈত্যের মতো বিশাল এক ছায়ামূর্তি, 'ভুনুচ কোথায়?' প্রশ্ন করল সে, আর নকুড়কে শূন্যে তুলে ঝাঁকাল নিম্মো। বাড়ি ফিরে সে বলল, যে গ্রামে এক দৈত্য এসেছে।

শশধর চাটুজ্জে, রামুর বাবা বেরিয়েছেন রামুকে খুঁজতে, জটাধরও চলল সঙ্গে। শশধর-জটাধরের সঙ্গে নিতাই-সত্য ভট্‌চায্ বাঁশবনের মধ্যে গেল ঝোপঝাড় ভেঙে ওরা পৌঁছল বিশে তান্ত্রিকের বাড়ি।

নীল আলোটার দিকে যাচ্ছিল কালীপদ। ঘোষেদের পুকুরের ওপারে তাল গাছের চেয়ে উঁচু কী একটা! সেটার ভেতরে যন্ত্রে ভর্তি একটা ঘর। এগুলো সব স্বপ্ন, নিশ্চিত হয়ে লাল-নীল বোতামগুলো এলোপাথাড়ি টিপতে লাগলেন তিনি। সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘরটা কেঁপে উঠল থরথর করে—ছিটকে পড়লেন কালীপদ।

রামু বাড়ি ফিরলে সেজকাকার জেরায় সব বলে ফেলল। সেজকা আপাততঃ ওকে ঘুমোতে বললেন। ওস্তাদ চোর ভোম্বল ওদের বাড়িতে চুরি করতে এসে শোনে মাঝরাতে অনেক লোকের গলা। বেরিয়ে এসে একটু বাদে সে দেখে তার বুকপকেটে একটা নীল আলো জ্বলছে। সামনে গাছে ঝুলছে এক বুড়ো, সে বলল, ও পাথরটা তোমার নয়, যেখান থেকে এনেছ ফেরত দিয়ে এসো।)

কার জিনিস? ভুতুড়ে গুলিটা কোথা থেকে এল তা কি ভোম্বল নিজেই জানে নাকি? ফেরৎ তাহলে দেবে কাকে? এ তো ভারি অন্যায় কথা।

—এ পাথর রামুর। আমি তাকে দিয়েছি। তার হাতে এখুনি দিয়ে এস। নইলে বড় বিপদ।

রামু? হ্যাঁ, রামুকে ভোম্বল চেনে। শশধর চাটুজ্জের ছেলে। দস্যি ছেলে বলে নামডাক আছে তার। ভোম্বল একটু আগে শশধরের বাড়ি থেকে চলে আসার পরই যে পাথরটা তার বুকপকেটে এসেছে, এই দুই মিলিয়ে দুয়ে-দুয়ে চার করে বুঝল এই পাথরটাই ঢিলের মতন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে পকেটে। বুড়ো ফিসফিসিয়ে উঠলো —কই দেরি করছ কেন? পা চালিয়ে যাও।

এই বলে বুড়ো তুড়ুক করে এক লাফ দিয়ে আবার পেয়ারা গাছের ডালে চড়ে বসল। দুখি দুখি মুখ করে দাড়ি চুলকে বলল—আমায় দেখে ভয় পেয়োনা বাপু। আমার মনটা ভারি নরম। এখন লুকিয়ে আছি তো, তাই সাবধানে থাকাটাই ভালো। আমি চললুম। পাথরটা জায়গামতন ফেরৎ দিও।

কথাটা ভেসে আসার পর আরেকবার দপ করে আলো ছিটকে উঠতে ভোম্বল দেখলো পেয়ারাগাছের ডাল খালি। বেঁটে বুড়োটা নেই।

কিসের বিপদ, আর তাতে করে এই পাথরটাই বা এত জরুরী হয়ে উঠছে কিভাবে, আর ওই রামু ছোঁড়ার কাছে এ পাথরটা এলই বা কোত্থেকে! এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আবার পুকুরধারের পাঁচিলের কাছে ফিরে এসে ভোম্বলের খেয়াল হল, সবচেয়ে বড় কথা এই চিমসে বুড়োটা কোত্থেকে এল?

খানিকক্ষণ চুপ করে একটা গোলমতো যন্ত্রের ওপর বসে বসে পা নাচিয়ে কালীপদ বুঝলেন, পুরো ব্যাপারটায় মস্ত কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেল। এতক্ষণের আলোর খেলা, সাঁই-সুই আওয়াজ সব থেমে গেছে। যন্ত্রপাতিগুলো সব বিকল হয়ে গেল নাকি। তা যাকগে, বেয়াড়া একটা যন্তর এই আদাড়ে বাদাড়ে রয়েছেই বা কেন? এটাওটা টেপাটেপি করে ব্যাপারটা বিগড়ে দিতে পেরে বরং বেশ খুশি খুশিই লাগছে কালিপদর। বুড়ো হলে আক্কুটে স্বভাবটা যে বেড়ে যায় তা তিনি আগেই খেয়াল করেছেন। বাড়িতেও রেডিওর যন্ত্রপাতি খুলে বিভিন্নরকম কারিকুরি করে দশ-বিশটার তিনি দফারফা করেছেন। হরিপদ শেষবার একটা ট্রানজিস্টর কিনে এনে বলে দিয়েছিল—এই শেষ। কিন্তু তাতেও কালিপদর গোঁ যায়নি। ভেতরের কলকবজা এখন প্রায় পুরোটাই বাইরে। খোলটাই যা পড়ে আছে। আস্ত কিছু দেখলে মনটা যেন খিটখিট করে, হাত নিসপিস করে।

ধুপধাপ একটা আওয়াজ বাইরে থেকে চারচৌকো খুপরিটার মুখ অবধি আসার পর একটা বেজায় ঢ্যাঙা ছায়ামূর্তি হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে এল। এদিক ওদিক তাকিয়ে পাগলের মতো যন্ত্রপাতিগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। লাল-নীল-হলুদ-সবুজ বোতামগুলো এলোপাথাড়ি টেপাটেপি করার পর বোধহয় চোখ পড়ল কালিপদর দিকে। টুংটাং করে জলতরঙ্গের একটা আওয়াজ, তারপ খট-খটাং-খট করে একটা আওয়াজ হ'ল।

—কে তুমি?

কালিপদ মুচকি হাসলেন। এই ব্যাটাই তাহলে এই লজঝড় জিনিসটা এখানে এনেছে।

—তুমি কে বাপু? সেটাই আগে শুনি না?

দৈত্যের মতো চেহারাটার চোখে দপ্ করে একটা লাল আলো জ্বলে উঠল।

—আমি নিম্বো।

—তা সে তোমার নাম যাই হোক ছোকরা, তোমার এই বেঢপ জিনিসটা যে একেবারে খারাপ করে ছেড়েছি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

'টুং-টাং' আওয়াজটা এবার বড় ঘড়ির 'ঢং-ঢং'-এর মতো হয়ে গেল।

—খারাপ হয়ে গেছে? তাহলে ফিরব কি করে?

দৈত্যটা যে বেজায় ফাঁপরে পড়ে গেছে তা বুঝে মনের ভেতর একটা হাসি খলবল করে উঠল কালিপদর।

—ফিরবে, কোথায় ফিরবে?

ঢ্যাঙাটা কোনও উত্তর দিল না। বিড়বিড় করে বলে চলল—ফিরব কি করে?

—আ মলো যা! এই কচ্ছপ মার্কা জিনিস খারাপ হয়েগেছে বলে বাড়ি ফেরা যাবে না! পায়ে হেঁটে যাও, সবুর করে সকাল হলে ভ্যান-রিক্সায় যাও, চাইকি আমার হরিপদ নাহয় তোমায় সাইকেলে করে দিয়েও আসবে। ফেরার জন্য এত আকুলি-বিকুলি করছ কেন? আদিখ্যেতা।

দৈত্যের চোখের লাল আলোটা সোজা এসে পড়ল কালিপদর বুকে।

—আঃ, তোমার এই টর্চ-বাতিটা নেভাও দেখি! কালিপদ খেঁকিয়ে উঠলেন।

—লাল আলো জ্বেলে আমায় ভড়কে দেবে ভেবেছ? ওটি হচ্ছে না। চোখের মধ্যে কি টুনিবাল্ব জ্বালিয়েছ? ভাবছ খুব একটা কিছু করেছ! কিস্যু হয়নি। ওজিনিস আমার নাতিরও আছে।

ঘটাং-ঘট শব্দটা বেশ জোরে।

—যন্ত্র খারাপ হয়ে গেলে আমি ফিরতে পারব না।

—কেন কোন সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে তোমার দেশ হে? বিলেত থেকে আসছ নাকি?

—অনেক দূর!

—কোত্থেকে সেটা বলবে তো?

—আরসাইন। কর্কশ গলায় বলল দৈত্য।

—এ কি মগের মুলুক পেয়েছ নাকি? যাহোক একটা বলে আসর মাত করে দেবে? আমায় কি কচি দুধের বাছাটি পেয়েছ, বেলেরচণ্ডি, ভাসকুলডাঙা, কোঁদলপুর মায় ন্যাটাইবাটি অবধি শুনেছি, হুট করে একটা আজগুবি গ্রামের নাম তুমি কর কোন আক্কেলে? তা কোনদিকে তোমার সেই অচিনপুর দেখাও দেখি বাপু আঙুল দিয়ে।

দৈত্য সাড়া দিচ্ছে না দেখে কালিপদ আরও রেগে গেলেন।

—কি হল, কোন দিকে তোমার বাড়ি দেখাও!

ঢ্যাঙা সরু পাকাটির মতো আঙুল তুলে ওপরে দেখাল।

—তুমি দেখছি, একেবারে বদ্ধ উন্মাদ! ওপরের দিকে কি দেখাচ্ছ? গাছের ডালে থাক নাকি?

নিম্নো সরু আঙুল দিয়ে খপ্ করে কালিপদকে এক টানে শূন্যে তুলে ধরল। ঘট-ঘটাং-ঘট।

—তোমাদের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে আরসাইন।

হাত পা ছুঁড়ে কোনো লাভ হচ্ছে না দেখে এবার কালিপদ ঘাবড়ে গেলেন। দিব্যি বুঝলেন, নৃশংস খুনে ডাকাতের হাতে পড়েছেন। এককালে নিয়মিত কুস্তি করতেন, আখড়ায় এক ধোবি-পাটে কত ওস্তাদকে নাকাল করে ছেড়েছেন। কিন্তু এই বয়েসে সে শরীর তো আর নেই। তবু সর্বশক্তি দিয়ে দস্যুটার মাথায় একটা গাট্টা মারলেন কালিপদ। ঠনাৎ করে একটা আওয়াজ হোলো। মনে হল লোহার ওপর হাতটা পড়ে মড়মড়িয়ে ভেঙে গেল। যন্ত্রনায় চোখ বন্ধ করলেন কালিপদ। এ ব্যাটা কি মানুষ নয় নাকি?

—ভুনুচ কোথায় জানো?

কানের পর্দা ফাটানো আওয়াজে চিৎকার করে উঠলো দৈত্যটায়।

হাতটা এখনো মারাত্মক ব্যথা করছে। কালিপদ বুঝলেন গায়ের জোরে এই বোম্বেটার সঙ্গে পেরে ওঠা তাঁর পক্ষে পালক দিয়ে গাছ কাটার সামিল।

—ভুনুচ আবার কে?

—সে আরসাইন থেকে এখানে পালিয়ে এসে লুকিয়েছে। তার কাছে একটা জিনিস আছে। তাকে আমার চাই।

কালিপদ এটুকু বুঝলেন হার্মাদটা ভুনুচ বলে কাউকে খুঁজছে। এত যন্ত্রনার মধ্যেও মুচকি হাসলেন। বয়েসে গায়ের জোর কমে গেলেও মাথার বুদ্ধিতে কিছুটা হলেও পাক ধরে।

—ও, ভুনুচকে খুঁজছো? তা, আগে বলতে হয় তো! লিকলিকে ইস্পাতের মত হাতটা সরে গেল। কালিপদ ধপ্ করে পড়লেন।

—তুমি জানো, ভুনুচ কোথায় আছে?

জানি বইকি। বিলক্ষন জানি। দেখো দেখি, এতক্ষণ সেই কথাটা বললেই তো ল্যাটা চুকে যেত। খামোকা এই বুড়ো হাড়ে তোমার মতন ভীমসেনের সঙ্গে হাতাহাতি করতে গিয়ে চোট পেলুম।

দৈত্যটার চোখের লাল আলো দুটো দপ্ করে নিভে গেল।

—তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারবে?

—এ আর এমনকি কথা? এসো, আমার পেছু পেছু এসো দিকি,

তোমায় ভুনুচের কাছে নিয়ে যাই।

চারচৌকো খুপরির মধ্যে থেকে মাটিতে পা দিয়ে অন্ধকারে এগোলেন কালিপদ। বোম্বেটেটা পেছনেই রয়েছে। মাথার মসৃণ টাকে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন, বিড়বিড় করে বললেন—ঘুঘু দেখেছ বাছাধন, ফাঁদ তো দেখনি!

ছেঁড়া ছেঁড়া কথাগুলো কানে আসছে রামুর। বাড়ির সামনের দিকে উঠোন আর বারান্দায় যে অনেকে জড়ো হয়েছে তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে। একবার ভাবল বেরিয়ে গিয়ে কি হচ্ছে দেখবে, কিন্তু ইচ্ছে করল না। তার আর কিচ্ছু ভালো লাগছে না। খালি ভুনুচ বুড়োকে দেখতে ইচ্ছে করছে। সে যে সব ডাহা মিথ্যে দেখেছে, তা কিছুতেই মেনে নিতে মন চাইছে না। কুসুম ভাতের থালা যেমন রেখে গেছিল

ঠিক তেমনি আছে। রামু আজ কিচ্ছু খাবেনা। কিছুতেই খাবেনা। যদিও তার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, দুপুরের পর কিচ্ছু খায়নি, তবু সে খাবে না। আবার কান্না পেল।

ভেজানো দরজাটা হালকা করে ফাঁক হল। ঘরে কেউ ঢুকল। রামু চোখ বন্ধ করল, কারুর সঙ্গে কথা বলবে না, সে তো এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

—রামু। দরজার কাছ থেকে চাপা গলা। সেজকা। রামু সাড়াশব্দ দিলো না।

—উঠে বস। কথা আছে।

সেজকা তাহলে বুঝে গেছে সে ঘুমোয়নি। সেজকা সব বুঝে যায় কি করে?

—রাগ করেছিস?

সেজকা মাথার কাছে এসে বসল। মাথায় হাত রাখল। রামু আর পারলো না, সেজকার কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদলো কিছুক্ষন।

—উঠে পড়, কাজ আছে।

কী বলছে কী সেজকা, রামু একবর্ণও বুঝতে পারল না।

—ভুনুচবুড়োকে বাঁচাতে হবে রামু, উঠে পড়।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো রামু। ভুল শুনল নাকি? সেজকা স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

—নিম্বো এসেছে। সে তোর ভুনুচবুড়োকে খুঁজছে।

নিম্বো এসেছে? রামু দম নিতে পর্যন্ত ভুলে গেছে, সেজকা এসব বলছে কী? তাহলে কি—

—পাথরটা কোথায়?

সেজকার মুখ থমথম কছে।

—পাথর! কিন্তু সে তো মিথ্যে! সে সব তো...।

—ধরে নে মিথ্যে। ধরে নে আমরা সব্বাই মিলে একটা স্বপ্ন দেখছি। ধরে নে ঘুম ভাঙলে আমরা সব ভুলে যাব। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ তো যা করবার করতে হবে!

সেজকার কথা কিচ্ছু বুঝতে পারছে না রামু। কিচ্ছু না।

—কিন্তু পাথর তো তখন জ্বললো না।

—তুই-ই তো আমায় বলেছিলি, ভুনুচবুড়ো পাথর দেবার সময় তোকে কী বলেছিল।

বুড়োর রিনরিনে জমাট গলাটা যেন কানে এল রামুর —মনে রেখো রামু —

সেজকা বলল—ইচ্ছে ভালো না হলে এ পাথর জ্বলে না। আমি ভুল করছিলাম রে, তাই পাথর জ্বলেনি।

—কিন্তু পাথর তো নেই!

সেজকা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল— নেই? সে কি রে? কোথায় গেল?

রামু দক্ষিণের জানলায় দেখাল—সে তো আমি ফেলে দিয়েছি, ওই খানে!

—ফেলে দি-য়ে-ছি-স?

সেজকার গলার আওয়াজ নড়ে গেল।

খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে রামুর হাত ধরে জানলার তলায় যখন টর্চ দিয়ে তন্নতন্ন করছে সেজকা, তখন সদরের দরজায় হাঁসফাঁস করতে করতে এসে পৌঁছলেন শশধর। উঠোনে রাজ্যের লোক থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন প্রথমটায়, তারপর হুঙ্কার ছাড়লেন—এত লোক কেন? ঢোকার মুখে তো খবর পেলুম, সে হতভাগা ফিরে এসেছে।

ভবতারিণী হাপুস নয়নে কেঁদে ভাসাচ্ছিলেন, সামলে নিয়ে বললেন—ওরে সে তো অনেকক্ষণ ফিরেছে, কিন্তু তুই যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিলি?

শশধর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন।

—আমি? আমি নিরুদ্দেশ হব কোন দুঃখে? আমি তো সে উজবুকটাকে খুঁজতে গেছিলুম। আজ হয় ওর কান থাকবে, নয় আমি থাকব।

হলধর বললেন —মানে হ'ল যদি ছেলের কান কানে থাকে তাহলে বাপ থাকছে না, আর যদি বাপ থেকে গেল, তাহলে কানটা আর কানে থাকছে না।

সত্য ভট্চায সদর দিয়ে ঢুকে এলেন।

—আঃ, সব কথা অত মানে করে বোঝাবার কি আছে?

সত্যকে দেখে নকুড় পায়ে পায়ে পিছোচ্ছিল। চোখ পড়ে গেল সত্যর

— দশজনের মাঝখানে আর চটি-হাতে করলুম না। বাড়ি চল, তারপর জটায়ুর ডানা কেমন করে ছাঁটতে হয় আমি জানি।

নকুড় মিউমিউ করে কী একটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, সত্য ভট্চায মিলিটারি মেজাজে— চোপরও— বলাতে বুক চিতিয়ে বাখারির মতন খাড়া হয়ে গেল।

শশধর গুঁতো মেরে লোক সরিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন।

—কোথায় সে? কোথায় লুকিয়েছে?

কমলা ভবতারিণীর দিকে চাইলেন। ভবতারিণী হাতের কাছে একটা বড় ঘটি পেয়ে তাই নিয়ে ঘরের মধ্যে দৌড়োলেন।

—ওই দেখো। দুধের বাছাকে কি মেরে ফেলবে নাকি? ওই দেখ—

শশধরের গর্জন পরিষ্কার শুনতে পেল রামু আর সেজকা। বাড়ির মধ্যে লন্ডভন্ড চলছে। থালা, বাসন, চেয়ার, টেবিল দুমদাম পড়ছে। থেকে থেকে —কোথায় সে, কোথায় সে? আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

সেজকার হাত পিঠে ঠেকতে রামু হকচকিয়ে তাকাল— কেটে পড়্। সেজকা ফিসফিসিয়ে বলল।

দেরি করিসনি। মিত্তিরদের বাগানে যেতে হবে, এক্ষুনি।

বলে কি সেজকা! রামুর মুখে কথা সরলো না।

—দাদার হাতে ধরা পড়লে অনেক সময় চলে যাবে। পাঁচিল ডিঙো।

—কিন্তু পাথর তো নেই।

—এখানেই ফেলেছিলি?

রামু ঘাড় নাড়ল।

—ভাবার সময় নেই। সেজকা রামুর হাত ধরল— চল্ পালাই।

নিধুবটির আমবাগানে এসে জায়গাটা চিনতে পারলেন কালিপদ। আড়চোখে দেখেনিলেন ধুমসোটা পেছনেই রয়েছে। এতক্ষণে পুরো ব্যাপারটা মনে মনে জট ছাড়াতে ছাড়াতে এসেছেন কালিপদ। প্রায় কিছুই মাথায় ঢেকেনি। শুধু এটুকু বুঝেছেন ধুমসোটা যাকে খুঁজছে, তাকে রসমালাই খাওয়াবে বলে খুঁজছে না। ডাকাতটা সন্ধান পেলে নির্ঘাৎ খুনখারাপি করবে।

মনে মনে ফ্যাক্‌ফ্যাক্ করে হাসলেন কালিপদ। বেঘোরে যখন শশধরের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তখন আশপাশ সব অচেনা ঠেকছিল। বহুদিন চেনা রাস্তার বাইরে না যাওয়ার জন্য। কিন্তু এই ক'ঘণ্টায় চোখ সয়ে গেছে। বয়সের ছালবাকলগুলো সব খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। নিজেকে বেশ কচি লাউচারার মতো মোলায়েম বোধ হচ্ছে। গা ঠেসাঠেসি আমবাগান, আর তাকে ঘিরে থাকা ছোটো, বেঁটে, ঢ্যাঙা, তালঢ্যাঙা হাজার রকমের গাছগাছালির জঙ্গলে রাতের বেলায় তালমতন গোলোকধাঁধায় ফেলে দিলে কত মাতব্বর বেরোতে চুল পাকিয়ে ফেলেছে, এ ব্যাটা তো কোন ছার।

পেছন থেকে আওয়াজ এল—ভুনুচ কোথায়?

খ্যাঁক করে উঠলেন কালীপদ—আঃ, সওনা বাপু। এমন করছ যেন জল গড়াতে বলেছ। মুখ ধরে দিলেই হল। সে কি এক জায়গায় থাকার লোক? দেখি কোথায় আছে। নাও নাও, পা চালিয়ে এস দেখি।

পাশের বাঁশবাগানের দিক থেকে তারস্বরে শেয়াল ডেকে উঠল। নিম্বো থমকে দাঁড়াল।

—কিসের আওয়জ হচ্ছে?

—নাঃ, তুমি দেখছি ডোবাবে। শিয়ালের ডাকে থমকে যাচ্ছ, একটু পরে বাঘ ডাকবে।

বাঘের কথা বলে আড়চোখে পেছনটা একবার দেখে নিলেন। ডাকাতটার সাড়াশব্দ না পেয়ে বুঝলেন বাঘের ভয়টা ঠিক ধরল না।

অন্ধকারে এঁকেবেঁকে আরও কিছুক্ষণ হার্মাদটাকে ঘুরিয়ে তালকানা করে ছেড়ে দিয়ে ঝুপসি অশ্বত্থর আড়াল থেকে কিছুক্ষণ নজরদারী চালালেন কালিপদ। দেখেশুনে বুঝলেন, এই গোলোকধাঁধা থেকে বেরোতে বোম্বেটেটার বেশ কিছুক্ষণ লাগবে। পুরো ব্যাপারটা পাঁচজনে চাউর করা দরকার। খুব যে একটা গণ্ডগোল হতে চলেছে আজ রাতে তা পরিষ্কার বুঝে তাড়াতাড়ি পা চালালেন কালিপদ।

শশধরের বাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে পা টিপে টিপে এগোতে গিয়ে ভোম্বলের চোখে পড়ল দুটো ছায়ামূর্তি ঝুপ্ করে পাঁচিল ডিঙিয়ে নামল। তারপর নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কী সব ফিসফাস করে পুকুরপাড় ঘেঁষে সরে পড়ল। জোট বেঁধে কাজে নেমেছে এমন কারও কথা তো কানে আসেনি ভোম্বলের! বাতাসপুরের চোরেদের নাম সে একবারও না থেমে আওড়াতে পারে। কিন্তু এমন জোড়া চোরের কথা তো কখনও শোনেনি। কী যে সব কাণ্ড ঘটছে, একটু আগে প্রাণপাখি ডানা ঝটপটিয়ে আবার কোনওমতে খাঁচায় ফেরার পর থেকে ভোম্বলের বুদ্ধিসুদ্ধি কেমন যেন গুলিয়ে গেছে। পেয়ারা গাছের ডালে দোলা বিটকেল বুড়োর কথা ফেলতে সে সাহস করেনি। কোনও রকমে মার্বেলগুলিটা জায়গামতন ফেলে আসতে পারলে সে বাঁচে, কিন্তু ছায়ামূর্তি দুটো যাচ্ছেই বা কোথায়? কী যে ঘটছে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। সব যেন গিঁট পাকিয়ে আছে। তবে হাজার ভয় পাক, হারু সর্দারের ছেলে সে, এসব ছন্নছাড়া আজগুবির মধ্যে কোথাও কিছু একটা কাণ্ড ঘটছে তার আঁচ পেতে ভোম্বলের ভুল হয়নি। দেখাই যাক না, ছায়ামূর্তি দুটো কোথায় যায়। পেছন পেছন গেলে পায়ের শব্দে সজাগ হতে হবে তেমন কাঠখোট্টা চলাফেরা নয় ভোম্বলের। হাড়ভাঙা অভ্যেসে এ জিনিস সে রপ্ত করেছে। বুকপকেটের পাথরটায় একবার হাত ছোঁয়াল। পুরো রাত পড়ে রয়েছে, ফেরত দেবার মেলা সময় পাওয়া যাবে 'খন।

শশধর, সত্য ভট্চায আর নিতাইয়ের সাঙ্গপাঙ্গরা বিদায় নিলে জটাধর তার নিজের জায়গায় ফিরে এল। মাদুরখানা বিছিয়ে আয়েস করে তার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণ এটা-ওটা-সেটায় পায়েসের কথাটা মাথায় ছিল না। এখন মনটা আবার দুঃখু-দুঃখু হয়ে গেল। কোঁচড়ে একটা ঠোঙার মধ্যে দু-খানা বাসি রুটি আর একডেলা ভেলিগুড় আছে। কিন্তু মনের মধ্যে সাদা পুরু ক্ষিরের ওপর অল্প অল্প কিসমিস ছড়াচ্ছে। জটাধর চোখ বুজল।

—পিত্তি পড়বে বাপ, যা আছে তাই দুটো মুখে দে।

জটাধর চোখ খুলল না, গলা চিনতে পেরেছে—কী করি খুড়ো? এখন এ জিনিস গলা দিয়ে নামবে না।

—কিন্তু পেটে তো কিছু পড়তে হবে। খালি পেটে তো পড়তে হবে। খালি পেটে তো গান হবে না।

—গান আর হবে না খুড়ো, কাল সকাল হলে বিধু হালদারের কাছে একবার যাব। তার মশলাপাতির দোকানে একটা কাজ জোটাতে হবে।

—বিধুর কাছে? না না, সে বড় মন্দ লোক রে। তোকে গরু-গাধার খাটান দেওয়াবে।।

জটাধর লম্বা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—তা দেওয়ায় দেওয়াবে। মাস গেলে দুটো পয়সা তো পাব। তাই দিয়ে একদিন একটু পায়েস খাব খুড়ো।

—কিন্তু গান থেমে গেলে যে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

—গান গেয়েও তো কিছু হচ্ছেনা খুড়ো!

গায়ে একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস লাগল জটাধরের। চোখ খুলে দেখল মাদুরের কোণার দিকে সাদা ধুতি পরে ধবধবে পৈতে গায়ে দিনুখুড়ো বসে আছেন। গায়ে কাঁটা দিল।

—গান গেয়ে গান হয় জটাধর। অন্য কিছু তো হওয়ার কথা নয়।

উঠে বসল জটাধর। কোটরে ঢোকা চোখে কী এক অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে দিনুখুড়ো। বেঁচে থাকতে জটাধর ঠিক এমনটাই দেখেছে খুড়োকে।

—রুটি গুড় মুখে দিয়ে পেট ভরে জল খা বাপ। তারপর

মোক্ষম করে একখানা সুর ভাঁজ।

শনের দড়ির মতো হালকা, লম্বা-সাদা চুল হাওয়ায় উড়ছে।

—লোভ বড় বালাই রে বাপ। লোভ বড় বালাই।

জটাধর মাথা নামাল।

—খেয়ে-দেয়ে গায়ে বল আন। আজ রাতে আরও ছুটোছুটি আছে রে। বিপদ, বড় বিপদ!

—কীসের বিপদ?

—নিধুবটির আমবাগানে বড় বিপদ ঘাপটি মেরে রয়েছে। তবে বেশিক্ষণ তাকে আটকে রাখা যাবে না। একবার বেরোতে পারলে বড় সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটবে।

—কে রয়েছে ওখানে?

—যে আছে সে মানুষ নয়।

জটাধর আমতা আমতা করে বলল—মানুষ নয়তো কী ইয়ে! মানে আপনার মতোই...!

—ওরে নারে। তাহলে আর ঘাবড়ানোর কী ছিল? আমরাতো একরকম মানুষই রে। শুধু দেহ থাকার আগে আর পরে। তোর গান শুনলে আমার মনের ভেতরটা যখন আকুলিবিকুলি করে তখন দিব্যি বুঝতে পারি এখনও পুরো অমানুষ হইনি। কিন্তু নিধুবটির বাগানে যে চর্কিপাক খাচ্ছে, সে সাত জন্মেও গান শোনেনি, মুস্কিল তো সেখানেই।

—তাহলে উপায়?

—এক কাজ কর, খেয়েদেয়ে নিয়ে একবার শশধর চাটুজ্জের বাড়ি যা দেখি।

—সে কী, সেখানে যাব কেন খুড়ো?

—দুয়ে দুয়ে ঠিক চার করতে পারছি না রে। তবে কাছাকাছি যা পারছি তাতে শশধরের বাড়ি যাওয়াই বলে।

—তা আপনি যেকেনে বলছেন, তাই যাব।

—এবার যেতে হবে রে। দেহ ধারণে বড় কষ্ট হয়। তুই যা। ভয় পাসনি। আমি তোর সঙ্গে সঙ্গেই রইলুম। চোখটা একটু বন্ধ কর বাপ, আমি যাই।

টর্চের পেছনে দু-চারটে থাবড়া দিয়ে নিভু নিভু আলোটাকে একটু জোরদার করে সেজকা মুখ দিয়ে 'চিক চিক' করে আওয়াজ করল।

—ধুস্, টর্চটা তো নিভে যাবে এক্ষুনি।

রাধাকৃষ্ণের ভাঙা দোলনা ছাড়িয়ে সিঁড়ি ধরে চেনা রাস্তায় বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছে রামু ডাক দিল—ভুনুদাদু, আমি রামু।

আশপাশ থেকে কোনও সাড়াশব্দ এল না।

রামু আবার ডাকল—ভুনুদাদু, আমি রামু। তোমার সঙ্গে বড্ড দরকার।

সেজকা সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নিচে নেমে গেল।

—কোথায় যাচ্ছ সেজকা?

—তুই ডাক। আমি একটু তলায় নেমে দাঁড়াই, তোর ভুনুদাদু বোধহয় আমি থাকলে সামনে আসবে না।

সেজকার কথা শেষ হতে না হতেই সামনে জমাট অন্ধকারে সাদা ঘষা কাচের মতন আলো দেখা গেল। তার ওপর ভুনুচবুড়োর মুখ। বাঁশির মতন সুরেলা শব্দ এল।

—বলো রামু।

সেজকার হাত থেকে টর্চটা পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেয়ে সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে পড়ে গেল। ঘষা কাচের মতো আলোটা স্থির হয়ে গিয়ে একটা সাদা পর্দার মতন হয়ে গেল। ইস্কুলমাঠে মেশিন চালিয়ে পর্দায় সিনেমা দেখায়, কতকটা সেই রকম।

সেজকা রামুর পাশে এসে দাঁড়াল— নিম্বো এখানে এসে পৌঁছেছে। সে পাগলের মতো খুঁজছে আপনাকে।

ভুনুচবুড়ো দাড়িতে হাত বোলাল—পাথরটা কোথায়?

রামু বলল—পাথর নেই, পাথর হারিয়ে গেছে।

—কিন্তু পাথরটা তো তোমার কাছে এতক্ষণে পৌঁছে যাওয়ার কথা।

সেজকার কপালে একটা চওড়া ভাঁজ পড়ল—আপনি জানেন, সে পাথর কোথায় আছে?

—পাথর এখন যার কাছে তাকে আমি ফেরত দিতে বলেছি।

মিত্তিরদের বাগানে ছায়ামূর্তি দুটোকে ঢুকতে দেখে বেজায় ঘাবড়ে গেল ভোম্বল। দিনের বেলায় যেখানে আসতে অনেক ডাকাবুকোর বুক কাঁপে, সেখানে এই রাতে মানুষ দুটো ঢোকে কোন সহসে? আর কেনই বা ঢোকে? এই কেনর উত্তর পেতে অবশ্য বেশি মাথা ঘামাতে হল না ভোম্বলকে। এই বাগানের পোড়ো মন্দিরেই তাহলে ডেরা বেঁধেছে জোড়া মানিক। সাহসও বলিহারি যাই। মনে মনে দুজনের সাহসের তারিফ না করে পারল না ভোম্বল।

ডেরা যেখানে বেঁধেছে, হাতানো মালপত্তরও এখানেই রেখেছে, সন্দেহ কি তাতে? সেসব কি বড় কম হবে? উঁহু, এমন সাহসী ঘুঘু জোড়ামানিক নিশ্চয়ই ঘড়া ঘড়া ভরিয়ে রেখেছে একেবারে। সাত জন্মেও এমুখো যে কেউ হবে না তা মাথায় রেখে যে সাত রাজার ধন গচ্ছিত করেছে এরা, তাতে ভুল হবার কি যো আছে? ভোম্বলের মনটা নেচে উঠল। কপাল যখন খোলে, এমনি করেই খোলে। বেশি কিছু না। ডেরাটা চিনে রেখে তক্কে তক্কে থাকা। যেই ব্যাটারা কাজে-কম্মে বেরোবে অমনি চিচিং-ফাঁক। একটু আগেই মন্দ বরাতের ফেরে কি না কি নাজেহাল হতে হয়েছে। আর এখন একেবারে পুরো মাথাটাই কপাল বলে মনে হচ্ছে। ভোম্বল মনে মনে পিঠ চাপড়ে দিল বেশ করে, ঠিক সময় জোড়া মানিকের পিছু নিয়েছিল বলেই না এই হল।

মাথার ওপর ফটাস্ করে কিসে যেন চাঁটি মারল। ভোম্বল লাফিয়ে উঠল। একটু আগে কপালে মার্বেল লেগে জায়গাটা এখনও ব্যথা ব্যথা রয়েছে, তারপরে ভুতুড়ে বুড়োর খপ্পরে প্রাণ যায় হয়েছিল, যদি বা এখন কপাল ফিরল আবার মাথায় চাঁটি মারে কে?

—কে রে ব্যাটা, চাঁটি মারছিস?

উত্তর এল না। দ্বিগুণ জোরে ফটাস্ করে আর একটি চাঁটি এসে পড়ল গালে।

—হতচ্ছাড়া, অপদার্থ! কে যেন বলে উঠল।

ভোম্বল গালে হাত বুলিয়ে এদিক ওদিক চাইল—কে রে লুকিয়ে চাঁটি মারছিস? সাহস থাকে তো সামনে আয়।

—বাজে বকিসনি, সামনে এলে দাঁতে জিভে গিঁট পড়ে যাবে।

আবার এক থাপ্পড়। এবার অন্য গালে।

—এখানে ওৎ পেতে কী এপাশ ওপাশ ভাবছিস?

চারদিকে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভোম্বল খেলায় করল তার প্রাণপাখিটা আবার খাঁচার ভেতর ঝট্‌পট্ করছে।

—তুই আমার নাম ডোবালি রে, অথচ কত সাধ করে তোকে কালু ওস্তাদের কাছে নাড়া বাঁধিয়েছিলুম! চেনা চেনা করেও ঠিক বুঝতে পারছিল না ভোম্বল। এবার আর ভুল হল না, হারু সর্দার। ভয়টা চলে গেল ভোম্বলের। কতদিন আগে শেষ বাপের সঙ্গে কথা কয়েছে, আর এই আজ। ভোম্বল বড় আদর আস্কারা পেয়েছে বাপের কাছে।

—আমি করলুম কী যে মারছ অমন করে?

—এখানে বুরবকের মতন দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

—বা রে, মালপত্তরের খোঁজ পাব পাব করছি যে!

কানটা ধরে কেউ মুলে দিল—যকের ধনের আশায় সং সেজে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস উলুম্বুস? অথচ বাতাসপুরে এখন সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটার দরকার সেই সাত রাজার

ধন এক মানিক তোর কাছেই রয়েছে।

—কোথায় রয়েছে?

—তোর কাছে, তোর কাছে। পাথরটা জায়গা মতন ফেরত দিলি না কেন?

মুখ গোঁজ করে ঠোঁট ফোলাল ভোম্বল—বারে, সময় পেলুম কই?

—ওই তো হয় রে মুখ্যু, দামি জিনিস সময়ে যে চিনতে পারে না সে তো আকাট! যেমন তুই।

পাছে বকুনির পর মাথায় আবার চাঁটি পড়ে তাই দু-পা পিছিয়ে গেল ভোম্বল।

—তাহলে এখন যাই, এটা ফেরত দিয়ে আসি।

—বাগানের ভেতর পোড়ো মন্দিরে যা, সেখানেই পাথর হাত বদল কর।

—ওখানে আবার কার হতে পাথর দেব?

—মেলা বকিসনি, যা করতে বলছি কর।

ধমক খেয়ে ভোম্বল ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে সুড়ুৎ করে গলে গেল। পেছন থেকে হারু সর্দার বললেন—চাঁটিটা কি খুব জোরে হয়ে গেল নাকি রে? খুব লাগেনি তো?

ভোম্বল চোখ দুটো রগড়ে নিল—তুমি ভালো আছ তো?

—হ্যাঁ রে, দিব্যি আছি। গুণে পণ্ডিতকে বলেছিলুম, ছেলে আমার বংশের মুখ রাখবে। তার খেলাপ হতে দিসনি। পাথর ফেরৎ দে, দশজনের পাশে দাঁড়া। তবে না তুই ওস্তাদ!

ভুনুচবুড়োর মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল।

—পাথর না থাকলে নিম্বোকে ঠেকাবে কে?

সব বৃত্তান্ত শোনার পর সেজকা গুম মেরে গিয়ে মাথা চুলকোচ্ছে।

—নিম্বো কী করতে পারে মোটামুটি একটা ধারণা দিতে পারেন?

—তোমাদের এই বাতাসপুর চোখের নিমেষে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। তার কাছে আছে লাল পাথর। আরসাইনের প্রথম সারির খারাপ ফুলোটদের শয়তানী বুদ্ধি ভরা পাথর। তাকে জব্দ করা কঠিন, খুব কঠিন।

রামু সেজকার জামা আঁকড়ে ধরল।

—তাহলে কী হবে? পাথর পাবো কেমন করে?

সিঁড়ির তলায় গুটিসুটি মেরে উঠে এল একজন—পাথরটা নিন কত্তা। একটু দেরি হয়তো হয়ে গেল।

কালিপদর কাছে ঘটনাচক্র শুনে শশধরের বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। ইতিমধ্যে ঘর লণ্ডভণ্ড করে শশধর এটুকু জেনেছেন রামু তার সেজকার সঙ্গে কোথাও লোপাট হয়েছে। হলধর পেছনে হাত রেখে সিংহবিক্রমে উঠোনে পায়চারি করছেন।

—তৈরি হয়ে নাও সবাই। নিধুবটির বাগানে গিয়ে ডাকাতটাকে বেঁধে আনতে হবে।

শশধর একটা জলচৌকিতে বসে গম্ভীর মুখে শুনছিলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমার বন্দুক কোথায়?

ভবতারিণী খেঁকিয়ে উঠলেন—লোক হাসাসনি আর। সে বন্দুকের গোড়ায় পাপোশ লাগিয়ে আমি দেওয়াল পরিষ্কার করি, দেখতে পাসনি?

শশধর মাথায় হাত দিয়ে আবার বসে পড়লেন।

—সর্বনাশ, তাহলে বিপদের দিনে লড়ব কী দিয়ে?

ভবতারিণী জাঁতি দিয়ে চাপ মেরে কটাস্ করে একটা সুপুরি দু-চ্যালা করে বললেন—কেন? ঠাকুরপোর কাছে শুনলুম, বাঘ নয়, ভালুক নয়, নিতান্ত একটা দো-পেয়ে মানুষ। তার জন্যে এত গুলিবারুদের খোঁজ পড়ছেই বা কেন? মোটা দেখে একগাছা দড়ি নিয়ে যা। বেঁধে আনবি।

শশধরের মেজাজটা তিরিক্ষে হয়েই আছে।

—বাজে বকো না। সে কি আমাদের হাতে ধরা দেবে বলে হাপিত্যেশ করে বসে আছে?

হলধর পায়চারি থামালেন।

—আর সময় নেই, চলো সবাই।

তারাপদর মেজাজটা মোটেও ভালো নেই। নিতাইদের পাল্লায় পড়ে আর একটু হলে পাগল খুঁজতে বনবাদাড়ে যেতে হচ্ছিল। যদিও বা সে ফাঁড়াটা কাটাল, শশধরের বাড়িতে দশ মাথা এক হয়েছে দেখে দুটো টিকাটিপ্পনি দিতে এসে আবার বেরোবার কথা উঠতে তারাপদ বিপদ বুঝলেন। হলধরের প্রস্তাবে তিনি মোটেও রাজি হলেন না।

—চলো বললেই যাওয়া যায় নাকি? এত রাতে এমনি করে বেরিয়ে পড়াটা মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। চলুন চলুন, সবাই আপাতত সবাই একটু বিশ্রাম নিয়ে কাল ভোর হলে না হয়...।

সত্য ভটচায্ থামিয়ে দিলেন—এখুনি যাওয়া হবে।

তারাপদ তবু হাল ছাড়লেন না।

—আর একবার ভেবে দেখলে হত না?

নকুড় এগিয়ে এল হাসি হাসি মুখ করে—রাবণ বধে তোমাকেও যে নিয়ে যাব দশরথ। আমার ডানা কেটে গেছে তোমার নির্বুদ্ধিতায়, এমনিই ছেড়ে দেব?

নকুড়ের পূর্বস্মৃতি মনে করে কথা জড়িয়ে গেল তারাপদর।

নকুড় মুচকি হেসে শশধরকে বলল—চলুন কাকাবাবু।

হলধর হুঙ্কার ছাড়লেন—টর্চবাতি, হ্যারিকেন হাতে হাতে রাখো। মোটা লাঠি নিও গোটা চারেক। মশাল হলে ভালো হত, কিন্তু সে আর পাব এখন...?

সত্য ভটচায্ চোখ পাকিয়ে তাকালেন।

—সব ব্যাপারে তোমার একটা বাড়াবাড়ি না হলে চলে না নাকি হে?

শশধরের বাড়ি ছাড়িয়ে সবাই মিলে সবেমাত্র বেরিয়েছে, পেছন থেকে কেউ দৌড়ে আসছে শোনা গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দাঁড়াল জটাধর।

শশধর বললেন—তুমি আবার কোথা থেকে এলে?

জটাধর কাঁধের গামছাটা কোমরে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে বলল, —আমাকেও সঙ্গে নিন কত্তা। লাভ বই লোকসান হবে না।

দুটো লাল জোরালো আলো নিধুবটির বাগানে কাটাকুটি খেলছে। ধকধক করে জ্বলছে নিম্বোর চোখদুটো। হাতে একটা চৌকো মতন যন্ত্র। সেটাতে টেপাটেপি করতে করতে নিম্বো মাথাটা বনবন করে ঘোরাচ্ছে। বিপ-বিপ করে একটা আওয়াজ হচ্ছে মাথার ভেতর থেকে।

অনেকগুলো টর্চ আর হ্যারিকেনের আলো নিম্বোর মাথাটা স্থির হল। বুকের কাছে একটা জায়গা কৌটোর ঢাকনির মতন খুলে গেল। তার ভেতর থেকে কিছু একটা বার করে নিতে চোখের আলো দুটো দপ্ করে নিভে গেল। মুঠোটা ধীরে ধীরে খুলল নিম্বো। হাতের মধ্যে গনগন করে জ্বলছে লাল পাথর।

হরিপদ চেঁচিয়ে উঠল—ওই যে, ওই যে দস্যুটা।

সত্য ভটচায্ হাতের লাঠিটাকে শক্ত করে বাগিয়ে ধরতে গিয়ে পারলেন না। আকাশের এপার ওপার চিরে গিয়ে একটা কানফাটানো শব্দ হল। তারপর একটা গোঁ-গোঁ করে গুমরানোর আওয়াজ। হাওয়ার প্রথম ঝাপটাটা এল পশ্চিম দিক থেকে। উঁচু গাছগুলো নুয়ে পড়ে উঠে দাঁড়াবার ফুরসৎ পেল না। আবার একটা ঝাপটা। দ্বিগুণ জোরে। বনবন করে লাট্টুপাক দিয়ে হাওয়ার একটা কুণ্ডলী সবাইকে ছিটকে ফেলে দিল। একের পর এক কামান ফাটা আওয়াজ আর চোখ ধাঁধানো ছিটকে ওঠা বিদ্যুতের ঝলক।

জটাধর হাওয়ার ধাক্কায় দশ হাত দূরে জঙ্গলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে। মাথা তুলে দাঁড়াতে গিয়ে দেখল আকাশ ছোঁয়া তাল নারকেলের গাছগুলি হামাগুড়ি দিয়ে সামলে নেবার ফাঁকে বুড়ো শিবতলার মন্দিরের মাথাটা একবার বিদ্যুতের আলোয় চোখে পড়ল। বুড়ো শিবতলা এখান থেকে আধ মাইলের কম নয়। শরীরে একটা বরফ ছোঁওয়া ভয় ছ্যাঁক করে উঠল। হলধর আম গাছের ডাল ধরে নাগরদোলার মতন ঘুরছেন। চিৎকার করছেন প্রাণপনে—আহা, যাওয়ার আগে কী জিনিস দেখে গেলুম হে। সেই ছোট্টবেলায় রথের মেলায় ..., আর এই পর্যন্ত বলে আবার একবার ডাল ধরে পাক খেয়ে ফিরে আসছেন।

কালিপদ দাঁতে দাঁত চেপে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। একটা করে দমকা হাওয়া এসে ছেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে কিছুটা, হাতের কাছে ঝোপঝাড় যা পাচ্ছেন আঁকড়ে ধরে সামলাচ্ছেন। সোজা তাকালে বুকের রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে। পুরো নিধুবটির বাগান কালো আলখাল্লার মতন উথালপাথাল করছে, আর তার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পিশাচটা। হাতে কাঠকয়লার মতন জ্বলছে একটা লাল আগুন। আগুনটা ক্রমশঃ বড় হচ্ছে, আর তার থেকে উথলে উঠছে লাল আলোর ঢেউ। আতসবাজির মতন ছড়িয়ে পড়ছে অনেক উঁচুতে।

রামুর হাতে পাথরটা তুলে দিয়ে ভোম্বল আবার অন্ধকারে মিশে গেল। রামু পাথরটা শক্ত করে চেপে ধরে ভুনুচবুড়োর দিকে চাইল। বুড়োর মুখে এক চিলতে হাসি লেগে আছে। হঠাৎ মুখটা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল।

—সর্বনাশ! নিম্বো যে সব শেষ করে দেবে। তোমাদের বাড়ির লোকেরা সব দলবলে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। তার সামনে পড়লে আর নিস্তার নেই।

সেজকা বলল—তাহলে?

ধপ্ করে পুঁটলির মতন গড়িয়ে পড়ল ভুনুচবুড়ো। চোখ পিটপিট্ করে তাকাল।

—নিম্বো আমার সন্ধান পেয়ে গেছে।

—কী করে পেল?

বুড়ো বলল—তাও জান না, ওর কাছে শক্তিশালী নির্দেশক আছে যে। চিন্তার তরঙ্গ দিয়ে ধাক্কা মেরে খুঁজছিল। এখন পেয়ে গেছে।

—সর্বনাশ! তাহলে তো সে এক্ষুনি এখানে এসে হাজির হবে।

—না, আমার আশঙ্কা তার আগে তোমাদের লোকেদের সঙ্গে তার মুখোমুখি হবে। তাদের শেষ না করে সে এখানে আসবে না। রামু ভয়ে সেজকাকে জড়িয়ে ধরল। সেজকা বলল—তারপর?

—তারপর সে আমায় বন্দী করে পাথর ছিনিয়ে নেবে। আমার কাছে না পেলে আমাকে মেরে আবার খুঁজবে। নীল পাথরের সন্ধান তার চাই-ই। তার একমাত্র শত্রু, একমাত্র প্রতিপক্ষকে সে কিছুতেই ছাড়বে না।

সেজকা দাঁতে দাঁত চেপে বলল—খুঁজে পেলে তো ধরবে। রামু!

রামু সেজকার কথায় চমকে গেল—ক্-কী।

—দে দৌড়।

রামু চোখ বড় বড় করে বলল—কোথায়?

—বাড়ি।

—যদি কেউ দেখে ফেলে? উত্তেজনায় রামুর সারা শরীর কাঁপছে।

—কেউ জানবে না। চল।

ভুনুচবুড়োকে কাঁধের ওপর বসিয়ে রামুর হাত ধরে সেজকা বাগানের ভাঙা পাঁচিল টপকে ছুটতে ছুটতে বলল—সায়েন্স ফিকশন্ কাকে বলে জানিস রামু।

রামু হোঁচটা খেতে খেতে সামলে নিল। সেজকা কখন যে কি বলে?

—বুদ্ধু ভুতুমের গল্প কিন্তু সায়েন্স ফিকশন্ নয়, জানিস। এক একবার মনে হচ্ছে, তোর মতন হাফপ্যান্ট পরে রয়েছি রে। ঠিক তক্ষুনি আকাশচেরা আলো ঝলকে উঠে গোঁ-গোঁ আওয়াজটা শুরু হল।

ভবতারিণী উঠোনে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে ছিলেন। পাশে কমলা।

কমলা ধরা গলায় বললেন—কোথায় কী হচ্ছে মা, আমার বুক কাঁপছে?

ভবতারিণী বললেন—তুই ঘরে যা। কুসুমকে ঘুম পাড়া। এতগুলো মানুষ একসাথে গেছে, বিপদ কিছু হবে না।

বললেন বটে, কিন্তু তার নিজের মনও বড় উসখুস করছে। এমন আকাশ ফাটানো আওয়াজ, আর গাছগাছালি, ঘরের চাল ওড়ানো হাওয়ার দাপট ভবতারিণী তার জ্ঞানতঃ দেখেননি। সব দুমড়ে মুচড়ে যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

শশধরদের গোয়ালে বছর কুড়ি আগেও পাঁচ-সাতটা গরু থাকত। শশধরের বাবা নটবর নিজে গরুদের যত্ন নিতেন। গরুঅন্ত প্রাণ ছিল তাঁর। আদর করে সুন্দর সুন্দর নামও দিয়েছিলেন প্রত্যেকের। গোয়ালে বসে নিজে ভগবতী পুজো করতেন। খড়-বিচুলি নিজের হাতে দিতেন। প্রতিদিন নিয়ম করে চান করাতেন। রাতে সেরটাক দুধ নিয়ে আয়েস করে আরামকেদারায় এলিয়ে যেতেন।

নটবর গত হবার পর গরুর পাট এ বাড়ি থেকে উঠে গেছে। গ্রামের ব্রাহ্মণ ডেকে ভবতারিণী তাঁদের হাতে সব তুলে দিয়েছেন। গোয়ালটা এখনও আছে।

গোয়ালঘরের চালের কিছু অংশ একটু আগে হাওয়ায় নিয়ে গেছে। বাঁশ-বাখারিগুলোও হাড়মড়মড়ি আওয়াজ করছে। ঘাড় গুঁজে পড়তে আর দেরি নেই।

ভুনুচবুড়ো চোখ গোলগোল করে বলল—আমায় এখানে রেখে যত তাড়াতাড়ি পার নিধুবটির বাগানে যাও। এতক্ষণে বোধহয় মানুষগুলোকে মেরেই ফেলল।

ভুনুচবুড়ো রামুর হাতে হাত ছোঁয়াল—যাও রামু, তুমিই এখন ভরসা।

রামু সেজকার দিকে চাইল—আমি কী করব?

ভুনুচবুড়ো বলল—নীলপাথর তোমার কাছে। তুমি ছাড়া নিম্বোকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। যাও দেরি কোরো না।

রামু নীলপাথরটা হাতে নিল। ভুনুচবুড়ো বলল—চোখ বন্ধ করো।

রামু তাই করল—এবার একমনে ইচ্ছে কর। কী চাইছ তুমি।

—কী চাইছি আমি? রামু সম্মোহিতের মতো বলল।

ভুনুচবুড়ো খ্যাংরাকাঠির মতো আঙুলগুলো মুখের সামনে দোলাচ্ছে।

—কী চাইছ বল?

—নিম্বোকে থামাতে হবে। সবার খুব বিপদ। বাঁচাতে হবে।

রামুর কথা শেষ হতে একটা তীব্র আলোয় গোয়ালঘরটা ভরে গেল। রামু চোখ খুলল। নীলপাথরটা জ্বলছে। রামুর শরীরে ঠাণ্ডাজলের কি যেন বয়ে যাচ্ছে। নিজেকে পালকের মতন হাল্কা লাগছে।

বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সামনের ফাঁকা জমিতে পড়ে রামু খেয়াল করল আশেপাশের সবকিছু বিদ্যুতবেগে পেছনে সরে যাচ্ছে। নিজেকে অনেক লম্বা মনে হচ্ছে তার। তলার দিকে তাকিয়ে দেখল পা-দুটো আর মাটিতে নেই।

(চলবে)

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

জেনে রাখা ভালে

বিমল দেব

শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের সভাকবি মির্জা গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯) কলকাতায় এসেছিলেন ১৮২৬ অথবা ১৮২৭ সালে। রামমোহন রায় তখন জীবিত ও সক্রিয়। অতুলনীয় গজল রচয়িতা গালিবের আসন নাম কিন্তু মির্জা আসাদুল্লা বেগ। তাঁর নামে ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের নাম হয়েছে মির্জা গালিব স্ট্রিট।

পিসার টাওয়ার কি হেলেই থাকবে?

মনোজ ঘোষ

বিংশ শতকের আটের দশক পর্যন্ত দেখা গেছে পিসার বিখ্যাত টাওয়ার ক্রমাগত হেলে যাচ্ছে এবং সূর্যের তাপে কলার মতো সামান্য বেঁকেও যাচ্ছে। ১৯৯০ সালে দেখা গেছে টাওয়ারটি খাড়া অবস্থা থেকে ৫.৫ ডিগ্রির মতো হেলে আছে এবং উত্তর দিকের তুলনায় দক্ষিণ দিকটা ২.৫ মিটার বা ৮ফুটের মতো নেমে আছে।

প্রায় ৮০০ বছরের বেশি সময় আগে ১১৭৪ সালে এট্রুস্কানেরা এই টাওয়ার তৈরির কাজ শুরু করেন। কিন্তু জায়গাটা জলাভূমি হওয়ার দরুন টাওয়ারের ক্রমবর্ধমান ভার বহন করা নরম মাটির পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিন তলা বা ৩৫ ফুটের মতো নির্মাণের পর টাওয়ারটি উত্তরের দিকে হেলতে শুরু করে। রাজমিস্ত্রিরা ছোটোবড়ো মার্বেল পাথর বসিয়ে টাওয়ারটির উল্লম্বতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন।

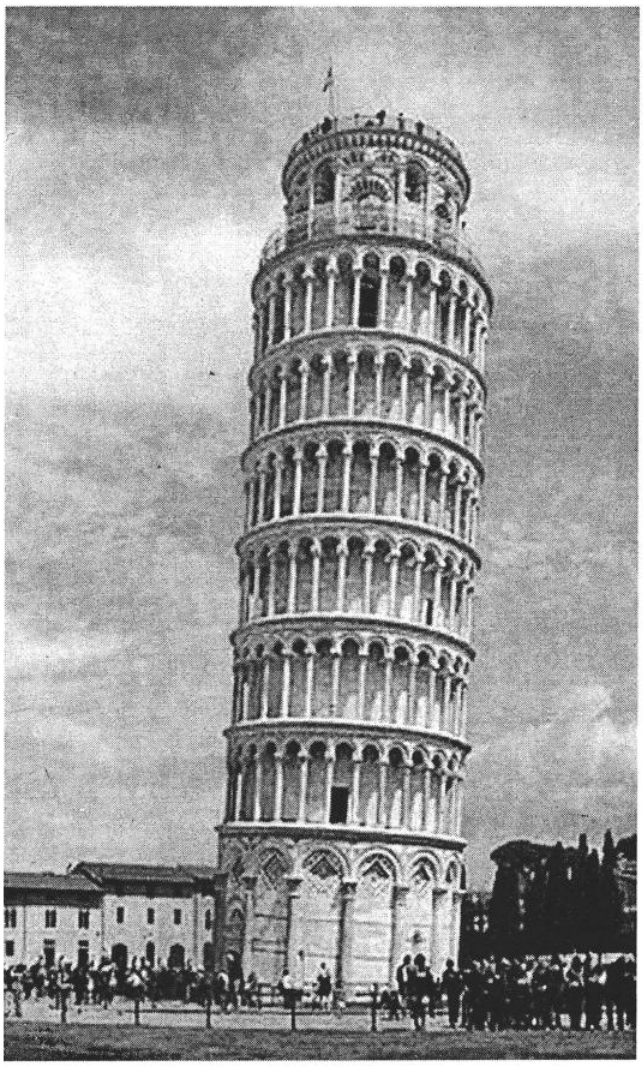

ইতালির বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের দরুন প্রায় একশো বছর নির্মাণের কাজ বন্ধ থাকে। তারপর আরও চারটি তলা জিওভ্যান্নি ডি সিমোনের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়। চতুর্থ তলা নির্মাণের সময় উত্তর দিকে বসানো পাথরগুলো দক্ষিণ দিকের তুলনায় ১০ সেন্টিমিটার বেশি পুরু রাখা হয়। সপ্তম তলার কাজ শেষ হয় ১৩১৯ সালে। নির্মান কাজ শুরু হবার ২০০ বছরেরও বেশি সময় পরে ১৩৯৯ সালে অষ্টম ও শেষ তলা নির্মিত হয়। অষ্টম তলার ঘণ্টাঘরে দক্ষিণ দিকে চারটি সিঁড়ি এবং উত্তর দিকে কেবল তিনটি সিঁড়ি আছে।

সাদা মার্বেলে তৈরি সিলিন্ডার বা বেলনাকার পিসার টাওয়ারের পরিকল্পিত উচ্চতা ছিল ৬০ মিটার বা ১৯৭ ফুটের মতো। এখন তার সর্ব্বোচ্চ উচ্চতা ৫৬.৬৭মিটার বা ১৮৫ ফুটের মতো এবং নীচের ব্যাস ৫০ ফুটের সামান্য বেশি। ওপরের বেল টাওয়ারে উঠতে গেলে মোট ২৯৭টি সিঁড়ি ভাঙতে হয়।

পিসার টাওয়ার প্রতি বছরে গড়ে এক মিলিমিটারের মতো হেলেছে। ১৯২০ সালে টাওয়ারের গোড়ায় চারদিকে সিমেন্টের হাঁটাপথ তৈরি করা হয়। তার বছর দশেক পরে বেনিটো মুসোলিনির আমলে টাওয়ারের ভিতে ১৮০০ টন সিমেন্ট গ্রাউটিং ঢালা হলেও তার হেলে থাকা অব্যাহত থাকে। জলাভূমি থেকে টাওয়ারের ভিতকে বিচ্ছিন্ন করে হাইড্রোলিক উইঞ্চের সাহায্যে তাকে খাড়া করার পরিকল্পনাও একবার করা হয়। এমন নয় যে পিসার এই একটিই হেলানো টাওয়ার আছে। পিসার নিকটবর্তী অঞ্চলে এরকম আরও সাতটি টাওয়ার কমবেশি ঝুঁকে আছে। আসলে 'পিসা' নামটা ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে একটি গ্রীক শব্দ থেকে নেওয়া, যার অর্থ 'জলাভূমি'।

১৯৯০ সালে পিসার হেলানো টাওয়ারটির সংরক্ষণের জন্যে এবং তার হেলে পড়া অন্তত ১০ শতাংশ কমানোর জন্যে ইতালীয় সরকার একটি কমিশন গঠন করেন। সেই

কমিশনের অন্যতম সদস্য লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের সয়েল মেকানিক্স বা মৃত্তিকা-বলবিদ্যার অধ্যাপক জন বারল্যান্ডের নেতৃত্বে টাওয়ারের ঝুঁকে থাকার কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়।

টাওয়ারটিকে সুস্থিত করার জন্যে কমিশন দুটি সরল পদ্ধতি অবলম্বন করেন। টাওয়ারের উত্তর দিকের ভিত খুঁড়ে ধাপে ধাপে ছড়িয়ে থাকা ভিতের ওপর ৬০০ টন ওজনের সীসের ব্লক বসানো হয় ভূতল থেকে তিন মিটার ওপর অবধি। এতে অবশ্য কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মনে হয়েছে এত বছর ধরে হেলে থাকা টাওয়ারটিকে পড়ে যাওয়া থেকে যা রক্ষা করে এসেছে সেই স্থিতিস্থাপকতা বা নমনীয়তা কমে যেতে পারে। টাওয়ারের গা থেকে পুরোনো পাথরের অংশ যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্যে তার বিভিন্ন উচ্চতায় মোটা ইস্পাতের বেল্ট লাগিয়ে দেওয়া হয়।

এই ব্যবস্থায় টাওয়ারের হেলে পড়ার প্রবণতা অনেকটা কমানো সম্ভব হয়েছে। এখন টাওয়ারের দক্ষিণ দিকে ওপর থেকে কোনও জিনিস ফেললে তা টাওয়ারের গোড়া থেকে প্রায় ১৬ ফুট দূরে গিয়ে পড়বে। অনেকে মনে করেন, নীচের নরম মাটি একেবারে শুকিয়ে ফেলে উইঞ্চ দিয়ে টাওয়ারকে সোজা করে সঙ্কোচনমুক্ত সিমেন্ট গ্রাউট ব্যবহার করে হেলে থাকা থেকে টাওয়ারকে চিরকালের জন্যে মুক্ত করা সম্ভব। অবশ্য এ-ব্যাপারে চিরস্থায়ী সমাধান নির্ভর করছে রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারণের ওপর, কেন-না পিসার হেলানো টাওয়ার আবার কখনও যদি খাড়া হয়ে দাঁড়ায় এবং সেই হেলানো টাওয়ারের এবং সেই হেলানো টাওয়ারের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ভ্রমণকারীর শরীরের মধ্যে ভয় ও বিস্ময়ের একটা অদ্ভুত শিরশিরে অনুভূতি যদি না জাগে, তাহলে তার আকর্ষণ হয়তো চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে।

সন্দেশীদের জন্য কিশলয়ের উপাচার

পাণ্ডুলিপি থেকে সরাসরি বই হিসাবে প্রকাশিত

এই কলকাতার ছেলে ধ্রুব কীভাবে জড়িয়ে গেল জল দস্যুদের সঙ্গে? এই জলদস্যুরা আদিকালের জলদস্যুদের নতুন সংস্করণ। কিভাবে পৌঁছল সে কালোটিয়ার দ্বীপে এবং কীভাবে খুঁজে পেল অদ্ভুতভাবে লুকনো গুপ্তধন!

জানতে হলে পড়তেই হবে

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত-র

কালোটিয়ার দ্বীপে ১২৫

কিশলয় প্রকাশন

৯/৩, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

চলভাষ ৯৬৭৪০৮২৭৭৪

মৌটুসী খুব খুশি

ধীরা পালিত

অন্য পাঁচটা সকালের মত সেদিনও ভোরের চা খেয়ে বাগানে ঘুরঘুর করছিলাম। হঠাৎ মহারানীদি দোতলা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে এসে বলল, 'বৌদি দেখবে এসো, দোতলার জানলার বাইরে একটা ছোট্ট পাখি কী সুন্দর বাটির মতো একটা বাসা বানাচ্ছে!' কোনও মতে হোঁচট সামলে, তড়বড় করে ওপরে উঠে দেখি, বাগান বিলাসের সরু ডাল থেকে সত্যিই একটা জটা জালের মতো থলি ঝুলছে। তাড়াতাড়ি জানলার পর্দা টেনে, ফাঁক থেকে লক্ষ্য রাখতে আরম্ভ করলাম। দিনটা ছিল তেস্‌রা মে, ২০১২ সাল।

আমাদের এই মৌটুসী জোড়াটি ল্যাজ সুদ্ধ লম্বায় প্রায় দশ সে.মি.। গিন্নির তুলনায় কর্ত্তা একটু মোটাসোটা আর ওর গায়ের রংটাও অনেক বেশি উজ্জ্বল। এদের ঠোঁটগুলো ছুঁচলো, সরু, লম্বা আর কাস্তের মতো বাঁকানো। পেটের দিকের রং, বাসন্তী। ছেলেদের মাথা, পিঠ, লেজ সব কালচে নীল-বেগুনি ধরণের আর মেয়েদের মাথা, পিঠ, লেজ অনেকটা ধূসর।

ওদের বাসা বানানোর সময় দেখতাম বাগানের ঝোপ ঝাড় থেকে মাকড়সার জাল (ঝুল) খুঁটে খুঁটে নিয়ে যাচ্ছে। বাসাটা লম্বায় প্রায় চার ইঞ্চি আর থলেটার ব্যাস দুই ইঞ্চির মত। থলের ওপরের দিকে, একপাশে ঢোকা-বেরুনোর জন্য একটা ফুটো করে রেখেছে যার মাথায় খেলোয়াড়দের ক্যাপের মতো একটা hood বানিয়ে রেখেছে। বাসাটার গায়ে সাদা, বাদামি, খয়েরি কী সব সাঁটিয়ে সাজিয়েছে। আর সমস্তটা খুব শক্ত করে গাছের ডালে বাঁধা আছে। বাসাটা বানানো হয়ে গেলে পোকা-মাকড়, উচ্চিংড়ে এইসব এনে বাসার মধ্যে জমা করেছে।

এইসব কর্মকাণ্ডের গল্প শুনে এক উৎসাহী বন্ধু ফরমায়েশ করল, 'বাসাটা তো তোমার জানলার এত কাছে, ডিম ফুটলে মা যখন বাচ্চাকে খাওয়াবে, তখন ছবি তুলে রেখো, খুব মিষ্টি দেখাবে।'

কিন্তু ডিমই বা কোথায় আর মা-বাবাই বা কোথায়? বাসা বানানোর পর তাদের তো আর পাত্তাই নেই। তাই দেখে আমার খুব মন খারাপ হ'ল, ভাবলাম পর্দার আড়াল থেকে আমার উঁকি ঝুঁকি মারা ওরা মোটেই পছন্দ করেনি। তাই বিরক্ত হয়ে অন্য কোথাও ঠাঁই নিয়েছে।

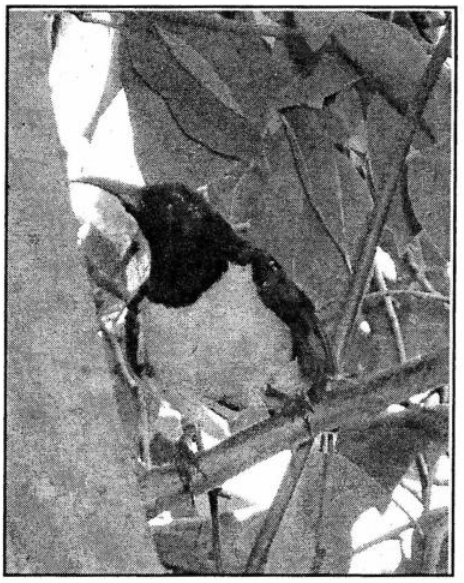

কিন্তু নাঃ, তা নয়। তিন চার দিন পরে ওরা আবার ওই লতাটায় এসে ডাকাডাকি আরম্ভ করল। ওরা থেকে থেকেই সুঁ—ই, সুঁ—ই করে শিশ্ দেয়, আবার কখনও মহা ফুর্ত্তিতে দু-জনে মিলে ক্যালরব্যালর করে। আয়তনে প্রায় টুনটুনির মতো হলেও গলায় অত জোর নেই। এবারে পর্দা ফাঁক করে দেখলাম ওরা মহানন্দে এ-ডাল ও-ডাল করে বেড়াচ্ছে কিন্তু বাসাটার মধ্যে কেউ ঢুকছে না। ওদের উচ্ছ্বাস দেখে মনে হ'ল মা-পাখিটা নিশ্চয় ডিম পেড়েছে আর ওরা দু-জনে মিলে নেচে গেয়ে সেই খবরটা সবাইকে জানানোর চেষ্টা করছে।

একদিন পাখি দুটো যখন খেতে চলে গেল, তখন জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাসাটা কাছে টেনে, নেড়ে চেড়ে বহু কসরত করে বাসাটার ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করলাম ওখানে ডিম আছে কি নেই। কিন্তু থলেটার নীচ অবধি চোখ যাওয়ার কোনও উপায় নেই। কারণ থলিটা এত গভীর, ফুটোটা এত ছোট এবং ফুটোর কার্নিশটা এতটাই নামানো যে, কোনও ভাবেই তলা অবধি চোখ পৌঁছয় না। যাই হোক বাবা-মার ব্যস্ততা আর ফুর্তি দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে মা পাখির ডিম পাড়া হয়ে গেছে। অথচ মা-পাখিকে তেমন ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'তা' দিতে দেখা গেল না। ওরা কি রকম কায়দা করেছে জানো তো! ঠিক কচ্ছপের মতো। কচ্ছপরা যেমন ডিম পেড়ে, বালি চাপা দিয়ে রোদের তাপের ভরসায় রেখে যায়, মৌটুসীরাও তাই। ওরা বুদ্ধি খাটিয়ে এমন ভাবে বাসাটা বানিয়েছে যাতে ফুটোর দিকটা থাকে লতার ছায়ার আড়ালে আর বাসার পেছন দিকটা সারা দুপুর গ্রীষ্মের

ঠা ঠা রোদ্দুরে ভাজা ভাজা হয়ে যায়। ব্যাস্, মায়ের আর কোনও কাজ নেই সে কেবল নাচে আর গান গায়। আর থেকে থেকে ফুরুৎ করে পালিয়ে যায়। বাবাটার হয়েছে যত হ্যাপা। সে বাসার কাছাকাছি একটা ডালে চুপ করে বসে বসে পাহারা দেয়, কোনও শত্রু তাদের ডিম বা সাধের বাচ্চাদের ক্ষতি করতে আসছে কি না!

এরমধ্যে একদিন খুব মিহি সিঁ —, সিঁ— শব্দ শুনে বোঝা গেল মৌটুসীর ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়েছে। ভাবলাম, এই সুযোগ, সেই বিখ্যাত 'বাচ্চা খাওয়ানোর' ছবি তোলার। কিন্তু কই, মা বাবা কেউইতো বাচ্চা খাওয়াতে আসছে না! বোঝা গেল সে ব্যবস্থাও ওরা আগে থেকে করে রেখেছে। ওই যে বললাম, ডিম পাড়ার আগেই বাসার মধ্যে পোকা-মাকড়, উচ্চিংড়ে সব জমা করে রাখা হয়েছিল। এখন শুধু নাচা-গাওয়া আর খাটনির ফসল তোলা। বাসা বানাতে আর আঁতুড় তৈরি করতেই যা ওদের খাটনি গেছে।

যাই হোক আারো কিছুদিন পরে দেখা গেল বাবা- মা ঠোঁটে করে খাবার নিয়ে বাসার বাইরে তাক করে বসছে। বুঝলাম এতদিনে বাসায় জমানো খাবার নিশ্চয় ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু ওদের ঠোঁট এত লম্বা যে বাসার বাইরে থেকে গর্তে মুখ বাড়িয়ে বাচ্চাকে খাওয়ালে আমরা কিছু দেখতে পারছি না।

এই ঘটনা চলতে থাকল বেশ কিছুদিন। তবে এই কাজেও দেখলাম বাবার দায়িত্বজ্ঞান বেশি। মা এক আধবার বাচ্চাকে খাওয়াল কি খাওয়াল না, অমনি নাচতে লেগে গেল। যাই হোক বাচ্চা একটু বড় হতেই তার ছোট্ট মুণ্ডুটা গর্তের মুখে দেখা গেল আর তার লম্বা ঠোঁটটা বাইরে বেরিয়ে থাকত। মা বাবার আওয়াজ পেলেই সে হাঁ করে খাবার খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে থাকত।

এর মধ্যে একদিন লক্ষ্য করলাম খাওয়ার সময় বাচ্চাটা যেন একটু বেশি বেশি করে দেহটা বাইরে ঠেলে বার করে এদিক ওদিক দেখবার চেষ্টা করছে। বুঝলাম এবার ওর বাসা ছাড়ার সময় হয়েছে। ভাবলাম ডানায় ভালো করে শক্তি হতে তো বেশ কিছুদিন লাগবে তার মধ্যে বাসার বাইরে আমার জানলার আশেপাশে আরও অনেক ভালো ভালো ছবি তুলতে পারব। কিন্তু সে গুড়েও বালি। পরদিন মানে ১১.৬.২০১২ এর সকালে দেখলাম বাসা খালি। শুধু তাই নয়, আমাদের অতবড় বাগানের আনাচে কানাচে কোথাও তাদের দেখা পেলাম না। ওই গেঁড়ে বাচ্চাটা কী করে বাসার ভেতর থেকেই উড়তে শিখে গেল, বোঝা গেল না। এটাও

অবশ্যই ওই প্রকৃতি-মায়েরই লীলাখেলা। মৌটুসীরাও কচ্ছপদের মতোই 'জন্ম-পাকা,' ডিম ফুটেই মহাসমুদ্রে পাড়ি।

অগত্যা বাচ্চা না সেই বাসাটাকে নিয়েই গবেষণা চালালাম। সেটাকে ডাল থেকে পেড়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুব ছবি তুললাম। দেখলাম বাসা বানানোর সামগ্রী হ'ল — খবরের কাগজের কুচি, কিছু গাছের বাকল-অতি সরু করে চেরা, মানুষের চুল, সব মাকড়সার জালের আঠা দিয়ে সাঁটা। কি মজবুত! পাঁচ সপ্তাহের রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে একটুও টসকায়নি!

অবশেষে বাসাটাকে কাঁচি দিয়ে দু আধখানা করে দেখলাম থলের ভেতরে প্রচুর তুলো জমা করেছে। সেটাকে পিঁজে কচি বাচ্চার চুলের চেয়েও নরম করেছে। বাসার ওপরের টুপির মত অংশটাতেও তুলো গুঁজে রেখেছে, যাতে ওদের আদরের বাছার মাথায় খোঁচা না লাগে!

বন্ধুদের কাছে এ গল্প করাতে, ওরা সবাই তারিফ করে বলল, 'দেখেছ প্রকৃতির কি রকম নিয়ম, শিমুল গাছে ঠিক যে সময়ে তুলো থাকে তখনই এরা বাসা বাঁধে।' কিন্তু আমি খেয়াল করে দেখলাম, ওটা মোটেই শিমুল গাছ থেকে নেওয়া তুলো নয়। কারণ শিমুল ফুল ফোটে দোলের সময়, আর তার পরেই ফল ফেটে তুলো ছড়ায়। এই সময় বরং রাস্তায় ক্যাপক তুলো দেখা যায়।

এই কথা বলতে বলতে সব বিবাদ ভঞ্জন করে সম্পূর্ণ রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হল, — ঐ তেসরা মে তারিখেই

আমাদের দোতলার ঘরে একটা খবরের কাগজের রোলকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পাওয়া গেছিল। কেউ যেন একটা ধারাল ছুরি এদিক সেদিক চালিয়েছে আর একটা লম্বা পেরেক দিয়ে ইস্পার উস্পার ফুটো করেছে। আমি স্থির হয়ে ভাবলাম, এ নিশ্চয় ইঁদুরের কাজ। তার পরেই লক্ষ্য করলাম আমার হাতে কাজ করা, অতি প্রিয় দুটো তাকিয়াও নিঁখুত ভাবে চিরে তুলো বের করে নেওয়া হয়েছে। অতএব ইঁদুর না হয়ে যায় না। সাত তাড়াতাড়ি ইঁদুরের বিষ কিনে ছড়ানো হল। তোমরা নিশ্চয় ধরে ফেলেছ এই অকাজগুলো কার। পাখি বেটারা কখন ঘর খালি পেয়ে, দিব্যি বাড়ি তৈরির মাল মশলা জোগাড় করে নিয়ে গেছে। কাগজ তো নয় বাইরে থেকেই দেখতে পেয়ে গেছিল। কিন্তু বাচ্চাদের কে বলে দিয়েছিল যে তাকিয়ার খোল কাটলে ভেতরে তুলো মিলবে! প্রকৃতি-মা, তোমাকেই সেলাম।

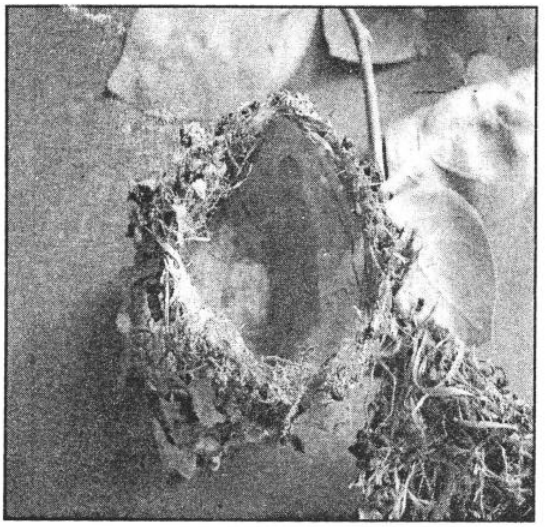

ফটো : লেখক

আমরা বিশ্বাস করি গ্রন্থনির্মাণ একশিল্প

কারিগর

৩৫বি, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড। কলকাতা ৪
ই-মেল : kritkarigar@gmail.com
যোগাযোগ : ৯০৬২২১১১১১ | ৯০৬২১২৩৪৫৬

ভূতচতুর্দশী **স্টল নং ৪৭৯**

উদয় নারায়ণ সিংহ

ভূতের গল্প লিখছেন আজকের বাংলার একজন প্রথম সারির ভাষাতাত্ত্বিক, এটা জেনেই কৌতূহল আরও প্রখর হয়। চোদ্দটি গল্পের মধ্যে রয়েছে লুকানো প্রচুর প্রবাদ, ইঙ্গিত, ইশারা ও সম্ভাবনা—তারই সঙ্গে আছে গাঁথা চোদ্দটি ছড়াও। আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেছে ঠিক এই গল্পগুলি না হলেও ওঁকে মুখে মুখে অনেক গল্প তৈরি করে শিশু-সন্তানকে শোনাতে হত কয়েক দশক আগে। ফলে শিশু-সাহিত্যের প্রতি লেখকের ঝোঁক জাগাটা স্বাভাবিক, আশাকরি কারিগরের এই নিরীক্ষা পাঠকদের ভালো লাগবে। ১৪০.০০

দশটি কিশোর গল্প *অনীশ দেব*

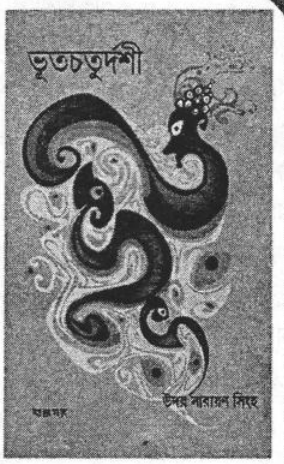

'দশটি কিশোর গল্প' লেখকের বাছাই করা গল্পের সংকলন। যে-গল্পে রয়েছে মূল্যবোধের কথা, আগামীদিনের কথা, বিজ্ঞানের কথা, আর মানুষকে ভালোবাসার কথাও। বহুমাত্রিক এই সংকলন লেখকের কথায় অনন্য। ১৫০.০০

রাই আমাদের *ঈশা দাশগুপ্ত*

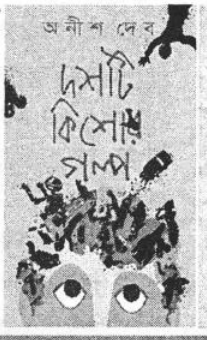

আমাদের রাই তোমাদের রাই ছোট রাই বড় রাই মোটা রাই রোগা রাই হাসি হাসি রাই রাগী রাগী রাই খুব ভাল রাই কম ভাল রাই—সব্বার থেকে এটু এটু ধার নিয়েই এই বই। তাদের ভাল লাগলেই, ব্যস। আমার সব ধার শোধ। ৭৫.০০

স্বাতী চট্টোপাধ্যায়

'আমার একটা ম্যাঙ্গো-ট্রি চাই, আমার সব বন্ধুর বাড়িতে আছে,' স্কুল থেকে ফিরে নতুন বায়নাক্কা পিকলুর।

এমনিতে সে বায়নাক্কা চ্যাম্পিয়ন। প্রতিদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে ভাঁজতে ভাঁজতে আসে, বাড়িতে পৌঁছেই ঠিক কোন বায়নাটা জুড়বে! আর এ-ব্যাপারে তার এমনই দক্ষতা যে বড়রা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই হার মানতে বাধ্য হন।

শহুরে বাড়ির এক চিলতে বাগানে ম্যাঙ্গো ট্রি-র মতো বড়ো গাছ সম্ভব নয়, অথবা তার বেশিরভাগ বন্ধু ফ্ল্যাটে থাকে বলে তাদের ম্যাঙ্গো ট্রি থাকতেই পারে না— এসব যুক্তি বলাবাহুল্য পিকলুকে দমাতে পারে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায়, সে তার দাদুর হাত ধরে ম্যাঙ্গো ট্রি-র সন্ধানে চলেছে।

লোকটা বসেছিল বাজারের একেবারে শেষপ্রান্তে— এদিকটায় বিশেষ কেউ বসে না। একমাথা লালচে ঝাঁকড়া চুল, কুচকুচে কালো, রোগা, লম্বা চেহারায় চোখদুটো ভাঁটার মতো! দেখেই পিলে চমকে গেছে পিকলুর! থেমে পড়েছিল সে, কিন্তু দাদু এগিয়ে গিয়েছেন তার দিকে। বাধ্য হয়ে সে-ও অনুসরণ করল। আসলে লোকটার সামনে সাজানো চারাগাছগুলোর মধ্যে ফুটখানেক লম্বা, বেশ স্বাস্থ্যবান একটা আমগাছের চারাও রয়েছে।

আমগাছের চারাটা সত্যিই আশ্চর্য রকমের তাজা! ছোটো টবে বসানো চারাটার ঘন নীলচে সবুজ পাতায় রোদ্দুর ঠিকরে পড়ছে, ওপরের কচি পাতায় লালের আভাস। দাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'কতদিনে ফল আসবে তোমার গাছে?'

'এক বছরের মধ্যে বাবু। আমার নিজে হাতে কলম করা।' লোকটার গলায় যেন মেঘ ডাকছে!

দাদু বুঝলেন লোকটচা বড্ডই বাড়িয়ে বলছে। কিন্তু পিকলু আর এক মুহূর্ত দাঁড়াতে চায় না তার সামনে। দাদুর শার্টের কোণ ধরে টানছে জোরে জোরে, 'ম্যাঙ্গো ট্রি-টা নিয়ে বাড়ি চলো না তাড়াতাড়ি।'

বাড়ির পিছনের ছোট্ট বাগানে মাঝামাঝি বসানো হল ম্যাঙ্গো ট্রি। পিকলু নিজেই তার তদারকির ভার নিয়েছে। রোজ জল দিচ্ছে আর নিরীক্ষণ করছে কতটা বড়ো হল।

সপ্তাহখানেক বাদে ছুটতে ছুটতে গেছে মায়ের কাছে, 'মা মা, ম্যাঙ্গো ট্রি-টা আমার সমান বড়ো হয়ে গেছে! দেখবে চলো।'

'দুর বোকা! এত তাড়াতাড়ি কখনও বাড়ে?' মা হাসছেন।

'তুমি চলোই না দেখবে...' -পিকলু মা-র হাত ধরে টানতে টানতে একেবারে ম্যাঙ্গো ট্রি-র সামনে হাজির করেছে।

এবার মায়ের অবাক হওয়ার পালা! গাছটা সত্যিই প্রায় পিকলুর মাথা ছুঁইছুঁই! পিকলু তো নেহাত বেঁটে ছেলে নয়, সাতের শুরুতেই সে চারফুট ছাড়িয়েছে। একটা গাছ মাত্র একসপ্তাহে এতখানি বাড়তে পারে! নির্ঘাৎ গাছওয়ালা

লোকটা খুব শক্তিশালী কোনও গ্রোথ হরমোন ব্যবহার করেছে। হয়তো প্রাণীদেরই কোনও হরমোন, কে বলতে পারে? আজকাল তো কত রকমই হচ্ছে।

দাদু, বাবা দুজনেই মায়ের থিয়োরির সঙ্গে একমত। লোকটা খদ্দেরের মাথা ঘোরাতে নিশ্চয়ই ও-রকম কোনও কারসাজি করেছে।

বাবা তো একধাপ এগিয়ে বললেন, 'কদিন বাদেই দেখবে বাড় বন্ধ হয়ে শুকোতে শুরু করেছে। ওভাবে আর্টিফিসিয়ালি বড়ো করে দিলে গাছ বাঁচে?'

পিকলু অবশ্য বাবার কথায় মনখারাপ করার অবকাশ পেল না, কারণ কথাটাকে মিথ্যে প্রমাণ করতেই যেন তার ম্যাঙ্গো ট্রি, আরও জোরে জোরে বাড়তে লাগল, বাড়তেই লাগল!

মাসখানেকের মধ্যে একতলার ছাদ ছুঁল! দেড়মাসে দোতলার বারান্দা! তিন মাসের মাথায় দোতলার ছাদ ছাড়িয়ে গাছ আকাশ পানে ধেয়ে চলেছে।

গাছের গোড়াটাও হয়েছে তাগড়াই। পিকলু দু-হাত ছড়িয়েও বেড় পায় না।

ম্যাঙ্গো ট্রি-র এহেন বাড়াবাড়িতে তার তো খুব মজা, কিন্তু বড়োদের কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ। গাছের শেকড় বাড়ির ভিত ছুঁল বলে! বাবা রেগে চিৎকার করছেন, 'এক্ষুনি ওগাছ কেটে ফেল।'

অগত্যা দাদু গাছকাটার লোকেদের সঙ্গে কথা বললেন। পিকলুর মন খারাপ, নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করেছে। তার গাছটা একটুখানি বেশি বেড়ে কী এমন অপরাধ করেছে যে তাকে কেটে মেরে ফেলা হবে! পিকলু নিজে লম্বা হলে তো এদিকে খুশি হওয়া হয়। বেশি বাড়লে কি তারও পা-দুটো ছেঁটে দেবে, না কি মাথাটাই?

অনেক করে বোঝানো হল তাকে। বাড়ি বাঁচাতে গেলে গাছ কাটতেই হবে। পিকলুর তবু মন ভার। সে কিছুতেই ভেবে পায় না, বড়োরা এত বাড়ি বাড়ি করে মাথা ঘামায় কেন!

পরদিন পিকলু স্কুলে যেতেই গাছকাটার লোকেরা হাজির তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে। গোড়া কাটার আগে কিছু ডালপালা ছাঁটা দরকার। সেইমতো একজন দোতলার বারান্দায় ঝুঁকে পড়া ডালটায় চড়ে বসে পাশের ডালে মেরেছে কোপ। যেই না মারা, কাটারি ছিটকে উঠে একেবারে নীচে। ভাগ্যিস কারও মাথায় পড়েনি। লোকটার মনে হল ঠিক যেন শক্ত রবারের গায়ে কোপ মেরেছে। কয়েকবার আরও চেষ্টা করল, একই ফল। তার সমস্ত শরীর ঝন্‌ঝন্ করছে কিন্তু গাছের গায়ে আঁচড়টি লাগছে না।

অগত্যা বিশাল করাত, দু-জনে দুদিকে ধরে চালানো শুরু করল কাণ্ডের গায়ে। ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় ছালটুকু কাটল শুধু। গলদঘর্ম লোকগুলো যাওয়ার সময় বলে গেল, 'ও-গাছ ভুতুড়ে, ওকে কাটা মানুষের কম্মো নয়।'

পিকলুর খুব আনন্দ। বড়োদের মাথায় হাত! গাছের দাপটে কি শেষে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে?

ম্যাঙ্গো ট্রি বেড়ে চলেছে আপন খেয়ালে। আজকাল

আর দোতলায় উঠেও তার মাথা দেখা যায় না। ঝাঁপিয়েছেও সেই রকম। চারিদিকে ডালপালা ছড়িয়ে সে যেন তার নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে।

ঠিক এক বছরের মাথাতেই গাছে বোল দেখা দিল। তার দিন পনেরোর মধ্যে সবুজ ছোটো ছোটো আম দুলতে লাগল সারা গাছ জুড়ে। কিন্তু বড়োরা কেউ খুশি নন। দোতলার বারান্দা থেকে কচি আম পাড়ার বহু চেষ্টা হয়েছে, ছুরি, কাঁচি, কাটারি সব ফেল! কী লাভ অমন ফল হয়ে!

এদিকে সেদিন গাছ দেওয়ার পর থেকেই সেই গাছওয়ালা লোকটা যে কোথায় উধাও হল! দাদু বাজারে বহু খুঁজেও তার সন্ধান করতে পারেননি। অন্যান্য গাছওয়ালারা বলেছে, অমন কাউকে তারা দেখেইনি কখনও।

গাছ সমস্যা সমাধানে নানা পরামর্শ আসছে চতুর্দিক থেকে—গোড়ায় বিষ প্রয়োগ থেকে শুরু করে বোটানিস্টদের সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত। তবে একটা কথা সবাই বলছে এক বাক্যে, 'পরে যাই হোক আর না হোক, গিনেস বুকে নামটা এই সুযোগে তুলে ফেলা উচিত।'

এই যখন অবস্থা, একদিন সকালে পিকলুকে স্কুলবাসে তুলে দেবার জন্য দাদু যেই বাগানের গেট খুলেছেন—সামনেই সেই গাছওয়ালা লোকটা। কাঁধে একটা ঝোলা, মেঘ ডাকা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমায় খুঁজছিলেন?'

'আরে, কী গাছ দিলে তুমি, বেড়েই চলেছে-বেড়েই চলেছে! না যায় কাটা, না যায় ফল পাড়া।'

'ওগাছ চান না আপনি?'

দাদুর কথা শেষ করতে দেয় না লোকটা, দাদুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি বাড়ির পিছনদিকে গিয়ে আমগাছটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল নিষ্পলক। ঘোলাটে দুটো চোখের দৃষ্টি কেমন কোমল হয়ে এল। ধীরে ধীরে বসে পড়ল উবু হয়ে। কাঁধের ঝোলা থেকে একটা পুরনো আমলের মোটা কাচের সবুজ শিশি বের করল। কর্কের ছিপিটা খুলে ঠিক দু-ফোঁটা তরল ঢেলে দিল গাছটার গোড়ায়, তারপর গাছের কাণ্ডে। পরম মমতায় একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আমি ঠিক ছ'মাস পরে আসব।'

'গোড়ায় ওটা কী দিলে? ওতে কি গাছটা মরে যাবে? ছ'মাস পর কী হবে?'

দাদুর প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে, একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে লোকটা চলে গেল খোলা গেট দিয়ে।

দাদুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গোটা ঘটনাটা দেখল পিকলু। কী জানি কেন লোকটার জন্য ওর হঠাৎ ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল।

এর পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। পরদিন থেকেই এক আশ্চর্য কাণ্ড শুরু হল—এক অদ্ভুত উলটো পুরাণ। দেখা গেল আমগুলোর সাইজ হঠাৎই যেন অনেক ছোট হয়ে গেছে। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আবার মুকুলের একই দশা। কিছুদিন বাদে তা-ও উধাও!

গাছের আকৃতিও ছোটো হতে লাগল দ্রুত। মাস খানেকের মধ্যে দোতলার ছাদ থেকে গাছের মাথা দেখা গেল। দু-মাসের মাথায় দোতলার বারান্দায়! তিন মাসে এক তলার সমান। ছ-মাসের মধ্যে ছোটো হতে হতে গাছটি আবার আগের চেহারায় —যে অবস্থায় তাকে কিনে আনা হয়েছিল।

পিকলুও আজকাল তার সাধের ম্যাঙ্গো ট্রি-র থেকে দূরে দূরে থাকে।

ঠিক যেদিন ছ-মাস পূর্ণ হল, লোকটা এল আবার। গাছটার কাছে বসে ঝোলা থেকে একটা ছোট টব বের করল। তারপর হাতে করেই গোড়ার মাটি সামান্য আলগা করে হাত দুটো মাটিতে ঢুকিয়ে সন্তর্পণে তুলে আনল শেকড় সমেত গাছটাকে। এত সহজে উঠে এল যেন আলগা বসানো ছিল। এবার সেটা যত্ন করে টবে বসিয়ে টবসমেত গাছটা ঝোলায় ভরতে ভরতে নিজের মনেই বিড়বিড় করল, 'এই নিয়ে পাঁচবার হল, আর কাউকে দেব না।'

'পাঁচ বার হল মানে?' দাদু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'আপনার আগে চারজনকে দিয়েছিলাম। কেউ রাখতে পারেনি।'

'কী বলছ? এই একই গাছ!' দাদুর বিস্ময়ের শেষ নেই।

'বিশ্বাস করা না-করা আপনার মর্জি,' লোকটা নিরাসক্ত গলায় বলল। পরের কথাটা সামান্য বিদ্রুপ মিশল ওর স্বরে—'সব বিদ্যে কি আর আপনাদের কিতাবে থাকে?'

'কিন্তু এমন গাছে কী লাভ, যার ফল পাওয়া যায় না?' দাদু মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করলেন।

ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল। পুরো পাকলে ও আপনিই খসে পড়ত। কিন্তু আগেই সবাই ভয় পেয়ে যায়। নিজের এক টুকরো মাটি থাকলে কি আর কাউকে দিই এই জিনিস! থাক, ছোটো হয়ে ও আমার কাছেই থাক।'

লোকটা চলে গেল। আর কেউ কখনও ওকে দেখেনি।

ছবি : নীতিশ মুখোপাধ্যায়

তালেগোলে

সংঘমিত্রা কর

তালগাছে ছিল এক নামজাদা ভূত
তাল-তাল সোনা তার ঘরেতে মজুত।
ঘরের চাতালে ছিল ঘড়া-ঘড়া পোঁতা
পাতালের কুবেরের ধন লাগে কোথা!
একদা বেতাল এক এল চুপিসাড়ে,
ফাঁকতালে সরে পড়ে ঘড়া করে ঘাড়ে।
ক্রোধেতে দাঁতাল ভূত কিড়মিড় করে,
তিনদিন হরতাল ডাকল শহরে।
ভূতের রাগের তাল সামলানো দায়,
ভয়ে সবে তার সাথে তাল দিয়ে যায়।
দেখেনিকো তালেগোলে ভূত তালকানা
চোরে নিয়ে গেছে ছড়া—ফেলে সোনাদানা!

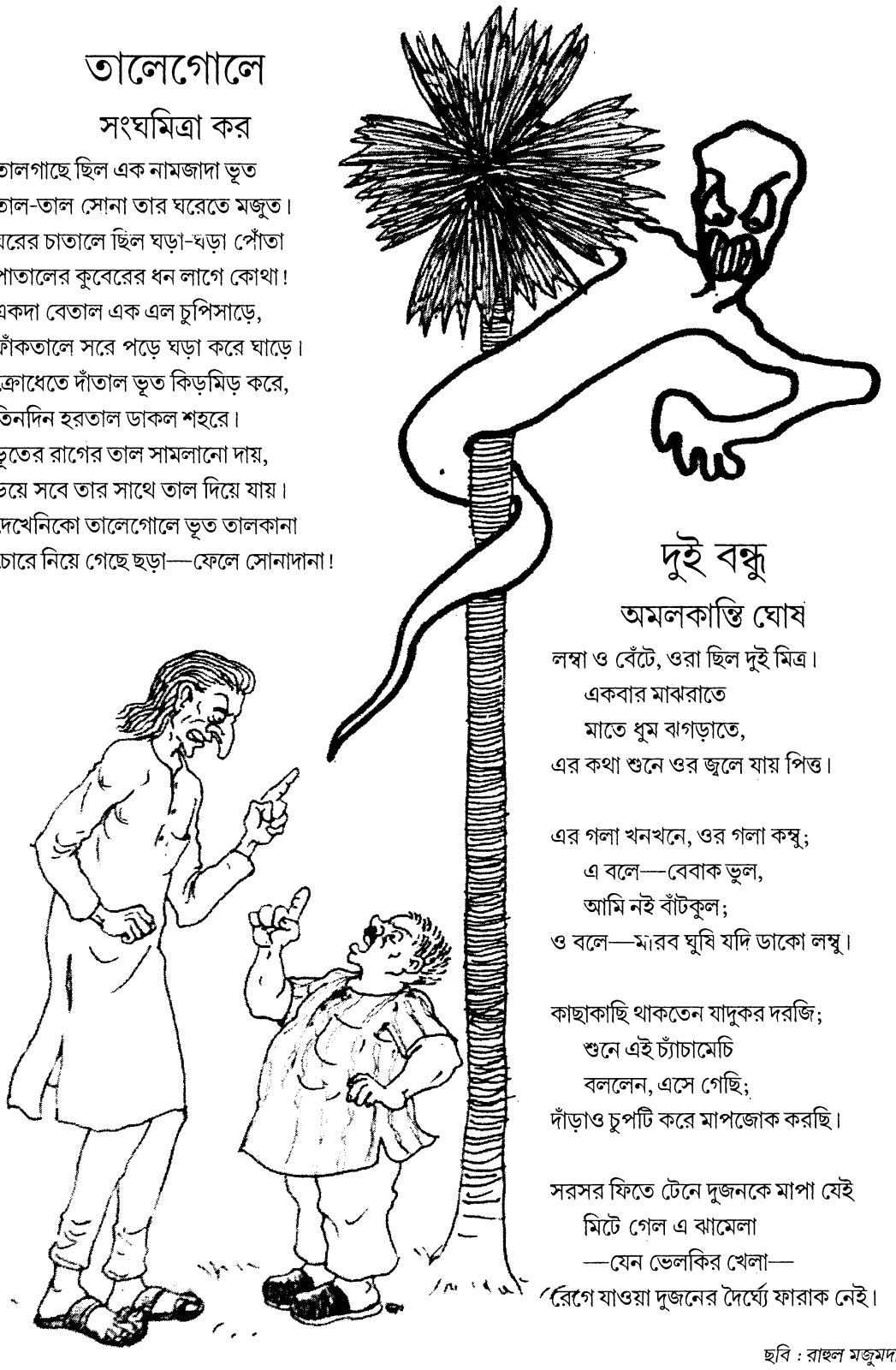

দুই বন্ধু

অমলকান্তি ঘোষ

লম্বা ও বেঁটে, ওরা ছিল দুই মিত্র।
একবার মাঝরাতে
মাতে ধুম ঝগড়াতে,
এর কথা শুনে ওর জ্বলে যায় পিত্ত।

এর গলা খনখনে, ওর গলা কম্বু;
এ বলে—বেবাক ভুল,
আমি নই বাঁটকুল;
ও বলে—মারব ঘুষি যদি ডাকো লম্বু।

কাছাকাছি থাকতেন যাদুকর দরজি;
শুনে এই চ্যাঁচামেচি
বললেন, এসে গেছি;
দাঁড়াও চুপটি করে মাপজোক করছি।

সরসর ফিতে টেনে দুজনকে মাপা যেই
মিটে গেল এ ঝামেলা
—যেন ভেলকির খেলা—
রেগে যাওয়া দুজনের দৈর্ঘ্যে ফারাক নেই।

ছবি : রাহুল মজুমদার

ধারাবাহিক উপন্যাস

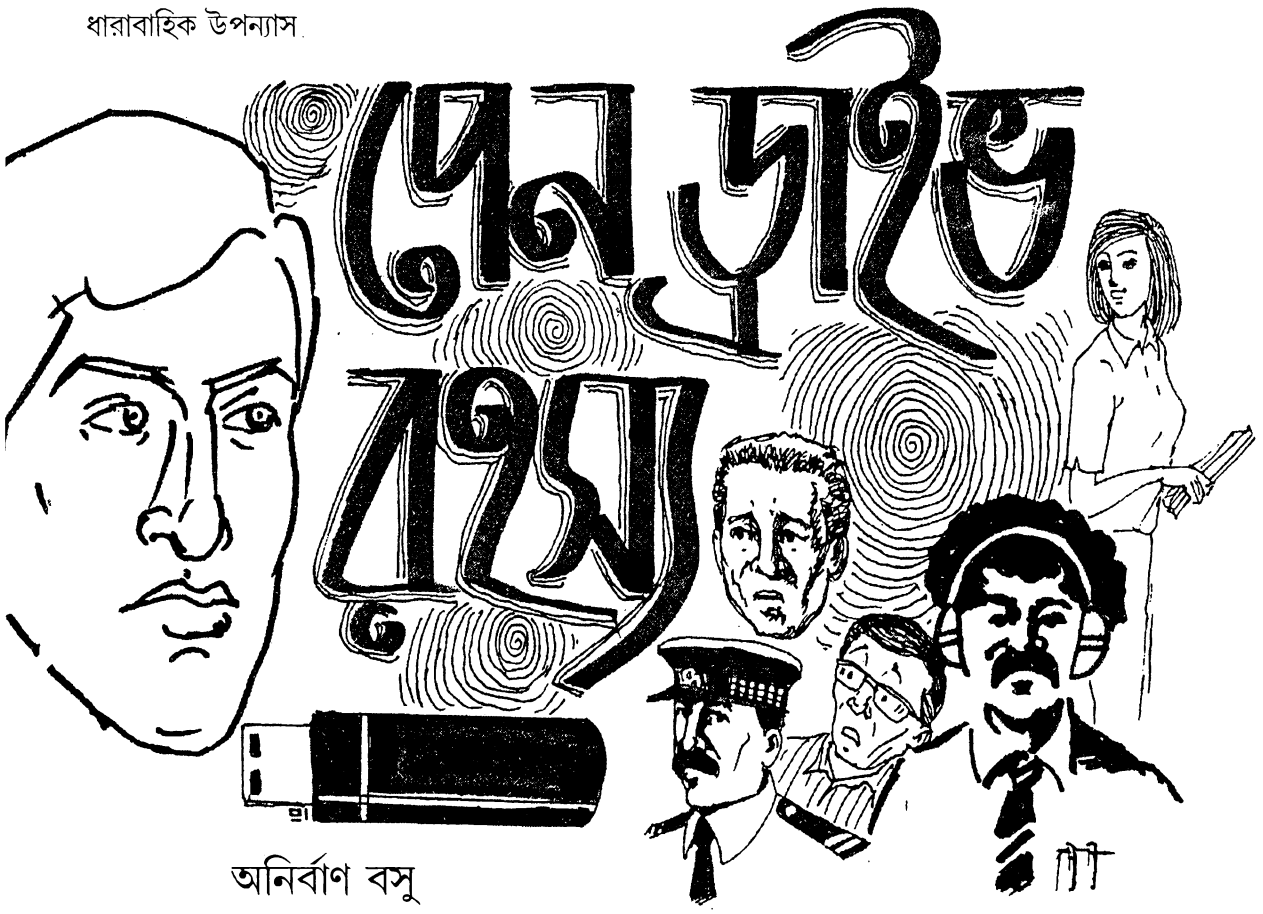

অনির্বাণ বসু

দ্বিতীয় কিস্তি

আকিদা ফোন করলেন সুদর্শন মল্লিককে। কম্পুটার সফ্‌ট্‌ওয়্যার তৈরির ব্যবসা করেন তিনি। বর্তমানে বাংলা 'ডিজিটাল পেন'-এর সফ্‌ট্‌ওয়্যার তৈরি করেন তিনি। সেই সফ্‌ট্‌ওয়্যার চুরির চেষ্টা হতে তিনি আকিদার শরণাপন্ন হয়েছেন।

সুদর্শনবাবুকে আসতে বলে আকিদা ফোন করলেন সুদর্শন মল্লিকের শিক্ষক কার্তিকচন্দ্র শীলকে। তিনি বললেন যে সুদর্শনবাবু সম্প্রতি অনেক বাংলা বই নিয়ে পড়েছেন সম্ভবতঃ ওই সফ্‌ট্‌ওয়্যার তৈরির জন্য।

আকিদার বাড়ি এসে সুদর্শনবাবু বললেন, যে বার বার তাঁর সফ্‌ট্‌ওয়্যার চুরির চেষ্টা হয়েছে। তাঁর দপ্তরে কাজ করেন পাঁচ জন প্রোগ্রামার—সায়ন সরকার ও সারণি সরকার; আর একজন সিকিউরিটি বাদল মণ্ডল। ষোলই মার্চ প্রথম ওঁর অফিসের কম্পুটার থেকে এই চুরির প্রচেষ্টা ঘটে। ওই পাঁচজনের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই এই কাজ করে।

এরপর সুদর্শনবাবু নিজের কম্পুটারের সব ফোল্ডারকে পাসওয়ার্ড দিয়ে সুরক্ষিত করেন। সব ফাইলের ব্যাক-আপ নিয়ে রাখেন পেন ড্রাইভে। এর পরে একদিন সুদর্শনবাবু দশ মিনিটের জন্য চা খেতে বেরিয়েছেন, ফিরে এসে দেখেন কেউ টেবিলের দেরাজ থেকে পেনড্রাইভ বের করে শেষে সময়ের অভাবে টেবিলের ওপর ফেলে চলে গেছে।

সুদর্শন মল্লিকের কথা শুনে মন্তব্য করলেন আকিদা, 'গুড।'

'ড্রয়ার লক্ করেননি?' আমি না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

'সব সময় সম্ভব না,' আকিদাই ওঁর হয়ে জবাব দিল। 'তাহলে সারাটা দিন ওই করতেই কেটে যাবে।'

'যথার্থ,' শুকনো গলায় বললেন সুদর্শন মল্লিক।

'গতবারের মতন আর কিছু আপনার নজরে আসে?'

'না স্যার, গতবারের মতন হালকা পারফিউমের গন্ধ কিছু পাইনি, বা অন্য কিছু পাইনি, বা অন্য কিছুই নজরে আসেনি।'

'বোর্ডে কোনও লেখা?'

'না স্যার।'

'ভেরি গুড!'

এরপরে উনি বললেন— সাড়ে আটটা পৌনে ন-টা নাগাদ সবাই যে যার বেরিয়ে যায়, কিন্তু কাউকে উনি কিছু আর বলেননি। শুধু এইবার থেকে উনি পেন ড্রাইভ নিজের সঙ্গে রাখছেন। ওঁর এই টিমের মধ্যে যে একটি সাক্ষাৎ শয়তান আছে সেটা ভাবতেও ওঁর খারাপ লাগছে, কিন্তু সেটাকে খুঁজে বার করতে হবে। সেটা ওঁর দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না, সুতরাং আকিদা যদি—।'

'একটি না হয়ে, একটির বেশিও হতে পারে।' বলল আকিদা, 'তবে, ফ্যাক্ট — ডেসপারেট হয়ে গেছে। এবং আপনার কাজের ওপর নজর রাখছে। আপনার সব কাজ কি শেষের মুখে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সবাই কি জানত কে কী কাজ করে?'

আকিদার এই প্রশ্নে সুদর্শন বাবু বললেন— যে একমাত্র বাংলা ভাষার কাজ বাদে সবাই জানত কে কি কাজ করে।

'আপনার পেন ড্রাইভের ফাইলগুলো একবার দেখা যায়?' একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল আকিদা। সুদর্শন বাবু তৎক্ষণাৎ রাজি হওয়াতে, মিনিট খানেকের মধ্যেই আকিদার মেশিনের মারফৎ আমরা দেখতে পেলাম ওঁর পেন ড্রাইভে আছে প্রথমে নৌ-সেনার কাজের ফাইল, তারপর বাংলা ভাষার কাজের ফাইল, আর সব শেষে ডিজিটাল সইয়ের কাজের ফাইল। সুদর্শনবাবু বললেন— ঠিক একইভাবে ফাইলগুলো রাখা আছে ওঁর মেশিনে এবং মার্চ মাসের ঘটনার পর উনি মেশিনে এবং পেন ড্রাইভে দু-জায়গাতেই পাশ ওয়ার্ড লাগিয়েছেন।

'সার্চ ইঞ্জিন কি বাংলার কাজের প্রথম ফাইলটাতে দাঁড়িয়ে ছিল?' জিজ্ঞেস করল আকিদা।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে।' বলল আকিদা, 'দেখি আপনার অফিসে যদি একবার ঢুঁ মারতে পারি।'

'আজ?' ভারি খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করল সুদর্শন মল্লিক।

আকিদা ওঁর অফিসের ঠিকানা নিয়ে আর নিজের মোবাইল নম্বর দিয়ে বলল, 'বাদলের সঙ্গে কথা বলে আমাকে একটা এস এম এস করে দেবেন। আর একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে যান দয়া করে।'

'কার? কীসের?'

'ট্রাস্ট আস।' একবার আকিদার দিকে এক বিস্ময়মেশানো জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে ওর কাছ থেকে কোনও রিঅ্যাকশান না পেয়ে তাড়াতাড়ি নম্বরটা দিয়ে কাতরভাবে বলে উঠলেন, 'সুদর্শনবাবু, বড়ই পীড়াদায়ক কর্মক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে এই অবিশ্বাস—'

'অবিশ্বাস?'

'ট্রাস্ট মি।'

সুদর্শনবাবু যাওয়ার পর আকিদা অনেকক্ষণ ধরে জানলাটার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। হাতদুটো জানলার ওপর রাখা, পাশে নিমাগাছের হাওয়ায় ওর চুল একটু উড়ছে। আমি ভাবলাম হয়তো কিছু বলবে, কিন্তু প্রায় মিনিটখানেক কাটার পর যখন কিছুই বলল না, আমি খবরের কাগজটা তুলে নিলাম। কিন্তু এ অবস্থায় মন বসে নাকি? ঘড়িটা দেখলাম একবার। সাড়ে আটটা জাস্ট বাজছে। আকিদা যদি বেরোবার প্ল্যান—

'গোলমাল একটা লাগছে।' আকিদার গলা। বাইরের দিকে তাকিয়েই বলছে।

'কীসের?'

'সেটাই তো ধরতে পারছি না। কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল লাগছে।'

এরপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকিদা ল্যান্ডলাইন থেকে 'ট্রাস্ট আস'-এর অফিসে ফোন করে নিজের গলাটাকে একটু খনা করে, নিজেকে 'গুড শপিং স্টোর্স' বাগুইহাটির বড়বাবু বলে পরিচয় দিয়ে বাদল মণ্ডল অথবা রাখাল মাজীকে

সিকিউরিটির ডিউটিতে পাওয়া যাবে কি না জানতে চাইলে তাদের ইনফরমেশন অনুযায়ী সুদর্শনবাবুর বয়ানে মিলে গেল— রাখাল এখন টালিগঞ্জের একটি সঙ্গীত আকাদেমিতে কাজ করছে, অতএব তাকেও পাওয়া যাবে না।

'তবে স্যার, আপনি রবীন পালকে নিন না? ছেলেটির ভালো ট্র্যাক রেকর্ড —'

আকিদা আশ্বাস দিয়ে বলল—সে তার মালিকের সঙ্গে কথা বলে আধ ঘণ্টার মধ্যে গেট ইন্ টাচ করছে। এরপর সেই কাগজটা যাতে সুদর্শনবাবুর বাকি কলিগদের কাজের বিবরণ ছিল সেটা আমাকে দেখিয়ে কিছুক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে সেটার ওপর কীসের দাগ দিয়ে আবার আমাকে দিল। দেখি যেটা দাঁড়াল সেটা হল :

(১) অ্যাকাউন্টিং প্যাকেজের কাজ — কীর্তি বসন কেবলম মূর্তি এবং সায়ন সরকার।

(২) ডিজিট্যাল সইয়ের কাজ— প্রমোদ বড়ুয়া, ইশিকা পাণিগ্রাহি এবং সুদর্শন মল্লিক।

(৩) বাংলা ভাষার এবং নৌসেনার কাজ—সুদর্শন মল্লিক।

(৪) বাকি বাণিজ্যিক কাজ—সারণি সরকার এবং ইশিকা পাণিগ্রাহি।

আকিদা বলল, 'এরা করতেই পারে, স্বামী-স্ত্রীতে ভালো টিম হয় না?' তারপর একটা গ্যাপ দিয়ে বলল, 'তুই বরং তৈরি হ। আমি সেই ফাঁকে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করি।'

'কী? মানে কোথায়?'

'কোথায় আবার, ইন্টারনেট ছাড়া উপায় আছে! ডেটা দরকার আবার—আবার সফট্ওয়্যার-জড়িত কেসে প্রথম রাউন্ডে মেশিন থেকে ডেটা না নিলেও দ্বিতীয় রাউন্ডে তো নিতেই হবে। না হলে যে মেশিনের মান থাকে না।'

'এখনকার ওড়িয়া এবং অসমীয়া হরফ বাংলা হরফ থেকে ডেভেলাপ করেছে।' আকিদার কথা শুনে সদ্য চান করা তরতাজা ভাবটা যেন আরও শতগুণ বেড়ে গেল, 'ফোর্টিনথ্ সেঞ্চুরিতে।'

'তার মানে তো ওই—'

'প্রমোদ বড়ুয়া এবং ইশিকা পাণিগ্রাহিও সন্দেহের তালিকায় ঢুকল, তাই তো?' আকিদার গলায় একটা অদ্ভুত সুর।

'হ্যাঁ, তাই তো। কেন না, সুদর্শনবাবুর সফট্ওয়্যার থেকে এরাও তো—'

'বাংলা হরফের যে-বই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, সেটাতে বাংলা হরফ এবং তার ইতিহাস এবং বিন্যাস আছে সেটা সফট্ওয়্যার তৈরি করতে খুবই সাহায্য করবে। কিন্তু...'এবার আকিদা সটান আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বইটার সফট কপি ইন্টারনেটে রয়েছে।' তারপর একটু দম বন্ধকরা মুহূর্তের পর বলল, 'ইংরাজিতে!'

'সে তো কেউ সেখান থেকে ডাউন লোড করে তৈরি করতে পারে,' বললাম আমি।

'হুম!' তারপর একটা গ্যাপ দিয়ে বলল, 'তামিল ভাষা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভাষার মধ্যে একটি, যা এখনও ব্যবহার হয়। অন্যটি সংস্কৃত, যেটা ভেঙে বাংলা হয়েছে।'

'তার মানে, মূর্তির কোনও ইন্টারেস্টই নেই।'

'সুদর্শনবাবুর কোম্পানির ওয়েবসাইটে গিয়েছিলাম। বেশ ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। ওয়েবসাইটের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার কোনও চান্স নেই।'

আবার শুনলাম ওর গলা—'মার্চ মাসে যে দেখেছিল আর গতকাল চুরির চেষ্টা করছিল সে বা তারা একই এবং হ্যাকিং-এ ওস্তাদ, নাহলে সে জানে পাসওয়ার্ড থাকবে, অথচ জেনেশুনেই অ্যাটেম্পট নিয়েছে। তারমানে সে জানে সেটাকে ভাঙতে পারবে। কিন্তু চুরিটার অ্যাটেম্পট নিল?'

'ওঁর সফট্ওয়্যারকে বাজারে ছাড়ার জন্য।'

'দুর্বল, খুব দুর্বল!' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ওর গলাটা পেলাম।

'কী?'

'মোটিভ।' তারপর একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কি মনে হয় যদি কেউ পেন-ড্রাইভে কপি করে নিয়ে থাকে এবং কাজ হাসিল হয়ে থাকে, তাহলে সে কি আর অফিসে সময় মতন আসবে?'

'মনে হয় না।'

আকিদা কোনও কথা না বলে সুদর্শনবাবুকে এস.এম.এস.-এ জানাতে বলল সবাই সময় মতো অফিসে এসেছে কি না। এরপর নিজের চেয়ারটাকে জানলার দিকে ঘুরিয়ে তার ওপর বসে পা দুটোকে জানলার গ্রিলের ওপর তুলে দিয়ে চেয়ারের পাশে তক্তাপোষের ওপর ডাঁই করে রাখা পুরোনো খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখলে যদিও মনে হয় সব অগোছালো, কিন্তু আসলে সব তারিখমাফিক সাজানো। প্রথমে খবরের কাগজ, তারপর ম্যাগাজিন। কোনও কিছু ইন্টারেস্টিং থাকলে সে কাগজ বা পত্রিকাটাকে রেখে দেয়, পরে সময়মতো সেটাকে কেটে একটা

লাল রঙের খাতায় আটকে রাখে। ইদানীং কাজের চাপে অনেক কাগজ-পত্রিকা থেকে আর কাটা হয়ে ওঠেনি।

সাড়ে ন-টা নাগাদ সুদর্শনবাবুর এস.এম. এস.-এ জানা গেল সবাই সময় মতো অফিসে এসেছে। সময়ের কোনও নড়চড় নেই। তাছাড়া এ-ও জানা গেল, বাদলের কাছ থেকে উনি জেনেছেন গতকাল কোনও ভিজিটর আসেনি অফিসে আর কেউ বেরোয়ওনি।

'ভেতরের কেউ করেছে, তাই না?'

'কেউ বা কারা,' বলল আকিদা।

'আচ্ছা উনি সবাইকে ডেকে পুরো ব্যাপারটা খোলাখুলি বললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়, তাই না?'

'যদি ওঁর কাছে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকে, তাহলে তাঁর টিমে একটা পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের সৃষ্টি হবে, যেটা ওঁর কাজের জন্য একেবারে স্যুইসাইডাল। এই মুহূর্তে উনি সেটা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন না।'

'চোর বা চোরেরা কি একটা অ্যাটেম্পট নেবে?' না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

'সম্ভবত তাই। বোধহয় কালকের চুরিতে বুঝতে পেরেছে, আরও কিছু হাতে পেলে ষোলোকলা পূর্ণ হবে। ওয়েট করছে কবে ওঁর কাজ শেষ—' আকিদার কথা আচমকা আটকে যেতে আমি ভালো করে তাকালাম ওঁর দিকে। দেখি ও এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে পুরোনো খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনগুলোর দিকে। তারপর যখন আমার দিকে ফিরল তখন ওঁর চোখেমুখে একটা ভাব যেটা আমার ভীষণ চেনা।

'চল।' আকিদার গলায় একটা চাপা এক্সাইটমেন্টের সুর।

'কোথায়?'

'ডেস্টিনেশন, সবই সলিউশন, এখুনি।' আকিদার নির্দেশমতো যখন আমি ভাগীরথীর কাছে ছুটলাম চারটে স্যান্ডুইচ তৈরি করে দিতে বলতে ততক্ষণে শুনতে পেলাম ও সুদর্শনবাবুকে ফোনে বলছে— আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছব। ওঁর পুরো টিম যেন তৈরি থাকে, বাইরে যেন না যায় এর মধ্যে।

চিকেন স্যান্ডুইচ আর টক দই খেয়ে আমরা ট্যাক্সি করে ছুটে চলেছি সল্ট লেকের দিকে। ট্যাক্সির খোলা জানলা দিয়ে বাইরের হাওয়া ঢোকার দরুণ ঘামের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে। হাওয়া যে ভীষণ মারাত্মক গরম তা নয়, যদিও অনেকে গরমে ত্রাহি ত্রাহি করছে। আকিদার মতে এ ব্যাপারটা কিছুটা রিলেটিভ এবং এ কেসে এই রিলেটিভ ভিউ বা দৃষ্টিকোণই যত নষ্টের গোড়া, আবার রহস্যের চাবিকাঠি।

বাইপাসের কাছে জ্যাম থেকে উদ্ধার হবার পর আকিদার এই উক্তি। আমি কিছু বুঝতে না পেরে ওর দিকে তাকালাম।

'থিঙ্ক, ক্যাপ্টেন বোড়ে থিঙ্ক। ভাব, মন বন্ধ করে নয়, মন খুলে, প্রাণ ভরে। সফট্ওয়্যার লাইনের মূল মন্ত্র এটাই। এবং গোয়েন্দাগিরিতে তো বটেই।'

আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে ও আমায় বলল, 'তোকে দুটো জিনিস নিয়ে একটু মাথাটা খাটাতে বলছি, দুটোই সুদর্শনবাবুর কথা। ওঁর কথা অনুযায়ী একমাত্র বাংলা ভাষার কাজ বাদে সবাই জানত কে কী কাজ করে। এটা এক নম্বর। দু-নম্বর, উনি বাংলা ভাষার পর কাজ শুরু করেছেন জানুয়ারি মাস থেকে, তাহলে মার্চ মাসে, তা-ও আবার ষোলো তারিখে ওঁর মেশিনের ফাইল নিয়ে কেন কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করল?'

'সে তো করতেই পারে। ওঁর কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে, তাই বা হয়তো আগেও কেউ দেখেছে, উনি খেয়াল করেননি।'

আকিদা কোনও কথা না স্রেফ একটা ঠাণ্ডা চাউনি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ট্যাক্সিটা ইতিমধ্যে নিকো পার্ক যাবার ফ্লাইওভারটা কে বাঁ হাতে রেখে তলা দিয়ে গিয়ে ক্রসিং-এ দাঁড়িয়েছে।

'তার মানে উনি মিথ্যে কথা বলছেন?' একটু ভেবে বললাম আমি।

'থিঙ্ক বোড়ে বাবু, থিঙ্ক। আবার বলছি ভাবো। ছোট্ট কথা, কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী কথা। বলতে পার এখানেই মনুষ্যত্বের স্বকীয়তা।' জোর দিয়ে বলল সে।

চেষ্টা করলাম ওর কথামতো থিঙ্ক করার জন্য। কিন্তু মিনিট তিনেকের মধ্যেই কানে এল আকিদার গলা, 'আগে জানতে হবে কে কোথায় বসে।'

'মানে?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'রিলেটিভ টু সুদর্শনবাবুর চেম্বার—মানে সুদর্শনবাবুর অফিসঘরের পরিপ্রেক্ষিতে। আর তারপর...' আকিদা তার মধ্যমা আর বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা হালকা তুড়ি মেরে বলল, 'একটা ছোট্ট ট্রিক। স্রেফ পাখি ধরার জন্য। আর সেটা ডিপেন্ড করছে সিচ্যুয়েশনের ওপর। টোট্যালি ডায়নামিক। ভেরি সিমিলার টু দ্য আই টি ইন্ডাস্ট্রি।'

বুঝলাম আমরা এই কেসের ফাইন্যাল স্টেজে এসে পড়েছি।

অবশ্য এত তাড়াতাড়ি তাতে কী করে পৌঁছল আকিদা, সেটাও একটা রহস্য বটে। আর কে যে পাখি সেই রহস্যের থেকে এটাও কিছু কম নয়।

একটা ট্রাফিক গোলচক্করে ডানদিকে টার্ন নিতে বলল আকিদা। তারপর দ্বিতীয় বাঁদিকের রাস্তাটা পড়তেই দেখতে পেলাম একটা মেরুন রঙের মারুতি ডান দিকের তিনটে বাড়ির পরে দাঁড় করানো আছে।

'এসে গেছি।'

আকিদার কথামতো ট্যাক্সিটা একটা তিনতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। আর আমরাও নেমে পড়লাম। কর্নার প্লট, একটা এলোমেলো বাগান, একতলায় একটা মাঝারি সাইজের হাল ফ্যাশানের সাইনবোর্ড, তাতে ডিজিট্যাল অক্ষরের কায়দায় লেখা—সবই সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড। বাড়ির সামনে গোটা তিনেক মোটরসাইকেল আর বাড়ির উলটোদিকে একটা পরিত্যক্ত মাঠ, যার ভাঙাচোরা দেওয়ালের এক অংশে একটা চায়ের গুমটি।

আমরা ঢুকলাম গিয়ে বাড়িতে। আকিদার হাবভাবে কিছু প্রকাশ না পেলেও ওর মধ্যে একটা চাপা এক্সাইটমেন্টের ভাব টের পাচ্ছি।

একতলাতেই সুদর্শনবাবুর অফিস। পুরোটাই এয়ার কন্ডিশন্ড, ঢুকেই ঝপ্ করে ঠাণ্ডাতে মনপ্রাণ জুড়িয়ে গেল। ছোটো হলেও ছিমছাম, এবং আজকালকার আরও পাঁচটা ঝাঁ-চকচকে অফিসের মতোই।

কাচের দরজা খুলে ঢুকতেই ডানদিকে রাখা টেবিলের পেছন থেকে উঠে এসে আমাদের পথ আটকাল এক ভীমদর্শন সিক্যুরিটির লোক।

'কোথায় যাবেন?'

আমরা কিছু বলতে যাবার আগেই সুদর্শনবাবু দেখলাম এগিয়ে আসছেন।

'ঠিক আছে বাদল, ওঁরা আমার কাছেই আসছেন।'

'একটা এনট্রি করতে হবে, স্যার।'

কথাবার্তা সব নীচু গলাতেই হচ্ছে, কারণ ঘরে একটা 'সাইলেন্স প্লিজ' বোর্ড লটকানো আছে। বাদলবাবু যে নিজের কাজের ব্যাপারে খুব পার্টিকুলার সেটা বুঝতে পারলাম। ওঁর চেহারাটা দেখলাম ওঁর কাজের সঙ্গে বেশ মানানসই, আর চাপা গলাতেও একটা গুরুগম্ভীর ভাব আছে।

'আপনি জিম্ করেন মনে হচ্ছে?' আমাদের নাম-ধাম লিখতে লিখতে বাদলবাবুকে জিজ্ঞেস করলো আকিদা। এতে বাদলবাবু ভারী অপ্রস্তুত হয়ে একটা সলজ্জ হাসি হেসে বললেন আকিদা ঠিকই ধরেছে।

'আপনার কনুইয়ের মাস্‌ল তারই প্রমাণ দেয়। একটু দয়া করে দেখবেন কেউ যেন অফিস থেকে না বেরোয়, যতক্ষণ আমরা আছি।' আকিদার এই কথায় বাদলবাবু, 'নো প্রবলেম স্যার,' বলে ভারী খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন।

'ভেরি গুড,' বলল আকিদা। তারপর সুদর্শনবাবুকে গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার হাতের ব্যান্ডটা কোথায়?' ও বলাতে খেয়াল হ'ল যে সত্যি ওটা ওঁর হাতে নেই। তাতে সুদর্শনবাবু গলাটা আরও নামিয়ে বললেন যে সবসুদ্ধ ওটাকে ড্রয়ারে পুরে দিয়ে লক্ করে দিয়েছেন আর তার চাবি ওঁর পকেটে।

'তার মানে আপনি কোনও কাজই করেননি আজকে?' মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল আকিদা।

'আজ্ঞে না।'

ভদ্রলোক যে খুবই মুষড়ে পড়েছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে ওঁর কাচের ঘরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পুরো হলঘরটার একপ্রান্তে সেটা, একটু বাঁদিক ঘেঁষে, এবং এখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না সেটা বোঝা যাবে। সুদর্শনবাবু বললেন যে আকিদার দেওয়া সময় মতন উনি এক দু-বার উঠে দাঁড়াতে আমাদের দেখতে পেয়েই এগিয়ে এসেছিলেন। বাদলবাবুর বসার জায়গার পাশেই একটা ছোটো জায়গা যেখানে তিনটে হেলমেট রাখা আছে। তার কিছু পাশে একটা ফাইল-কাম-স্টোর রুম আর তার পাশে টয়লেট। হলের বাঁদিকে ছোট ছোট কিউবিকল, তাতে সবাই যে ঘাড় গুঁজে কাজ করছে সেটা বোঝা যায়, কারণ তাদের প্রত্যেকের মাথার কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। সুদর্শনবাবুর ঘরের পাশে আরেকটা ঘর, যেটাতে অবশ্য কাচ নেই। উনি বললেন ওটা রেস্ট রুম— শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য। হেলমেটগুলো কার জিজ্ঞেস করাতে বাদলবাবু বললেন একটা মিস্টার বড়ুয়ার আর অন্য দুটো মিস্টার এবং মিসেস সরকারের।

'ইশিকা হেঁটেই আসে।' নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন সুদর্শনবাবু, 'কাছেই থাকে।'

'আপনার সরকার দম্পতি কি আলাদা আসেন নাকি?'

সুদর্শনবাবুর ঘরে ঢুকে একটু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল আকিদা।

'আজ্ঞে না,' ভারী আশ্চর্য হয়ে গলা আরও নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন বলুন তো?'

'বাইরে তিনটে মোটরসাইকেল দেখলাম আর এখানে দেখছি তিনটে হেলমেট, সরকাররা একই সঙ্গে আসেন, তাহলে তৃতীয় বাইকটা কার?'

'ওহো।' হেসে বললেন সুদর্শনবাবু, 'ওই মোটরসাইকেলটি মূর্তির। ও নিজের হেলমেটটি নিজের কাছেই রাখে। একটু গোঁড়া, শুচিবাইগ্রস্ত।'

সুদর্শনবাবুর ঘরে একটা সানমাইকা দেওয়া টেবিল যার পেছনে ওঁর একটা চাকাওয়ালা ঘাড় হেলান দেওয়া নীল রঙের চেয়ার। টেবিলের ওপর বন্ধ করা ওঁর ল্যাপটপ, ডানদিকে একটা কলমের স্ট্যান্ড, একটা কালো রঙের ডিজিট্যাল ডেস্ক ক্যালেন্ডার যাতে আজকের তারিখ আর এখনকার সময় দেখা যাচ্ছে, অফিসের কাগজপত্র বিভিন্ন ধরণের প্লাস্টিক ফোল্ডারে রাখা, দু-তিনটে হোয়াইটবোর্ড মার্কার কলম এলোমেলোভাবে রাখা। বুঝলাম ওগুলো দিয়েই সবাই নিজের প্রশ্ন লিখে রাখে সুদর্শনবাবুর চেয়ারের পেছনে যে সাদা রঙের বোর্ডটা আছে তাতে। ওঁর টেবিলের পাশে একটা ক্যাবিনেট, যেটার তলাটা বন্ধ আর ওপরে ল্যামিনেট করা বিভিন্ন সার্টিফিকেট, দুটো ফোন ছাড়াও আছে ফ্রেম করা একটা সাদা-কালো ছোটো ছবি—অবশ্যই বিবেকানন্দের।

সুদর্শনবাবুর টেবিলের উলটো দিকে গোটা পাঁচেক চেয়ার, তারই দুটোতে আমরা বসলাম। আমার পাশে একটা পেডেস্টাল পাখা, যেটা খুব আস্তে আস্তে ঘুরছে। ওঁর ঘরটা একটু চাপা, তাই এ ঘরে পাখাটা না থাকলে দমবন্ধই লাগত।

'আপনার অফিসে আটটা কিউবিকল।' বলল আকিদা, 'অফিসে ঢোকার মুখে যে দুটো কিউবিকল, সেগুলো খালি?'

সুদর্শন বাবু বললেন যে— দুটো অফিসের দরজার কাছে থাকার জন্য সেখানে প্রায়ই ভিজিটারদের কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসে বলে অনেকেরই কাজ করতে অসুবিধে হত। প্রথম প্রথম মূর্তি এসে ওখানে বসত, কারণ ও সমানে কানে হেডফোনে গান শুনতে শুনতে কাজ করে আর ওর খুব একটা অসুবিধে হত না, তারপরে ও সে জায়গা শিফট করে এখন সুদর্শনবাবুর চেম্বারের পাশেই একটা কিউবিকল-এ বসে।

'ওর চেঞ্জ করার কারণটা কী?'

'বাস্তুশাস্ত্র,' ব্যাজার মুখে বললেন সুদর্শন মল্লিক। বেশ বুঝতে পারছি এই লোকটির সংস্কার আর গোঁড়ামি উনি মেনে নিতে পারছেন না।

'মূর্তির পাশের জায়গাটা খালি দেখলাম?' জিজ্ঞেস করল আকিদা।

এতে সুদর্শনবাবু বললেন ওঁর চেম্বারে অনেক মিটিং হয় ক্লায়েন্টদের সঙ্গে, যেখানে অনেক সময় কথা বলতে বলতে গলার আওয়াজ স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ে, তাই ওখানেও কেউ বলতে চায় না। মূর্তির কোনো অসুবিধে হয় না, কারণ সে হেডফোনে অভ্যস্ত।

'তারপরে কে বসে?'

জানা গেল যে এর পরের কিউবিকল দুটোতে বসেন সায়ন এবং সারণি সরকার, যদিও ওঁদের কাজের ক্ষেত্র আলাদা সেই মার্চ মাস থেকে। পরের দুটোতে বসেন প্রমোদ বড়ুয়া এবং ইশিকা পাণিগ্রাহি। এতে ওদের কাজ নিয়ে কথা বলতে সুবিধেই হয়, এবং সুদর্শনবাবু লক্ষ্য করেছেন ইশিকা জয়েন করার পর ওদের প্রজেক্টের কাজ বেশ তাড়াতাড়িই এগোচ্ছে।

'ওদের কাজটা তো ডিজিট্যাল সইয়ের ব্যাপার, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সেটা তো আপনার তিনটে কাজের মধ্যে একটা?'

সুদর্শনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন যে কাজের চাপের দরুণ তিনি ইদানীং সেটা নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামাতেন না, মোটামুটি ওদের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

'এই ডিজিট্যাল সইয়ের ব্যাপারটা কি শুধুমাত্র ইংরাজি ভাষাতেই সীমাবদ্ধ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর নৌসেনার কাজ?'

'সেটা তো আমি একাই করি।'

'কিন্তু তাতে কোনও প্রবলেম ছিল যেটা আপনাকে কথা বলতে হয়েছিল?'

সুদর্শনবাবু একটু ভেবে বললেন যে সেটা একবারই বলতে হয়েছিল, তাও বহুদিন আগে— ফেব্রুয়ারির গোড়ায়।

'কাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন?'

'প্রমোদ আর মূর্তি,' একটু ভেবে বললেন সুদর্শনবাবু।

'আপনার অ্যাকাউন্টিং প্যাকেজের কাজও শুধুমাত্র

ইংরিজি ভাষাতেই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আমার কিন্তু এবার কীরকম খালি খালি লাগছে। বাংলা ভাষার চুরির ব্যাপারটা তো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। সুদর্শনবাবুর অন্য কোনও কাজে তো বাংলা ভাষার প্রয়োগ হচ্ছে না। তাহলে কি—

'হ্যালো?'

সুদর্শনবাবুর ফোন বেজে উঠেছে। টেলিফোনটা কানে দিয়ে তিনি বললেন, 'একটু দাঁড়াও।' তারপর মাউথপিসের ওপর হাত রেখে আকিদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার, বাদলের ফোন। প্রমোদ কী একটা ব্যাক্তিগত কাজের জন্য বাইরে যেতে চাইছে, আর বাদল ওকে আটকাচ্ছে? বাদল জানতে চাইছে ও কি প্রমোদকে যেতে দিতে পারে, কারণ আপনি বারণ করেছিলেন।'

'সাবাশ!' আকিদার গলায় তারিফের মাত্রাটা ভরপুর। তারপর সুদর্শনবাবুকে বলল, 'প্রমোদকে আপনি দয়া করে বলুন যে আমি ওদের কাজ অডিট করতে এসেছি, সেটা না হওয়া পর্যন্ত কারুরই বাইরে যাওয়া চলবে না।'

সুদর্শনবাবু তৎক্ষণাৎ সেই মতন বলে ফোন রেখে দিলেন।

'আপনার পেন ড্রাইভটা ব্যান্ড থেকে খুলে আপনার ল্যাপটপে লাগিয়ে রাখবেন প্লীজ?' বলল আকিদা।

সুদর্শনবাবু আকিদার নির্দেশ মতন কাজ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজাতে একটা মৃদু টোকা মেরে শার্ট-প্যান্ট পরা এক মহিলা ঢুকলেন। সুদর্শনবাবু তাঁকে একটা মার্কার কলম এগিয়ে দেওয়াতে তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে বোর্ড-এর

ওপর কীসব লিখতে আরম্ভ করলেন।

ভদ্রমহিলা কলম ফেরৎ দিয়ে চলে যাবার পর, সুদর্শনবাবু বললেন, 'এই হল সারণি।'

আকিদা উঠে দাঁড়াল। তারপর হলটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সবাই মন দিয়ে ঘাড় গুঁজে কাজ করছে, শুধু একজন ছাড়া। আমাকে দেখেই সে চট্ করে আবার মাথা নীচু করে নিল।'

'কে?' আমরা দু-জনেই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

'প্রমোদ বড়ুয়া।'

'আপনার কাজ এবং মেশিন একটু অডিট করলে আপনার অসুবিধে হবে না আশা করি?' আকিদা প্রমোদ বড়ুয়াকে খুব মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল।

আকিদা আর আমি আধ মিনিট হল সুদর্শনবাবুর চেম্বার থেকে বেরিয়ে, সিডি প্লেয়ারে লাগানো হেডফোনযুক্ত কর্মরত মূর্তির সামনে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে, আকিদার ফিসফিস করে ইংরিজিতে প্রশ্নের 'কাজ কর্ম কী রকম চলছে,' এর জবাবে ওঁর দু-দিকে মাথা নেড়ে 'ওকে ওকে,' দেখে আর শুনে, সরকার দম্পতির দিকে একবার তাকিয়ে, ইশিকা পাণিগ্রাহির একদৃষ্টে কম্পিউটার স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে থাকাতে আকিদার এক মৃদু সহানুভূতি মিশ্রিত মন্তব্য শুনে, প্রমোদ বড়ুয়ার কিউবিকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আকিদার কথা মতন সুদর্শনবাবুই প্রমোদ বড়ুয়াকে ফোন করে জানিয়ে দেন আমাদের আগমনের কথা, আর নিজে নিজের চেম্বারে বসে থাকেন।

রোগা পাতলা, চশমাপরা প্রমোদ বড়ুয়া একটু চমকেই আমাদের দিকে তাকালেও, ওঁর চোখমুখ বলেই দিল যে উনি চাইছিলেন না আমরা আসি।

'এক সেকেন্ড।' আকিদা ওঁর পাশে বসে বলল, 'আমি একটা এস. এম. এস. করে নিই, কেমন?'

তারপর এস. এম. এস. করে দিয়ে, ইশারায় আমাকে বসতে বলে, আকিদা প্রমোদবাবুকে একের পর এক প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল ওঁর কাজের সম্বন্ধে। মোটামুটি আমি যা বুঝতে পারলাম তা হল— ডিজিট্যাল সই নিয়ে কাজ প্রমোদবাবু বহুদিন ধরে করছেন এবং বেশ ভালোভাবে অগ্রসর হয়েছেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর সেরকম আলাপ নেই যদিও জানেন যে বাংলা-অসমীয়ার হরফ মোটামুটি এক এবং এ ব্যাপারে কোনও সফট্ওয়্যার সম্বন্ধে তিনি জানেন না, কারণ তাঁর এসব ব্যাপারে ইন্টারেস্টই নেই। একবার তাঁর সঙ্গে সুদর্শনবাবুর নৌসেনার কাজ নিয়ে কথাও হয়েছিল বহুদিন আগে। এবং তিনি তখন বলেছিলেন যে সুদর্শনবাবু চাইলে ওঁর প্রোগ্রামের একটি অংশ একটু অদল-বদল করে ব্যবহার করতে পারেন।

যদিও আকিদা ওঁর সঙ্গে কথা বলছিল, তবুও মাঝে মাঝে কেন এতবার ঘড়ি দেখছিল বুঝতে পারলাম না। এর পরে আরও মিনিট দশেক ধরে, প্রমোদ বড়ুয়ার কাজ সম্বন্ধে আরও প্রশ্ন করে একটা 'থ্যাঙ্কস' দিয়ে আকিদা উঠে পড়ল। আমিও উঠলাম, কিন্তু প্রমোদ বড়ুয়াকে ও কীসের ভিত্তিতে সন্দেহ করছে? আমি ওর দিকে তাকাতেই দেখি ও মোবাইলে কী দেখে নিয়ে, আবার মোবাইলটাকে সাইলেন্ট মোড থেকে নর্মাল মোডে রাখল। কী প্ল্যান করছে ও?

সুদর্শনবাবুর চেম্বারে ঢোকার আগে দেখলাম ও একবার নিজের হাতঘড়িটা দেখল— এই নিয়ে তিনবার। আকিদা তো এরকম করে না। ও কি করছে? কিছুর জন্য অপেক্ষা—

'একবার মূর্তিকে ডাকবেন?'

আমরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আকিদার প্রশ্ন সুদর্শনবাবুকে। আকিদা দাঁড়িয়েই ছিল, আর সেইজন্য আমিও বসিনি।

সুদর্শনবাবু সঙ্গে সঙ্গে নীল ফোনে পান্চ করার সেকেন্ড দশেকের মধ্যেই ঘরের মধ্যে ঢুকে এলেন অ্যাকাউন্টিং প্যাকেজে কর্মরত কীর্থি বসন কেবলম মূর্তি। ভদ্রলোক দেখলাম এখন আর হেডফোন পরেননি, তাই ওঁর মাথা ভর্তি কালো কোঁকড়া চুলের বাহার বুঝতে পারলাম বেশ যাত্রাদল-মার্কা। গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা, রঙ যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, হাইট মাঝারি, নাকটা বোঁচা, একটা ঝুপো গোঁফ, পরনে কালো প্যান্ট, সাদা হাফহাতা শার্ট, যার বুকপকেটে দুটো স্টীল রঙের কলম গোঁজা, পায়ে সাদা রঙের স্নীকার্স।

প্লীজ, প্লীজ।' আকিদা সরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ঘরে ঢোকাল আর তারপর আমাকে একটা মৃদু ঠেলা দিয়ে সরিয়ে, ওঁকে আমার চেয়ারে বসতে বলল।

ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হয়ে, 'নো, নো, আই অ্যাম ওকে' বললেন বটে, কিন্তু ওঁর কোনও আপত্তিই ধোপে টিকল না, আর আকিদা ওঁকে আমার চেয়ারে পাখার পাশে বসিয়ে তবে ছাড়ল।

'খুব গরম।' মধুর স্বরে ইংরিজিতে বলল আকিদা। 'তাই ভাবলাম আপনাকে পাখার পাশে বসাই, অনেকক্ষণ কথাবার্তা আছে কিনা।'

'আমার সঙ্গে?' সাদা ঝকঝকে দাঁত বার করে দেঁতো

হাসি হেসে বললেন কেবলম মূর্তি, 'হোয়াই?'

'তামিল ভাষা আর তার সফট্ওয়্যারে অ্যাপ্লিকেশন-এর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল।'

আকিদার এ মন্তব্যে কেবলম মূর্তি একটু হেসে, একবার উসখুস করে, হাত দুটো মাথার পেছনে হেলে বসলেন।

'রিল্যাক্স', সেই একই ভাবে বলল আকিদা। 'ভালো কথা, আপনি কোথাকার যেন? চেন্নাই?'

'নো নো, রামেশ্বরম।'

'ভেরি গুড!' মনে হল আকিদা ভারী খুশি হয়েছে ওঁর উত্তর শুনে। হঠাৎ স্বামী বিবেকানন্দের ছবির দিকে হাত তুলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এঁকে চেনেন তো?'

'স্ট্রেন্জ!' আশ্চর্য হয়ে বলল আকিদা। 'ইনি স্বামী বিবেকানন্দ। ওঁর শিকাগো ট্রিপ-এর অনেক স্পনসর থাকলেও রামেশ্বরমের রাজা এর সিংহভাগ দেন। তাই স্বামীজী শিকাগো থেকে ফিরে এসে আগে এখানে আসেন তারপরে অন্য কোথাও যান।'

'মে বি, কিন্তু রামেশ্বরম্ আরও অনেক কিছু দ্রষ্টব্য ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও অনেক আগে থেকে।'

'তা তো আছেই— ছিল, থাকবেও।' আরও মধুর স্বরে বলল আকিদা, 'ধর্মীয় পীঠস্থান, মাছের চাষ এবং একপোর্ট, এমনকি গভীর জলের মাছের কিছু গতিবিধি যা আমাদের দেশে টেরোরিজমকে আরও ওস্কাচ্ছে, কিন্তু আপনিই বা এসব কী করে জানবেন, তাই নয় কি?'

আমি প্রমাদ গুণলাম। আকিদার এ স্বর আমার বিলক্ষণ চেনা। বড্ড মধুর।

আড়চোখে একবার তাকালাম সুদর্শনবাবুর দিকে। দেখলাম উনি টানটান হয়ে বসে আছেন। কিন্তু আকিদা মূর্তির সঙ্গে বাংলা ভাষার কী লিঙ্ক দেখতে পেল?

'হোয়াই টেল মি অল দিস?' বেশ রাগতস্বরেই প্রশ্ন করলেন মূর্তি, 'আপনি তো বললেন তামিল ভাষা আর তার সফ্টওয়্যারে অ্যাপ্লিকেশনের সম্বন্ধে আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। মনে হয় সেটা আপনার আর দরকার নেই?' ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

'সিট ডাউন মিস্টার মূর্তি।' আকিদার গলা এবার ধাপে ধাপে নিজের ফর্মে উঠছে, 'আমার প্রশ্ন এখনও শেষ হয়নি।'

এক মুহূর্তের জন্য আকিদার দিকে জান্তব দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে মিস্টার মূর্তি এবার সুদর্শনবাবুকে ডিরেক্ট চার্জ করে বসলেন, 'হোয়াট ইজ অল দিস? হু দ্য হেল ইজ দিস পার্সন? কী রাইট আছে ওঁর, আমাকে আমার কাজের জায়গায় এভাবে বিরক্ত করার? আপনিই বা কিছু বলছেন না কেন?'

কথাবার্তা উঁচু গলায় হবার জন্য খেয়াল করলাম, হল থেকে সবাই এ ঘরের দিকে দেখছেন। বাদলবাবুও দেখলাম একবার আমাদের দিকে তাকালেন। আমি দাঁড়িয়ে আছি তাই দেখতে পাচ্ছি। আকিদা যেমন ছিল তেমনিই বসে আছে। এবার সেই বসা অবস্থা থেকে নিজের পুরো হাইট উঠে দাঁড়িয়ে সুদর্শনবাবুকে বলল বাকিদের বলে দিতে শুধু চিন্তা না করতে। সুদর্শনবাবু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সবাইকে আশ্বস্ত করলেন।

'সিন ক্রিয়েট করছেন কেন? বসে যান।' মিস্টার মূর্তিকে আদেশ দিল আকিদা।

মিস্টার মূর্তি দেখলাম একবার সবার দিকে তাকিয়ে কোনও উপায় না দেখে, বাঁ হাত দিয়ে মাথার পেছনটা ধরে ধপ্ করে বসে পড়লেন।

এরপর আকিদা সুদর্শনবাবুর টেবিল থেকে একটা সাদা কাগজ নিয়ে বুক পকেট থেকে কলম বার করে তাতে 'ম' অক্ষরটা লিখে সেটা উচ্চারণ করে মিস্টার মূর্তির দিকে কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বলল সেইরকম অক্ষর তামিল ভাষায় লিখতে, সেটা নাকি তামিল ভাষা আর তার সফ্টওয়্যারে অ্যাপ্লিকেশনে বিশেষ সাহায্য করবে।

মিস্টার মূর্তি গোমড়া মুখে কাগজটার দিকে তাকিয়ে আকিদার কাছ থেকে কলমটা নেবার জন্য ডান হাতটা বাড়ালেন।

'কী হ'ল?'

'আপনি তো আমাকে লিখতে বললেন—কলমটা দিন!'

'কিন্তু আপনার পকেটে তো দুটো কলম আছে।' মন্তব্য করল আকিদা, 'দুটোর যে কোনও একটা দিয়ে লিখুন। নিজের কলম কাউকে দিতে নেই, জানেন না? নাকি ওগুলো চলে না—ফর শো?'

মিস্টার মূর্তি নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আকিদার দিকে।

'আপনার অবগতির জন্য বলি—' সুদর্শনবাবু আর আমার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল আকিদা, 'একটা সফ্টওয়্যার চুরির ব্যাপারে আমি এসেছি এখানে, কারণ—' আকিদা সামান্য মাথা নেড়ে দেখাল সুদর্শনবাবুর দিকে, 'উনি আমাকে ডেকেছিলেন। ওঁর সন্দেহ ছিল যে ওঁর টিমের কেউ এটা করেছে এবং ওঁর সন্দেহ যে অমূলক নয় সেটা আমি বুঝেছি।'

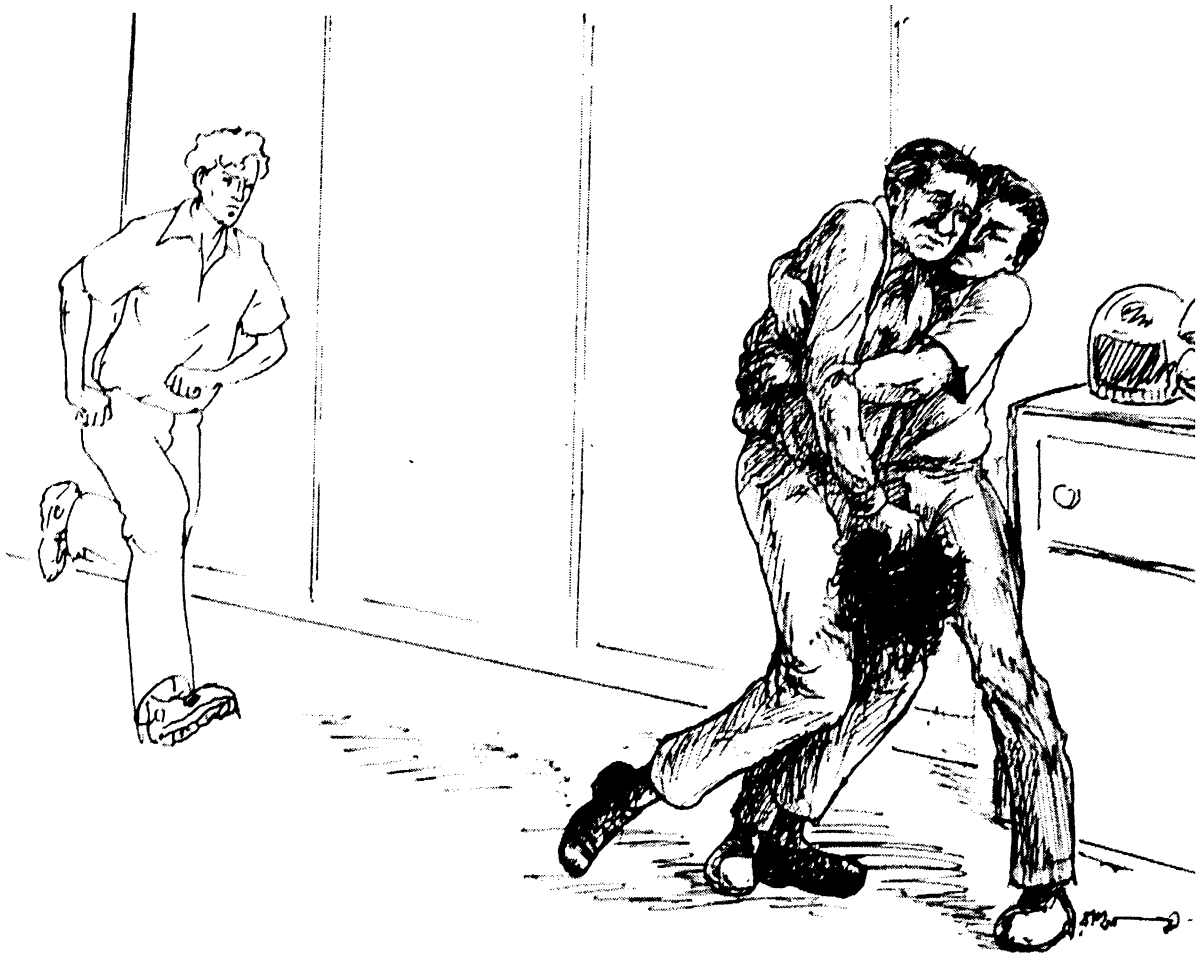

'সেটা আমাকে বলছেন কেন? তার প্রমাণ কোথায়?' হঠাৎ গর্জে উঠলেন মিস্টার মূর্তি।

'আপনার কাছে।' আকিদার হঠাৎ এরকম ছোট্ট ভাবে বলাতে পুরো ঘরের মধ্যে একটা পিন পতন নিস্তব্ধতা। সেটা ভেদ করে একটা আওয়াজ পেলাম। একটা নয় দুটো। প্রথমটা খুব জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ার। মিস্টার মূর্তির। দেখি উনি ঢোঁক গিললেন। দ্বিতীয়টা সুদর্শনবাবুর ঘরের পাখার। দেখি সেটা আস্তে আস্তে ঘুরে, মিস্টার মূর্তির মাথা ভর্তি কালো কোঁকড়া চুলের ওপর আস্তে আস্তে হাওয়া দিতে চলে গেল। হঠাৎ আমার স্ট্রাইক করল ব্যাপারটা। বজ্রপাতের মতন। ওঁর চুলের ওপর হাওয়া পড়ল কিন্তু কই সেটা তো সেরকম ভাবে উড়ল না। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম কেন ওঁর চুল যাত্রাদল-মার্কা মনে হয়েছিল। 'দ্য গেমস আপ, কীর্তি বসন কেবলম মূর্তি।' গম্ভীর গলায় বলে উঠল আকিদা, 'আপনার হাতটা সরান। যেভাবে পরচুলাকে আঁকড়ে ধরেছেন সেটা ধরা পড়ে গেছে, এবং সেটা এই পাখাটার জন্যই সম্ভব হয়েছে। আমার আগেই এই সন্দেহটা ছিল, তাই আপনাকে এখানে এনে বসিয়েছিলাম। আর তাছাড়া আপনার বুক পকেটে যেটা কলম—'

হঠাৎই মিস্টার মূর্তি নিজের চেয়ার ছেড়ে, বাঁ হাতে বুক পকেট আঁকড়ে, ডান হাতে পরচুলা আঁকড়ে, দরজা দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে, সুদর্শনবাবুর অফিসের টবে লাগানো পাম গাছ উল্টে দৌড় দিলেন বাইরের দিকে। কিন্তু কোনও লাভ হল না।

আকিদার একটি ডাকে বাদলবাবু খপাৎ করে গাঁট্টাগোঁট্টা মূর্তিকে বগলদাবা করে ফেললেন।

'লেট মি গো!' মিস্টার মূর্তির চিৎকারে কোনও ফল তো হলই না, উলটে বরং জিম করা কবজি দিয়ে বাদলবাবু ওঁর হাত দুটো আরও জোরে চেপে ধরলেন।

'আইয়ো!'

ইতিমধ্যে আমরা গিয়ে যখন পৌঁছেছি, তখন বাকিরাও হাঁ করে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে।

'আপনার অফিসে এরকম একটা ব্যাপার করতে চাইনি।' সুদর্শনবাবুকে বলল আকিদা, 'দয়া করে বাকিদের

বলুন নিজের নিজের কিউবিক্যালে বসে থাকতে, কারণ পুলিশ আসছে।'

তারপর আমার দিকে ফিরে ফিসফিস করে বলল, 'প্রমোদ বড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলার আগে সৌগতবাবুকে এস. এম. এস. করে, ঠিকানা দিয়েই আসতে বলেছি। উনি এদিকে ছিলেন তাই, না হলে অন্য ব্যবস্থা করতাম।'

বুঝতে পারলাম কেন আকিদা তখন বার বার ঘড়ি দেখছিল।

সুদর্শনবাবুর চোখ বিস্ফারিত! কিন্তু তারই মধ্যে দেখলাম তিনি তা বললেন, এবং বাকিরা ওঁর কথা মানল বটে, কিন্তু কৌতূহলী উঁকিঝুঁকি দেওয়া চলতেই থাকল। বাদলবাবু সেই ভাবেই চেপে ধরে আছেন মিস্টার মূর্তিকে — ভাবটা এমন আকিদা যতক্ষণ না কিছু বলে ওঁকে উনি সেই ভাবেই ঠায় ধরে বসে থাকবেন।

'ওঁকে বেশি চেপে ধরবেন না।' বলল আকিদা, 'তাহলে আবার...'

'বাঃ-বাঃ! এ তো ভীম কীচক -এর ব্যাপার দেখছি!' আকিদার কথার ওপরই একটা চেনা গলা শোনা গেল দরজার মুখে। আর সুদর্শনবাবুর 'সবই সলিউশন লিমিটেড'-এর অফিসের 'সাইলেন্স প্লীজ' বোর্ডকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁর চিরাচরিত বাজখাঁই গলা নিয়ে প্রবেশ করলেন আমাদের আদি ও অকৃত্রিম ইনস্পেকটর সৌগত ঘোষ, সঙ্গে আরেকজন অফিসার আর দুটি কনস্টেবল।

'তা কোনটি কে? আরে! আরে!' সৌগতবাবু হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন বগলদাবা হয়ে যাওয়া মিস্টার মুর্তির দিকে।

কারণটা পরিষ্কার। বাদলবাবুর পাশে যে হেলমেট রাখার জায়গা, সেই টেবিল ফ্যানের তেজের জেরে এবং সম্ভবত ওঁর ঠেলার জোরে কেবলম মূর্তির পরচুলা খুলে পড়েছে, এবং তাঁর সেই যাত্রাদল-মার্কা কোঁকড়ানো চুল খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পাতলা কালো লম্বা চুল, যাতে কোঁকড়ানোর নামগন্ধ পর্যন্ত নেই।

'আরে, এ তো দেখছি রঙ্গনাথ স্বামী!' অবাক হয়ে বলে উঠলেন সৌগতবাবু। খেয়াল করলাম তাঁর বাজখাঁই গলা একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে। আমরা তিনজনেই — আকিদা, সুদর্শনবাবু, আমি —অবাক হয়ে তাকালাম সৌগতবাবুর দিকে।

'সে আবার কে?' আমাদের হয়েই জিজ্ঞেস করল আকিদা।

এতে সৌগতবাবু যতখানি সম্ভব তাঁর গলাকে নামিয়ে একটা মাইডিয়ার ভাব এনে বললেন এ হচ্ছে সেই চার্টার্ড ফার্মের টাকা কারচুপি কেসের ক্রিমিনাল যেটা উনি আকিদাকে নিতে বলেছিলেন কিন্তু ও নেয়নি।

'তাহলে তো ভালোই হল।' বলল আকিদা, 'তখন তো প্রমাণের অভাবে ও আপনার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, এখন তো আপনি ওকে হাতে নাতে ধরতে পারলেন।'

'হুঁ, অনেকটা মাগুর মাছের মতন।' মন্তব্য করলেন ইনস্পেকটর সৌগত ঘোষ।

'মাগুর মাছ কি না জানি না, তবে গভীর জলের মাছ তা জানি। একটি সফট্ওয়্যার চুরি করে সেটাকে যথাস্থানে পাচার করার তাল করছিলেন। আমার বিশ্বাস যাতে টেররিস্টদের কালো হাত আরও শক্ত হয়।' বলল আকিদা।

'বলেন কী!' সৌগতবাবু হাতের তেলো ঘষতে আরম্ভ করলেন, 'কোথায় সে মাল, মানে জিনিস— ইয়েটা?'

খেয়াল করলাম ওঁর গলা আবার পুরনো ফর্মে ফিরে এসেছে।

'কিন্তু আমার বাংলা লেখার সফট্ওয়্যার নিয়ে কী করে—' হতবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন সুদর্শনবাবু! সত্যি বলতে কি আমারও একটু সন্দেহ হচ্ছে। আকিদা যখন ধরেছে, তখন নিশ্চয়ই প্রমাণ আছে ওর কাছে, কিন্তু কীসের ভিত্তিতে ও বলছে যে বাংলা লেখার সফট্ওয়্যার টেররিস্টদের কাজে আসবে সেটা বুঝতে পারছি না। বিশেষত যেখানে রঙ্গনাথ ওরফে মূর্তি বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

এবার আকিদা বগলদাবা হয়ে যাওয়া আসামীর দিকে ধীরভাবে এগিয়ে গেল। লোকটির আর কিছু করার উপায় নেই, কারণ বাদলবাবুর হাতে সত্যিই একেবারে সে কীচকবধ হয়ে গেছে। এরপর নিজের পকেট থেকে রুমাল বার করে, লোকটির বুকপকেট থেকে একটা মৃদু টানে দুটো স্টিল রঙের কলম টেনে আনল আকিদা।

'এ তো দেখছি কলম স্যার।' আমতা আমতা করে বললেন সৌগতবাবু, 'এতে আবার সফট্ওয়্যার কী করে আসবে?' তারপর কী রকম সন্দিগ্ধ ভাবে তাকালেন আকিদার দিকে।

'আরে—'

'সৌগতবাবুর কথা মুখেই আটকে গেছে। সত্যি বলতে কি, আমাদের সবারই, কারণ আকিদা এক টানে কলমের খাপটা খুলতেই তাতে দেখা গেল একটা পেন ড্রাইভ-এর

মুখ বেরিয়ে আছে যেটা অনায়াসে কম্পিউটার মেশিনে লাগানো যায়।

'কলমের খাপটাই ড্রাইভ।' মৃদু হেসে বলল আকিদা, 'নতুন বেরিয়েছে।'

আমি আড়চোখে দেখলাম অন্য ইনস্পেকটর আর কনস্টেবল দুটিও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে পেন ড্রাইভটার দিকে। দ্বিতীয় কলমটাতেও একই জিনিস পাওয়া গেল।

'দুটো কেন বলুন তো, স্যার?' প্রশ্ন করলেন সৌগতবাবু।

'মনে হয় ব্যাক আপ,' বলল আকিদা, 'তবে সেটা বোঝা যাবে এখনই। আপনার ল্যাপ্‌টপ্‌টাকে একবার আনবেন?' সুদর্শনবাবুর দিকে ফিরে বলল আকিদা।

সুদর্শনবাবু সঙ্গে সঙ্গে ল্যাপ্‌টপ্‌ আনতে চলে গেলেন। আমি এই ফাঁকে দেখলাম সুদর্শনবাবুর অফিসের বাকিরা কাজ বন্ধ করে প্রমোদ বড়ুয়ার কিউবিক্যাল-এ জটলা করছেন, আর নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। এবার আকিদার ইশারায় বাদলবাবু মূর্তি ওরফে রঙ্গনাথকে বসিয়ে দিলেন ওঁরই চেয়ারে, কিন্তু হাত ছাড়লেন না, কনস্টেবল দুটি মূর্তিকে ঘিরে দাঁড়াল।

'দেখি তো একবার মাল— ইয়ে পেন ড্রাইভটা।' বললেন সৌগতবাবু।

'দেখবেন, হাতে নেবেন না।' আকিদা সাবধান করে দিল, 'তাহলে আবার আপনার ফিংগারপ্রিন্ট পড়ে গেলে মুশকিল আছে।'

'ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। নিন, এ সব সাইবার ক্রাইম-এর ব্যাপার, আপনিই সামলান। ওই তো আপনার মানে ওঁর ল্যাপ্‌টপ্‌ এসে গিয়েছে।' তারপর গলাটাকে নামিয়ে আকিদার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'ইয়ে কী যেন নামটা এঁর?'

আকিদা চট করে পরিচয় পর্ব সেরে নিল। সৌগতবাবু রোগা-পাতলা চেহারার অফিসারটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন— রামতনু প্রামাণিক, যাঁর আন্ডারে এই চত্বরটা পড়ে, ইনি না থাকলে সৌগতবাবুকে নাকি সল্ট লেকে ঘুরপাক খেতে হত।

আকিদা পেন-ড্রাইভটা লাগাতেই আমরা দেখতে পেলাম একটা ডিরেকটরি যার নাম দেখে আমার মুখ থেকে আপনা আপনিই একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল। 'এ কী!' হতবাক হয়ে বললেন সুদর্শনবাবু, 'এতে তো বাংলার কাজ নেই, এতে নৌসেনার যাবতীয় কাজকর্ম আছে।'

'ঠিক বলেছেন।' বলল আকিদা। তারপরে আশ্বাসের সুরে বলল, 'বলছি। আগে পুলিশসাহেবদের ছেড়ে দি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক,' ভারি উৎসাহের সঙ্গে সায় দিলেন সৌগতবাবু।

'আপনার পাসওয়ার্ডটা লাগবে,' সুদর্শনবাবুকে বলল আকিদা। তারপর সৌগতবাবুকে বলল, 'আমার মনে হয় রঙ্গনাথের কোনও হ্যাকারদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, না হলে পাসওয়ার্ড আছে জেনেও সে এই ফাইল চুরি করে?' সৌগতবাবু দেখলাম একবার কট্‌মট্‌ করে তাকালেন মিইয়ে যাওয়া রঙ্গনাথের দিকে, কিছু বললেন না।

পাসওয়ার্ড দিতেই ফাইল খুলে গেল আর সেটা যখন সুদর্শনবাবুর কম্পিউটারের ফাইলের সঙ্গে মেলানো হল, তখন দেখা গেল দুটোই হুবহু এক। দ্বিতীয় পেন ড্রাইভেরও একই অবস্থা। সুতরাং রঙ্গনাথ যে ওটাকে হাতিয়েছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

'বা-বাঃ! আর কত রঙ্গ দেখব তোমার রঙ্গনাথ!' মন্তব্য করলেন ইনস্পেকটর সৌগত ঘোষ। 'এবার এসো আমার রঙ্গ একবার দেখবে এসো তো বাবা! তুমারা হড্ডি হাম পিলপিলাকে রখ দেগা!'

ওঁর একটি ইশারায় এবার আসামী বাদলবাবুর হাত থেকে কনস্টেবলদের হাতে চালান হয়ে গেল।

'দাঁড়াও একমিনিট।' হঠাৎ ভীষণ তেজের সঙ্গে বলে উঠলেন সৌগতবাবু। তারপর সুদর্শনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিস্টার — ইয়ে কী যেন পদবীটা এঁর বললেন? এবার আকিদার দিকে ঝুঁকে পড়ে গলাটাকে নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'মল্লিক।'

'ইয়েস ইয়েস, মল্লিক। মিস্টার মল্লিক, আপনি কি এই রঙ্গনাথ স্বামীকে আপনার এই সব ফাইল দিয়েছিলেন?'

'আজ্ঞে না স্যার।'

'আর তুমি, এই যে, ওহে মিস্টার রঙ্গনাথ স্বামী, বা যাই তোমার নাম হোক না কেন, তুমি কিছু বলবে? তোমাকে বলে দেওয়া আমার কর্তব্য— তুমি যা বলবে তা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে আদালতে পেশ করা হবে।'

বলা বাহুল্য রঙ্গনাথ ওরফে মূর্তি চুপ করে রইলেন।

'আমার মনে হয়, টাকার কারচুপির কেসটার সম্বন্ধে বোধহয় সুদর্শনবাবু জানতেন না, তাই ওঁকে চাকরি দিতে

কোনও অসুবিধে হয়নি।' বলল আকিদা।

সুদর্শনবাবু বললেন যে সেটার ব্যাপার উনি তো জানতেনই না আর তাছাড়া ছেলেটির অ্যাকাউন্টিং বিদ্যে ওঁকে যারপরনাই অভিভূত করেছিল।

'বিদ্যেটা ওই চার্টার্ড ফার্মে বসে রপ্ত করেছে নির্ঘাৎ,' মন্তব্য করলেন সৌগতবাবু।

'নৌসেনার ফাইল যে কোনও বিশেষ গোপনীয় ব্যাপারে সেটা আমি ধরতে পারি, যখন সুদর্শনবাবুর কাছে নৌ-সেনার দুজন প্রতিনিধি খোদ দিল্লি থেকে ছুটে আসেন ওঁর সঙ্গে কথা বলতে এবং ওঁর কাজের প্রোগ্রেস দেখতে।' বলল আকিদা, 'নৌসেনার গোপনীয়তার স্বার্থে আমি আর এর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করব না, শুধু এইটুকুই বলব সেদিন আপনাদের কথাবার্তা শুনে রঙ্গনাথ বুঝতে পারে কী সাংঘাতিক দাঁও মারতে পারে যদি এই সফট্ওয়্যারটিকে হাতাতে পারে। তাই প্রথম চান্সেই সে দেখে নেয় আপনার মেশিনে এই সফট্ওয়্যারের যাবতীয় ফাইল কোথায় রাখা থাকে। তারপর গতকাল সুযোগ পেয়েই সেখান থেকে কপি করে নেয়।'

'কিন্তু, কিন্তু—' আমতা আমতা করে বললেন সুদর্শনবাবু, 'তার কানে তো হেডফোন লাগানো থাকত স্যার, সে আমাদের কথা শুনতে পেল কী করে?'

'ঠিক যেভাবে সে শুনতে পেয়েছিল আমার ফিসফিস করে করা প্রশ্ন, 'কাজকর্ম কী রকম চলছে?' বলল আকিদা। আকিদার কথা শুনে বিদ্যুতের মতো স্ট্রাইক করল আমার ব্যাপারটা। ওর প্রশ্নে রঙ্গনাথ ওরফে মূর্তি তৎক্ষণাৎ দু-দিকে মাথা নেড়ে 'ওকে, ওকে' বলেছিল। কানে হেডফোন লাগানো থাকলে সে শুনতে পেল কী করে? বুঝতে পারলাম একটুর জন্য মিস করে গেছি! কিন্তু হঠাৎ আমার মনে পড়ল একটা কথা, আর ওকে ফস্ করে প্রশ্ন করে বসলাম সবাইকার সামনেই, 'আচ্ছা, ওঁর হয়তো তখন সিডিটা চলছিল না!'

'তুই বোধহয় খেয়াল করিসনি, ওঁর সঙ্গে কথা বলার আগে আমি কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়েছিলাম।' বলল আকিদা, 'তুই দেখেছিলি কি না জানি না, ওঁর সিডি প্লেয়ার চলছিল, অথচ তার ভল্যুম একেবারে জিরো। যে সর্বক্ষণ হেডফোন লাগিয়ে কাজ করে, সে এরকম করবে কেন? তার কি অন্য কোনও অভিসন্ধি আছে? এটা নিয়ে ভাবতেই আমি প্রশ্ন করি একদম ফিসফিসিয়ে এবং সে ও পাকা খেলোয়াড়ের মতন, যেন ভীষণ কিছু একটা শুনছে, এই রকম ভান করে জবাব দেয়, কিন্তু একটা জিনিস করে না যেটা সচরাচর লোকেরা করে থাকে এই রকম পরিস্থিতিতে। সেটা কী বল্ তো?'

'হেডফোন নামায় না?' একটু ভেবে বললাম আমি।

'ঠিক!' আকিদার বদলে সৌগতবাবুই বলে দিলেন। অবশ্য তার বলার মধ্যে একটা নিজস্ব চেতনা উপলব্ধির সুরও ছিল।

'এবং সেটাই আমাকে ঘোর সন্দেহের মধ্যে ফেলে।' বলল আকিদা, 'সব অপরাধী কোনও-না কোনও-সময় একটা সামান্য ভুল করে বসে; এবং সেক্ষেত্রে এটাই ছিল রঙ্গনাথ-এর সামান্য অথচ কস্টলি মিসটেক।'

'ঠিক, ঠিক! তারপর, তারপর?' ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন সৌগতবাবু। ইতিমধ্যে দেখি অন্য ইনস্পেকটর ভদ্রলোকটি ভারী মনোযোগ দিয়ে একটা প্যাডে কী সব লিখছেন।

'সুদর্শনবাবুর সঙ্গে আজ কথা বলার সময় জানতে পারি ওঁর নৌসেনার কাজ সম্বন্ধে নিয়ে উনি শুধুমাত্র দু-জনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন—প্রমোদ বড়ুয়া আর রঙ্গনাথ স্বামী ওরফে মূর্তি। এবং নৌসেনার লোকেরা চলে যাবার পরই সুদর্শনবাবুর মেশিনে কেউ হাত দেয়। হাত দেবার সব থেকে বেশি চান্স ছিল আসামীর, কারণ সে-ই ওঁর ঘরের কাছে বসত এবং সেদিন সব শুনতে পেয়েছিল। তাই সে সুদর্শনবাবুর মেশিন হাতড়ায়। সে যদি সেদিন না করত, তাহলে আমার সন্দেহ এত চট্ করে ওর ওপর হত না।'

'কস্টলি মিসটেক,' মন্তব্য করলেন সৌগতবাবু।

একটা মৃদু হাসি হেসে আকিদা বলে চলল, 'প্রমোদ বড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলার পর বুঝি সে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। তাকে দু-একটা প্রশ্ন করতে সে অনেক কিছু বলতে থাকে নিজের কাজ সম্বন্ধে এবং সেই ফাঁকে আমি চুপচাপ থেকে নিজের মাথা খাটাবার সুযোগ পাই। তাছাড়া, তখন সৌগতবাবুকে খবর দেওয়া হয়েছে, ওঁকেও কিছুটা সময় দেবার একটা ব্যাপার ছিল।'

'মূর্তির ওপর সন্দেহ হয়েছিল ওঁর এই হাবভাবে আর ওঁর বসার জায়গা হঠাৎ চেঞ্জ করার জন্য,' বলল আকিদা, 'ছদ্মবেশে তো ছিলেনই, এবং আমার বিশ্বাস তাঁর পরচুলা যাতে হঠাৎ খুলে না যায়, তাই নিজের হেলমেট খুলতেন না যেখানে সবাই খোলে, পাছে হাওয়ার চোটে তার নকল চুল

খুলে গিয়ে আসল চেহারা প্রকাশ পায়। সুদর্শনবাবুর ঘরে যখন ওঁকে ডেকে পাঠাই, তখন সে আর হেডফোন পরেনি, আর আমি সেই সুযোগের সদ্ব্যব্যহার করে তাঁকে পাখার ঘরে বসাই, আর সে কারণে অকারণে মাথায় হাত দিয়ে পরচুলোটা ধরে থাকে। কিন্তু পালাতে গিয়ে বাদলবাবুর হাতে ধরা পড়ে আর তাঁর পরচুলাতে হাত দেওয়া হল না, আর আসল চেহারা ফাঁস হয়ে গেল আপনাদের সামনে।'

দেখলাম সৌগতবাবু একবার বাদলবাবুর দিকে তাকিয়ে নিলেন।

'সে যখন জয়েন করেছিল তখন সেটা ছিল শীতকাল, তবুও সাবধানের মার নেই, তাই সে নিজের কাজের জায়গায় এসে হেলমেট খুলে, চট করে হেডফোন পরে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে বসত। বাস্তুশাস্ত্রের নাম করে সে নিজের জায়গা পালটে একেবারে সুদর্শনবাবুর চেম্বারের পাশে গিয়ে বসে, কেন না ততদিনে সে জেনে গিয়েছে যা কিছু শাঁসালো জিনিস সে এখান থেকেই পাবে। চান্স খুঁজতে থাকে, আর তারপর স্ট্রাইক করে একদিন—'

'কিন্তু থ্যাঙ্কস টু ইউ, হল না আর সেটা,' সৌগতবাবু একটা ঘোষণা করার মতন বললেন।

'যখন শুনলাম ও রামেশ্বরমের লোক তখন ওর অপরাধের মোটিভ একদম জলজ্যান্ত দেখতে পেলাম।' একটু থেমে বলল আকিদা। 'কাগজে পড়ছি ইদানীং অনেক টেররিস্টদের—'

'ধনুষকোডি,' অপ্রত্যাশিত ভাবে বলে উঠলেন সৌগতবাবু। 'রামেশ্বরম্ থেকে আঠারো কিলোমিটার দূরে। শুনেছি বটে। একেবারে ইন্ডিয়ার টিপ— বে অব বেঙ্গল আর ভারত মহাসাগর দু-দিকে। আর সেখানে নৌসেনার সফট্ওয়্যার বেহাত করলে আর দেখতে হবে না।'

সুদর্শনবাবু শিউরে উঠলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'আশ্চর্য! হেলমেট দেখেছি, হেডফোন দেখেছি, কলমও দেখেছি, ওয়েবসাইটে দেখেওছি এরকম বেরিয়েছে, কিন্তু কোনও দিন ঠাহর করতে পারিনি।'

আকিদা আড়চোখে একবার তাকাল আমার দিকে, কিছু বলল না। তারপর মিইয়ে যাওয়া রঙ্গনাথ ওরফে মূর্তির কাছে গিয়ে বজ্রকঠিন গলায় বলল, 'আপনি আপনার প্রাচীন গৌরবময় জাতির কলঙ্ক এবং দেশের তো বটেই।'

'হুঃ! কুঁজোর ইচ্ছে হয় চিৎ হয়ে শোবার, গামছার ইচ্ছে হয় ধোপার বাড়ি যাবার।' বলে উঠলেন সৌগতবাবু। 'তুমি বরং আমার সঙ্গে তোমার স্পেশাল শ্বশুরবাড়ি চলো। টেররিস্টগিরি করা বার করছি তোমার।' তারপর আকিদার দিকে ফিরে বললেন, 'চলি স্যার।'

'আপনার রিপোর্টটাতে যেন...'

'জানি, বলতে হবে না,' এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে আসামী বগলে করে সদলবলে বিদায় নিলেন ইন্সপেকটর সৌগত ঘোষ। বুঝলাম এখানেও আকিদার নাম উহ্য থাকবে।

সৌগতবাবু চলে গেছেন আসামী সমেত। সবই সলিউশন-এ এখন সবই শান্ত, সবই আগেকার মতন। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল আকিদা, 'অঙ্ক, স্রেফ অঙ্ক। ডিডাকশন, অর্থাৎ বিয়োগ করতে করতে এগোলাম এ কেসটাতে। তবে সেটা করতে হল অন দ্য স্পট।'

আমার কিন্তু একটা ব্যাপার নিয়ে সমানে খচ্খচ্ করছে। তবে আমি সেটা জিজ্ঞেস করার আগেই সুদর্শনবাবু করলেন, 'দেখুন স্যার, আমার সন্দেহ ছিল বাংলা ভাষার ওপর সফটুওয়্যারটিকে নিয়ে। সেখানে নৌসেনার ওপর সফট্ওয়্যারে আঘাত হানা হয়েছে, এ আপনি বুঝলেন কী করে?'

আকিদা কিছু না বলে মৃদু হেসে চুপ করে রইল। তারপর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কিছু বলবি?'

আমি একটু থতমত হয়ে গেলাম। তবু চেষ্টা করলাম। আকিদার কথাই মনে পড়ল প্রথমে। আজ কিছুক্ষণ আগে ট্যাক্সিতে বসে ভাবতে বলেছিল মন খুলে, প্রাণ ভরে। আর সেটা করতেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল ওঁরই কথা।

'কারণ উনি যে বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করছেন সেটা কেউ জানত না, তাই ওটাকে কেউ আর ডিস্টার্ব করেনি,' আমি বলে উঠলাম।

'গুড!' আকিদার গলায় তারিফের মাত্রা পরিষ্কার। 'কিন্তু নৌসেনা কেন? ডিজিট্যাল সই-এর কাজও তো আছে ওঁর কাছে।'

আমার মাথায় আবার স্ট্রাইক করল একটা কথা।

'তাঁর কারণ নৌসেনার লোকেরা চলে যাবার পর ওঁর মেশিনে হাত পড়ে,' বলে দিলাম তৎক্ষণাৎ।

'আর?' দেখি আকিদা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। 'ও যে বাংলা ভাষা খুঁজছিল না, সেটা বুঝলাম কী করে?'

আমি মাথা নাড়লাম। আর কী হতে পারে?

এরপর শুনলাম আকিদার ফি সফিস করে বলা, 'সার্চ ইঞ্জিন বাংলা কাজের প্রথম ফাইলটাতে দাঁড়িয়ে ছিল, ভুলে গেলি?'

ওর দিকে হাঁ করে তাকাতেই বুঝতে পারলাম।

সুদর্শনবাবুর পেনড্রাইভে এবং ওঁর মেশিনে ছিল প্রথমে নৌসেনার কাজের ফাইল, তারপর বাংলা ভাষার কাজের ফাইল আর সবশেষে ডিজিট্যাল সই-এর কাজের ফাইল। সার্চ ইঞ্জিন যদি বাংলা কাজের প্রথম ফাইলটাতে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তার পরের ফাইলগুলো আর দরকার নেই। কিন্তু তার আগে যে সফট্ওয়্যার আছে সেটার সমস্ত ফাইলগুলো সে খুঁজে বার করেছে, টপ টু বটম, অতএব সেটাকেই সে খুঁজছে।

আরে, এ তো জলের মতন সোজা!

'ধরতে পেরেছিস তাহলে,' আকিদার মন্তব্য যেন আমার পিঠটা চাপড়ে দিল। তারপর সুদর্শনবাবুকে বুঝিয়ে দিতে উনি চোখ গোল করে বসে রইলেন।

'ধন্যি!' অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন তিনি।

'সত্যি বলতে কী প্রথমে আমি ধরতে পারিনি।' একটা হালকা জার্মান কোম্বিং করে আকিদা বলল ওঁকে। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'তোকে বলছিলাম না এবারের কেস রিলেটিভ পয়েন্ট অব ভিউ বা দৃষ্টিকোণের ওপর এই কেস দাঁড়িয়ে আছে, সেটা এমনি বলিনি। আসামী খুঁজছে নৌসেনার কাজের ফাইল আর আমরা ভাবছি সে খুঁজছে বাংলা কাজের ফাইল। কারণ আমরা সুদর্শনবাবুর দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করছিলাম। এটা ডেঞ্জারাস। শেষে চোখটা খুলে গেল।'

'কী করে?' অস্থির হয়ে আমি আর সুদর্শনবাবু একই প্রশ্ন করলাম।

'তারিখ অনুযায়ী সাজানো আমার পুরনো খবরের কাগজ আর পত্রিকার দিকে তাকাতে। যদি আমি কোনও বিশেষ কিছু পুরনো খবরের কাগজ খুঁজি, সাজানোটাকে না ডিস্টার্ব করে, তাহলে আমি তো স্বাভাবিক ভাবেই ওপর থেকে নীচে খুঁজব, আর আমার খোঁজা শেষ হবে যেখানে খবরের কাগজ শেষ হবে এবং পত্রিকা শুরু হবে, তাই নয় কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই,' হতবাক হয়ে বললেন সুদর্শনবাবু।

'আপাতদৃষ্টিতে মোটিভ কিঞ্চিৎ দুর্বল মনে হয়েছিল, কিন্তু এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়াতে আমি তখনই আপনার এখানে চলে আসি।' বলল আকিদা, 'রঙ্গনাথ প্রথম বারে পারফিউম মেখেছিল। পরে বুঝেছিল ওটা একটা ক্লু হলেও হতে পারে। তাই দ্বিতীয় বার আর মাখেনি।'

'তার মানে?' একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন সুদর্শন মল্লিক, 'বাংলা ভাষা নিয়ে আমার এ চিন্তা...'

'বাংলা ভাষাকে কেউ একটা চুল নড়াতে পারবে না,' বেশ জোর দিয়ে তাঁর কথার ওপর বলল আকিদা। 'সে নিজের স্বস্থানে বহাল তবিয়তে বিরাজ করবে।'

এর প্রায় মাস দেড়েক পর সুদর্শনবাবুর কাছ থেকে একটা ফোন এল, 'স্যার, পেটেন্ট পেয়েছি। আমার লেখা সফটওয়্যারটির একটি নামও দিয়েছি। আপনার ভালো লাগবে।'

'কী শুনি?' একটু দম নিয়ে আড়চোখে আমার দিকে প্রশ্ন করল আকিদা।

'আজ্ঞে, কার্তিক।'

আকিদার মুখ চোখ দেখে মনে হল ও বলছে, 'যাক, বাঁচা গেল!'

এদিকে সুদর্শনবাবু বলে চলেছেন, 'মাস্টারমশাইয়ের কাছে থেকে এত শিখেছি, তাই ভাবলাম ওঁর নামটাই দিই আর কি। উপযুক্ত নয় কী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই।'

ছবি : রাহুল মজুমদার

জেনে রাখা ভালো

বিমল দেব

১৮৭৮ সাল। বেলুনে প্যারিসভ্রমণ করেন নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। উপেন্দ্রনাথ দাসের বিখ্যাত নাটকের নাম 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'। তিনি রাজনীতি, সংবাদ পত্র প্রকাশ ও নাট্য আন্দোলনে জড়িত ছিলেন।

শব্দছক

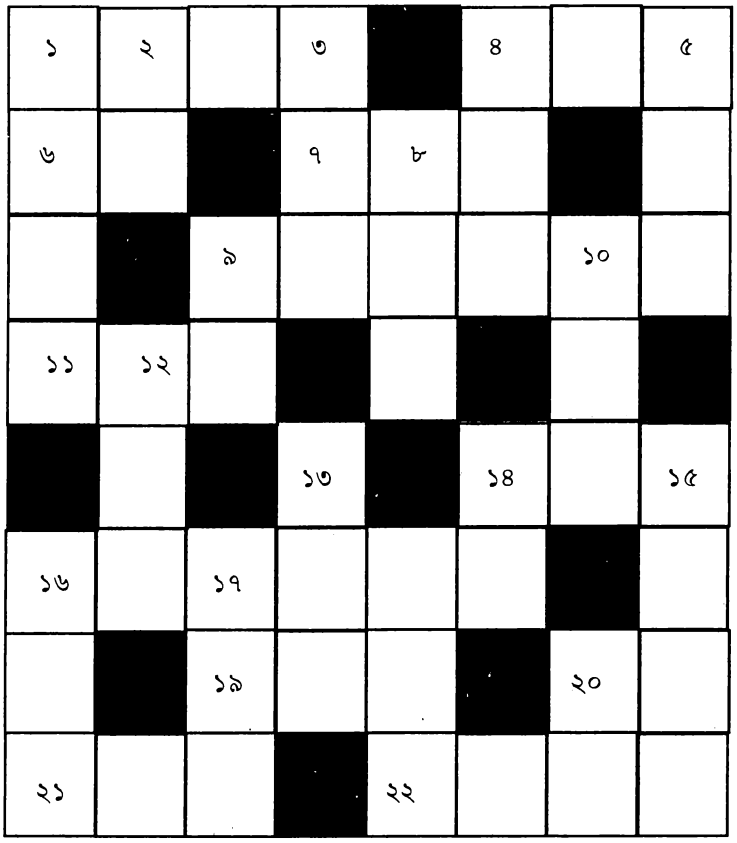

ইন্দ্রানী চক্রবর্তী

সূত্র

পাশাপাশি -১। ঘনিষ্ঠতা ৪। প্রাচীনকালের বৌদ্ধ চিকিৎসক ৬। সবজি ৭। কোমল রূপে অহংকার ৯। কলকাতার একটি জায়গা ১১। দৃষ্টি ১৪। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট একটি চরিত্র ১৬। নির্বোধ ১৯। প্রচুর লোক ২০। শ্রবণেন্দ্রিয় ২১। বাতাস ২২। এ জীবন

উপর নীচ- ১। রাবণ ২। সত্যি ৩। হুগলী জেলার স্থান বিশেষ ৪। জলের আরেক নাম ৫। গুরুত্ব ৮। কলকাতার কাছেই একটি জায়গা, এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুল আছে ১০।--পার্টি (বিপ্লবী দল) ১২। উত্তর ১৩। কোমলরূপে লগ্ন ১৪। কুক্ষিগত ১৫। বনাগ্নি ১৬। ফুল বিশেষ ১৭। আঠা ২০। পিতার অনুজ

উত্তর

পাশাপাশি- ১। দহরম ৪। জীবক ৬। শাক ৭। গরব ৯। বরাহনগর ১১। নজর ১৪। বরদা ১৬। গোবরগণেশ ১৯। জনতা ২০। কান ২১। পবন ২২। ইহকাল

উপর নীচ- ১। দশানন ২। হক ৩। মগরা ৪। জীবন ৫। কদর ৮। রহড়া ১০। গদর ১২। জবাব ১৩। লগন ১৪। বশ ১৫। দাবানল ১৬। গোলাপ ১৭। রজন ২০। কাকা

ক্লাবঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই চোখ ফেরালাম ডানদিকে রাখা টিভি সেটটার দিকে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম চেলসির খেলা শুরু হয়ে গেছে। টিভি সেটের সামনে পনেরো ষোলো জন বসে রয়েছে। তাদের পেছনে বসতে গিয়েও থেমে গেলাম। ফার্দিনান্দ একটা উঁচু সেন্টার করেছে। চেলসির লেফ্‌ট ব্যাক কোল-এর নাগাল এড়িয়ে পেনাল্টি বক্সের মাটি ছোঁওয়ার আগেই রুনি ছিটকে এসে মাথা ছুঁইয়ে বলটার দিক পরিবর্তন করে তিন কাঠির দিকে ঠেলে দিল।

'গো-ও-ও-ও...ওফ্'! চিৎকারটা সম্পূর্ণ করার আগেই থেমে যেতে হল। চেলসির গোলরক্ষক পিটার চেক-এর শরীরটা উড়ে গিয়ে দু-আঙুলে বলটা ক্রশবারের ওপর দিয়ে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

'ধ্যাৎ, কোনও মানে হয়!' হতাশ হয়ে পিন্টু আর তপুর মাঝখানে বসে পড়লাম, 'ইস্, ছ-মিনিটেই ওয়ান নিল হয়ে যাচ্ছিল।'

টিভি সেট থেকে মুখ না সরিয়েই জয় বলল, 'তিন মিনিটে ভ্যান পার্সির একটা শটও বারে লেগে ফিরে এসেছে অর্কদা।'

'তাই!' হালকা আক্ষেপ মেশানো সুরে বললাম, 'তাহলে চিন্তা নেই। আজ ম্যান ইউ জিতবেই।'

বাঁদিক থেকে টুকাইয়ের ব্যঙ্গ ভেসে এল, 'ওই আনন্দেই থাক। ল্যাম্পার্ড, কোল, টেরিরা তো ঘাস ছিঁড়বার জন্য মাঠে নেমেছে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাতেই টুকাই জিভ ভেংচে টিভি সেটের দিকে মুখ ফেরাল।

ওর খোঁচার একটা যুতসই জবাব দেবার জন্য মুখ খুলতে গিয়েই চোখ আটকে গেল এক কোণে রাখা জার্সিগুলোর দিকে। দেখেছ কাণ্ড! ঘণ্টাদুয়েক আগে গোপালের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল। কাঁধে জার্সির বোঝাটা নিয়ে একগাল হেসে বলেছিল, 'সব ভালো করে ধুয়ে ইস্তিরি করে দিইছি অক্কদা। দেখো, কাল জেতা চাই কিন্তু।'

দু-ঘণ্টা আগে গোপাল জার্সির সেট দিয়ে গেছে। এত সময় ধরে কেউ ওগুলো আলমারিতে তুলে রাখতে পারল না। প্রচণ্ড বিরক্তিমেশানো গলায় বললাম, 'কি রে, জার্সিগুলো যে ধুলোয় পড়ে আছে সেটা কেউ দেখলি না, ক্যাপ্টেন বলে সব দায়িত্ব কি আমার?'

পিন্টু বলল, 'না না, ধুলোয় না। একটা খবরের কাগজের ওপরে রেখেছে গোপালদা।'

জয় বলল, 'প্লিজ অর্কদা, রাগ কোরো না। হাফটাইমেই সব তুলে রাখব।'

কোনও কথা না বলে উঠে দাঁড়ালাম। এখ্‌খুনি ম্যান

ইউ বা চেলসি কেউ গোল দিলে সামনে বসে থাকা দলটার একটা অংশ যখন হুড়োহুড়িতে মাতবে তখন আর কারও জার্সির সেটগুলোর কথা মনে থাকবে না। ওগুলো ছোঁড়াছুঁড়ি করেই হয়তো আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। অতএব হাফটাইম অবধি অপেক্ষা করা যাবে না।

একটা একটা করে জার্সি আলমারিতে গুছিয়ে রাখছি, ঠিক তখনই পেছন থেকে বাপীর গম্ভীর গলাটা শুনতে পেলাম, 'কি রে তপু, রোনাল্ডোর নাকি স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নেই! তুই বলেছিস একথা?'

পেছন না ফিরেই তপুর তীক্ষ্ণ গলা শুনতে পেলাম, 'আর তুই যে বলেছিস মেসির ডান পা-টা অচল, হেড দিতে ভয় পায়, তার বেলা?'

'সে তো খেলা দেখেই বোঝা যায়। তাই বলে রোনাল্ডোর মধ্যে অখেলোয়াড়ীসুলভ মনোভাব কোথায় দেখলি?'

'কেন, ২০০৬ সালের ওয়ার্ল্ড কাপে ইংল্যান্ডের সঙ্গে খেলায় কী করেছিল?'

'ওগুলো খেলার মধ্যে হয়েই থাকে। তাছাড়া সেদিন রুনিও কিছু কম অপরাধী ছিল না। তাই ওসব দিয়ে একটা প্লেয়ারের কোয়ালিটি কমানো যায় না। বিশেষ করে রোনাল্ডোর মতো প্লেয়ারদের। ও হলো এই মুহূর্তে ওয়ার্ল্ডের একমাত্র কমপ্লিট ফুটবলার।'

'তোদের ভাষায় ইনকমপ্লিট হলেও মেসি ওয়ার্ল্ডের বেস্ট প্লেয়ার।'

এবার টুকাই-এর বিরক্তিমাখা গলার স্বর শুনতে পেলাম, 'ওরে, মেসি-রোনাল্ডোকে নিয়ে কাজিয়াটা থামা। আমাদের একটু নিশ্চিন্তে খেলাটা দেখতে দে।'

আলমারিতে তালা বন্ধ করে ঘুরেই দৃশ্যটা দেখে চমকে উঠলাম। তপু উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাপী। দু-জনের মুখই রাগে গনগন করছে! সর্বনাশ করেছে, ওরা দু-জনেই ওই দুই খেলোয়াড়ের অন্ধভক্ত ঠিকই, কিন্তু কোনও দিন তো নিজেদের হিরোকে নিয়ে এভাবে ঝগড়া করেনি। কালকে ফাইনাল ম্যাচে ওরা দু-জনই আমাদের মূল ভরসা। সেখানে আজকে এভাবে ঝগড়া করলে কাল মাঠে তাল মিল হবে কী ভাবে? কয়েক পা এগিয়ে ওদের ঝগড়ায় সবে বাধা দিতে যাচ্ছি, ঠিক তখনই কাঁধে কে যেন হাত রাখল।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি দেবুদা আটকেছে আমাকে। আমি কিছু বলার আগেই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় আমাকে চুপ করতে বলল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'চালিয়ে যেতে দে, দেখা যাক না কতদূর এগোতে পারে।'

অবাক হয়ে দেবুদার দিকে তাকাতে ও আবার ফিসফিস করল, 'ভরসা রাখ, দায়িত্ব যখন দিয়েছিস, চেষ্টা করতে দে।'

হকচকিয়ে গেলাম। প্রথমে মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো দু-দিন আগের ঘটনাটা মনে পড়ল। সেদিন বিকেলে ক্লাবঘরে বসেছিলাম, একাই।

তিনদিন পর শরৎশশী স্মৃতি কাপ ফাইনাল। আমাদের এই মফঃস্বল শহর সূর্যনগরের সবচেয়ে বড় ফুটবল প্রতিযোগিতা। সূর্যনগরের সবকটি ক্লাব অংশতো নেয়ই, আশেপাশের শহর-গঞ্জ থেকেও অনেক ক্লাব খেলতে আসে। এবারই প্রথম ফাইনালে উঠেছে আমাদের দুর্জয় সংঘ। বিপক্ষে পাশের শহর শিমুলখোলার কিশোর বাহিনী। নামে কিশোর হলে হবে কি, সব এক একটা মুশকো জওয়ান। খেলেও গা-জোয়ারি ফুটবল। আমাদের টিমটাও বেশ ভালো। বিশেষ করে তপু আর বাপী যদি নিজেদের খেলা খেলতে পারে তাহলে না জেতার কোনও কারণ নেই। কিন্তু মুশকিল একটাই। তপু খেলে সেন্টার ফরোয়ার্ডে আর বাপী লেফট উইং-এ। দু-জনেরই দুর্দান্ত খেলার ক্ষমতা আছে, কিন্তু দু-জনেই এত মুডি খেলোয়াড় যে কবে ভালো খেলবে বলা মুস্কিল। বিশেষ করে বিপক্ষে যদি মারকুটে খেলোয়াড় থাকে তবে তো ওদের খেলার ইচ্ছেটাই হারিয়ে যায়। তাই সাতদিন আগে ফাইনালে ওঠার পরেই এই দুজনকে নানাভাবে উদ্দিপ্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। যদিও দুজনের কোনও হেলদোল নেই। ওদের এই নির্লিপ্ত ভাব দেখে আর কেউ বুঝতে না পারলেও আমি ঠিকই বুঝতে পেরে গেছি যে ওরা ভালো খেলার ভাবনা থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। চিন্তায় আমার রাতের ঘুম উড়ে যাবার জোগাড়। আমি ক্যাপ্টেন। ঘরের মাঠে ফাইনালে হেরে গেলে সব টিটকিরি আমাকেই শুনতে হবে। চাইকি পিঠে দু-চার ঘা পড়তেও পারে। ফাঁকা ক্লাবঘরে বসে সেসব কথাই ভাবছিলাম। ঠিক তখনই ক্লাবঘরে ঢুকেছিল দেবুদা। দেবুদা মানে দেবব্রত রায়। পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর বয়স। একসময় দুর্জয় সঙ্ঘের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন ছিল। পড়াশোনায় তুখোড়। অসম্ভব বুদ্ধি। বিপদে আপদে পরামর্শের জন্য সূর্যনগরের সব বয়সী মানুষই ছোটে দেবুদার কাছে। তাই ঘরে ঢুকে দেবুদা যখন জিজ্ঞেস করল, 'কিরে বাংলার পাঁচের মতো মুখ করে বসে আছিস কেন?' তখনই মনে হ'ল এই মুশকিল-আসানকে একবার সমস্যাটা বললে কেমন হয়? সব খুলে বলার পর দেবুদা এক পলক কিছু ভেবে বলল, 'ঠিক আছে, চিন্তা করিস না।'

এই মুহূর্তে তপু, বাপীর ঝগড়া চালিয়ে যেতে বলায় মনে হল দেবুদা নিশ্চয়ই কোনও মতলব ঠাউরেছে। কিন্তু ওদের মধ্যে ঝগড়া চললে আদৌ কোনও সুরাহা হবে? আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না। অবাক হয়ে দেবুদার মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে ইশারায় কারণটা জিজ্ঞেস করলাম। দেবুদাটা আমার ইশারাটাকে কোনও গুরুত্বই দিল না। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ও তখন তাকিয়ে রয়েছে তপু আর বাপীর দিকে। অগত্যা আমিও চোখ ফেরালাম সেদিকে।

টুকাই-এর আপত্তির জন্যই বোধহয় তপু আর বাপী ওদের থেকে একটু তফাতে সরে ঝগড়া চালিয়ে যাচ্ছে। ই.পি.এল-এর টিভি দর্শকদের অবশ্য সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তপু আর বাপীও ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামের ইংরেজ ক্লাবের লড়াই থেকে নজর সরিয়ে দুই স্পেনীয় ক্লাবের দুই তারকাকে নিয়ে দ্বৈরথে মেতেছে।

তপু চিৎকার করে বলল, 'আরে মেসির মতো ওরকম দুর্ধর্ষ স্পিডে ম্যাজিকাল ড্রিবলিং, সাবলাইম টাচ, বলের ওপর পারফেক্ট কন্ট্রোল আছে তোদের রোনাল্ডোর?'

'আছে আছে সব আছে। রোনাল্ডোর খেলায় রয়েছে পাওয়ার স্পিড আর বল কন্ট্রোলের পারফেক্ট কম্বিনেশন। বিশেষ করে কাউন্টার অ্যাটাকে তো ও প্রচন্ড ধ্বংসাত্মক। রিয়েলে ওর টিমমেট ওজিলতো বলেইছে — হি ইজ দ্যা পার্ফেক্ট প্লেয়ার।'

'নিকুচি করেছে পারফেক্শনের। স্ট্যাটিস্টিক্স দেখ। এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে মেসিই হায়েস্ট স্কোরার। মুলারের রেকর্ড তো ওই ভেঙেছে।'

'আরে, নেভিল কার্ডাসতো বলেই দিয়েছে স্কোর বোর্ড একটা গাধা। ওসব দিয়ে কিছু বোঝা যায় না। রোনাল্ডো হ'ল ফ্রি কিক এক্সপার্ট। হেডও দুর্দান্ত। মেসির তো এই দুটোই নেই।

'কে বলে নেই। এই সেদিনের সুপার কোপায় তোদের রিয়েলকে ফ্রি কিকে যে গোলটা দিয়েছিল সেটা কি ভুলে গেলি? আর মেসির হেড! ২০০৯-এ চ্যাম্পিয়ানস লিগে ম্যান ইউকে হেড-এ কে গোল দিয়েছিল? আর স্ট্যাটিসটিক্সকে তো তোরা অস্বীকার করবিই। মেসিতো বার্সাকে একের পর এক ম্যাচ জেতাচ্ছে। রোনাল্ডো রিয়েলকে কতটা সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারছে। লা-লিগায়তো ওরা এখন সেকেন্ড পজিশনেও নেই। বার্সার সঙ্গে পয়েন্টের ডিফারেন্স কত সেটা মনে আছে তো?'

'সেতো বার্সার ফুল টিমটার জন্য। বার্সাতে মেসির সমান মানের বেশ কয়েকজন প্লেয়ার রয়েছে। ইনিয়েস্তা, জাভি কেউ কম নয়। সেখানে রিয়েলে সি আর সেভেন একাই লড়ে যাচ্ছে। আর তার জন্যই রোনাল্ডো দ্যা বেস্ট।'

'মেসির কোয়ালিটির কয়েকজন প্লেয়ার! তুই পাগল

নাকি ছা... থাক, সেটা আর বললাম না। রোনাল্ডোর সঙ্গে মেসির তুলনাই হয় না। মেসি হাজার যোজন এগিয়ে। ওয়ার্ল্ডের বেস্ট প্লেয়ার হলো লিওনেল মেসি। ওর ত্রিসীমানায় কেউ নেই।'

'অসম্ভব। রোনাল্ডোই বেস্ট।'

'না না, মেসি।'

'রোনাল্ডো।'

'মেসি।'

'রোনাল্ডো।'

দু-জনেরই গলার স্বর আস্তে আস্তে উঁচু পর্দায় চড়ছিল। ব্যাপারটা আমার মোটেও ভালো লাগছিল না। দেবুদার নিষেধ না মেনে শুম্ভ নিশুম্ভকে আলাদা করার জন্য সবে এক পা এগিয়েছি ঠিক তখনই দেবুদা বলে উঠল, 'আরে থাম থাম। এবার আমার একটা কথা শোন।'

ঝগড়া থামিয়ে দু-জনেই ফিরে তাকাল দেবুদার দিকে।

কয়েক পা এগিয়ে ওদের দু-জনের কাঁধে আলতো করে হাত ছুঁইয়ে দেবুদা বলল, 'গলাবাজি না করে তোরা প্রমাণ করে দে মেসি, রোনাল্ডোর মধ্যে কে বড় প্লেয়ার।'

হকচকিয়ে গেল দু-জনেই। একটু আমতা আমতা করে বাপী বলল,' আমরা কী ভাবে ...মানে ...আমরা তো আর এক্সপার্ট নই।'

'কেন?' একটু গম্ভীর স্বরে দেবুদা বলল, 'কালকের ফাইনাল ম্যাচটা জমিয়ে খেল। তোদের মধ্যে যে ভালো খেলবে প্রমাণ হয়ে যাবে যে তাঁর গুরুই বেটার প্লেয়ার।'

কয়েক সেকেন্ড হাঁ করে দেবুদার মুখের দিকে তাকিয়ে দু-জনেই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। হাসি থামতে প্রথম মুখ খুলল তপু, 'এটা তুমি কী বলছ দেবুদা! আমার খেলা দিয়ে তুমি মেসির খেলার বিচার করবে! কী যে বলো না তুমি!'

এতক্ষণ একে অন্যের সব কথার প্রতিবাদ করলেও এবার বাপী তপুর সঙ্গে একমত, 'তপু ঠিক বলছে দেবুদা। ওই গ্রেট প্লেয়ারদের সঙ্গে একসাথে আমাদের নাম নিও না। বড্ড লজ্জা লাগছে।'

দু-হাতে তপু বাপীর দু কাঁধ খামচে ধরল দেবুদা। ওর মুখ চোখও পাল্টে গেছে। চোয়াল শক্ত, নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। গলার স্বর কয়েক পর্দা উঁচুতে তুলে বলল, 'ভুল করছিস! আমি একবারও মেসি-রোনাল্ডোর সঙ্গে তপু-বাপীর তুলনা করছি না। আমি বোঝাতে চাইছি মেসি-রোনাল্ডোরা তোদের কতটা অনুপ্রাণিত করতে পারছে। আমি একটা প্লেয়ারকে গ্রেট তখনই বলব যখন ও নিজে ভালো খেলার পাশাপাশি তার অনুরাগীদেরও ভালো খেলতে উদ্বুদ্ধ করবে। সাধে একজন ভালো খেলোয়াড়ের খেলা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে তার হয়ে গলা ফাটিয়ে মাঠ থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে তার খেলার খুঁটি -নাটিগুলি যদি মাথা থেকে উড়িয়ে দিই তবে আর কী লাভ হবে? একলব্য যে এত অসাধারণ তীরন্দাজ হয়েছিল তার কৃতিত্ব কি শুধু একলব্যর নাকি দ্রোণাচার্যেরও সেই কৃতিত্বে অংশ আছে? তপু তুই মেসির ফ্যান, বাপী রোনাল্ডোর। ওদের খেলার আদলে তোরা নিজেদের তৈরি করার চেষ্টা করিস। তোরা যত ভালো খেলবি ততই প্রমাণিত হবে ওই দুই গ্রেট প্লেয়ারের ইন্সপায়ার করার ক্ষমতা কত বেশি। তাই বলছি, মেসি তুই কালকে চেষ্টা কর রোনাল্ডোর চেয়ে ভালো খেলতে, রোনাল্ডো তুই মেসির চেয়ে। সরি, ভুল বললাম, তপু, বাপী, তোরা চেষ্টা কর একে অন্যের চেয়ে ভালো খেলতে।'

দেবুদার হাত-পা নেড়ে, গলার স্বরে ওঠানামা করে দেওয়া বক্তৃতায় আমার পা-দুটো নিশপিশ করছে। ইচ্ছে করছে এখুনি মাঠে নেমে পড়তে। তপু আর বাপীরও দেখলাম চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। দুটো হাত মুঠো করে বাপী বলল, 'ঠিক বলেছ দেবুদা। কালকেই আমি প্রমাণ করে দেব রোনাল্ডো কত বড় প্লেয়ার। কাল আমি হ্যাটট্রিক করবই।'

তপুরও দুটো হাত মুঠি পাকানো। দৃঢ় গলায় বলল, 'চ্যালেঞ্জ নিলাম দেবুদা, কালকেই প্রমাণ করে দেব মেসি পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার।'

'সর্বকালের...!' কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল দেবুদা। সামান্য চুপ করে থেকে বলল, 'একটা পার্থক্য কিন্তু আছে। মেসি আর রোনাল্ডো কিন্তু কখনোই এক দলে খেলেনি। দেশের হয়ে তো প্রশ্নই আসে না। ক্লাবও ওদের আলাদা। কিন্তু তোরা দু-জন এক দলের। তোদের লক্ষ্য হবে দুর্জয় সংঘকে জেতানো। এখানেও কিন্তু তোদের আরাধ্য দেবতাদেরই অনুসরণ করতে হবে। মেসি, রোনাল্ডো কেউ-ই কিন্তু স্বার্থপর নয়। দলের স্বার্থে ওরা কিন্তু অনেক সময়ই নিজেরা না করে অন্যদের দিয়ে গোল করিয়েছে। এই তো সেদিন লা লিগার একটা ম্যাচ দেখছিলাম। বার্সিলোনা দু-গোলে এগিয়ে আছে। দুটো গোলই মেসির। খেলার একদম শেষ মিনিটে মেসি পেনাল্টি বক্সে একটা বল পেল। সামনে একজন ডিফেন্ডার। ওকে ডজ করলেই গোল পাবার

সম্ভাবনা, কিন্তু সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে ও দেখে নিয়েছে ভিয়া রয়েছে একদম ফাঁকায়। নিজের হ্যাটট্রিকের জন্য চেষ্টা না করে ও বলটা পাস দিয়ে দিল ভিয়াকে। তিন গোলে জিতেছিল বার্সা। কিন্তু মেসির হ্যাটট্রিক হয়নি সেদিন। রোনাল্ডোকেও মাঝে মধ্যে দেখেছি এ ধরণের আত্মত্যাগ করতে। তাই বলছি কাল কিন্তু প্রয়োজনে তপু বাপীকে গোলের পাস বাড়াবি। কিংম্বা বাপী তপুকে। টাচ, স্কিল, স্পিড আর স্পোর্টসম্যানশিপ দিয়ে প্রমাণ করে দে তোদের মধ্যে কে বেটার প্লেয়ার। একই সঙ্গে প্রমাণ হয়ে যাবে কে বড়, রোনাল্ডো না মেসি।'

তপু দৃঢ় গলায় বলল, 'ঠিক আছে, কাল মাঠেই সব প্রমাণ হয়ে যাবে।'

বাঁ-হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে সজোরে ঘুষি মেরে বাপী বলল, 'আলবৎ, কাল সবাই দেখবে খেলা কাকে বলে।'

সত্যিই পরের দিন শরৎশশী স্মৃতি কাপ ফাইনালের দর্শকরা দেখল খেলা কাকে বলে। কিশোর বাহিনী স্রেফ উড়ে গেল আমাদের সামনে। আমাদের সামনে না বলে বলা ভালো তপু আর বাপীর সামনে। তপু আর বাপীকে এত ভালো খেলতে আমরা কোনও দিন দেখিনি। ৮-০ গোলে জিতলাম আমরা। তপু একাই করল চারটে গোল, বাপী দুটো আর আর আমাদের আরেক ফরোয়ার্ড টুকাই করল একটা গোল। বাপীও হয়তো হ্যাটট্রিকটা পেয়ে যেত। খেলার শেষ মুহূর্তে একটা সুযোগও পেয়েছিল, কিন্তু কিশোর বাহিনীর এক স্টপার বাপী ধরার আগেই দুম্ করে নিজেদের জালে বলটা জড়িয়ে দিয়েছিল। নিজে হ্যাটট্রিক না করলেও তপুর হ্যাটট্রিকের পেছনে রয়েছে ওর বড় অবদান। বাপীর ডিফেন্স চেরা দুটো নিখুঁত থ্রু ধরে তপু ওর প্রথম আর তৃতীয় গোলদুটো করেছিল।

ফাইনালে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত। ওঁর ওপরেই ভার ছিল সেরা খেলোয়াড় নির্বাচনের। সেরা খেলোয়াড়ের প্রাইজমানি ছিল দু-হাজার টাকা। খেলার শেষে পুরস্কার তুলে দেবার আগে সুরজিৎ সেনগুপ্ত বললেন, 'আজকের খেলায় একজনকে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচন করলে আরেক জনের প্রতি খুবই অন্যায় করা হবে। তাই আমি মনে করি প্রাইজ মানিটা দু-জনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ হওয়া উচিত।'

সন্ধেবেলা ক্লাবঘরের ভেতরে দারুণ হই-চই হচ্ছে। ক্লাবঘরের পেছনে সামিয়ানা খাটিয়ে পোলাও, মাংস রান্না হচ্ছে। ঘরের মধ্যেও সবার মুখে আজকের খেলা নিয়ে আলোচনা। তপু আর বাপী নিজেদের মধ্যে খোস গল্পে ব্যস্ত। মাঝে-মধ্যে কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে চোখ ফেরাচ্ছে। বুঝতে পারছি দেবুদার জন্যই অপেক্ষা করছে। তারপরই আবার মুখ ঘুরিয়ে গল্পে মেতে উঠছে। গতকালের মেসি-রোনাল্ডোকে নিয়ে ঝগড়ার বিন্দুমাত্র রেশ নেই ওদের আজকের গল্পে।

কিছুক্ষণ পর আমি আর না বলে থাকতে পারলাম না, 'হ্যাঁ রে তপু-বাপী, তোরা কাল এত ঝগড়া করলি কেন? কোনও দিন তো মেসি-রোনাল্ডোকে নিয়ে তোরা এত তর্ক করিসনি?'

একটু লজ্জিত মুখে তপু বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি ওভাবে ঝগড়া করাটা কাল উচিত হয়নি। আসলে যখন দেবুদা বলল যে বাপী বলেছে মেসি হেড করতে ভয় পায়, ওর ডান পা-টা একেবারে অচল, তখনই তো মাথাটা গরম হয়ে গেল।'

অবাক হয়ে বাপী বলল, 'কি সর্বনাশ, আমি তো এরকম কথা দেবুদাকে কখনোই বলিনি। বরং দেবুদা আমাকে বলল যে তুই নাকি বলেছিস রোনাল্ডোর মধ্যে খেলোয়াড়ীসুলভ মনোভাব একদমই নেই।'

মাথা নাড়ল তপু, 'বিশ্বাস কর, আমি একথা বলিনি। উল্টে দেবুদা বলল—তুইও বাপীকে রোনাল্ডোর নেগেটিভ পয়েন্টগুলো মনে করিয়ে দে। পয়েন্টগুলো তো দেবুদাই বলেছিল।'

বাপী বলল, 'দেবুদা ওই কথাগুলো বলার পরেও কিন্তু আমার ঝগড়া করার ইচ্ছে হয়নি। কিন্তু দেবুদা বারবার খোঁচাতে লাগল—বলে, 'তুই যদি রোনাল্ডোর সত্যিকারের ভক্ত হোস তাহলে তোর প্রতিবাদ করা উচিত।'

তপু বলল, 'আরে, আমাকেও তো সমানে একই কথা বলে যাচ্ছিল। মেসির বিরুদ্ধে এসব বলা মানে মেসিকে অপমান করা। ফ্যানেরাই তো প্রোটেস্ট করবে।'

এবার হো-হো করে হেসে উঠলাম আমি। অবাক হয়ে দুই বন্ধু আমার দিকে তাকাতে আমি বললাম, 'তোদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এটা দেবুদার একটা চাল।' এই বলে আমি সেদিনের ঘটনাটা খুলে বললাম।

সব শুনে তপু আর বাপীও হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বাপী বলল, 'দাঁড়া, আসুক একবার দেবুদা। প্রশ্নটা যখন তুলেছে তখন দেবুদাকেই উত্তরটা বলতে হবে। দেবুদা এলেই ধরব। বলব—এবার বলো, কে বেটার প্লেয়ার, মেসি

না রোনাল্ডো?'

তপুও মাথা নেড়ে সায় দিল। ঠিক তখনই দরজা খুলে ঘরে ঢুকল দেবুদা। হই-হই করে উঠল তপু আর বাপী। এক সঙ্গে দু-জনে বলেউঠল, 'বলো দেবুদা, কে সেরা, মেসি না রোনাল্ডো?'

ভুরু কুঁচকে একবার দু-জনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেবুদা বলল, 'তপু, তুই গতকাল একবার বলেছিলি না মেসি নাকি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার। তোরা জেনে রাখ, মেসি বা রোনাল্ডো নয়, চিরশ্রেষ্ঠ ফুটবলার কিন্তু একজনই, তাঁর নাম দিয়েগো মারাদোনা।'

তপু-বাপী কিছু বলার আগেই পেছন থেকে গলা খাঁকারির শব্দ পেলাম। ঘাড় ঘোরাতে দেখলাম বড় চেয়ারটাতে বসে এদিকেই তাকিয়ে আছেন আমাদের ক্লাবের সভাপতি মনোতোষ চৌধুরী। বয়স আশির কাছাকাছি হলেও এখনও সুস্থ-সবল রয়েছেন। এক সময় কলকাতা ময়দানে বড় দলের হয়েও খেলেছেন। বিশেষ দিনগুলিতে ক্লাবে আসেন। আমরা সবাই ওঁর দিকে তাকাতে এক গাল হেসে বললেন, 'তুমি কথাটা কী বললে হে দেবু? মারাদোনা! আরে ধ্যুৎ, ফুটবলের সম্রাট একজনই। তার নাম পেলে। আমাদের কালো মাণিক পেলে।'

দ্রুতপায়ে পেছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। এখন চলবে পেলে-মারাদোনাকে নিয়ে চাপান উতোর। আমি বরং মাংস রান্নাটা কতদূর হল সেটা দেখি।

ছবি : সুদীপ্ত দত্ত

জেনে রাখা ভালো

বিমল দেব

'অপরাজিত' (১৯৫৬) চলচ্চিত্রে কিশোর অপুর চরিত্রে অভিনয় করেন স্মরণকুমার ঘোষাল। বালক অপুর ভূমিকায় ছিলেন পিনাকী সেনগুপ্ত। এর আগে 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫) ছবিতে অপু সেজেছিলেন সুবীর ব্যানার্জী। সব শেষে 'অপুর সংসার' (১৯৫৯) ছবিতে অপু সৌমিত্র।

জাদু বাস্তবতা

শান্তি সিংহ

জরতী নারীর কাছে হেসে আসে বৃষভবাহন
ছড়া কাটে মুখে মুখে, কথা ছোটে পঞ্চাশ কাহন।

হঠাৎ জ্যোৎস্নায় ফোটে নীল পদ্ম মানস সায়রে
মধুগন্ধে অলিকুল ছুটে যায়, থাকে নাকো ঘরে।

কোথা থেকে ঝরে গঙ্গা, জম্বুদ্বীপে ভাবে হনুমান
পঞ্চবটী বনপথে রামচন্দ্র হাতে ধনুর্বান।

সীতাদেবী গান গায় মধুকণ্ঠে, শোনে পশুপাখি
রাবণের ছদ্মবেশ খুলে যায়, অশ্রুসিক্ত আঁখি।

সোনার হরিণ নাচে ছন্দোময় দৃশ্য অপরূপ
লক্ষ্মণ গুণের ভাই স্কেচ করে নৃত্যময় রূপ।

উরুবিল্বে ধ্যানরত এক শিশু—কী যে তার নাম?
তথাগত সকৌতুকে নারদের করে গুণগান।

জাদুবাস্তবতা নামে এই সব আজো কত ঘটে—
কমলিনী পাকড়াশি মুখে হাসি —এ কল্পনা রূপ দেন পটে।

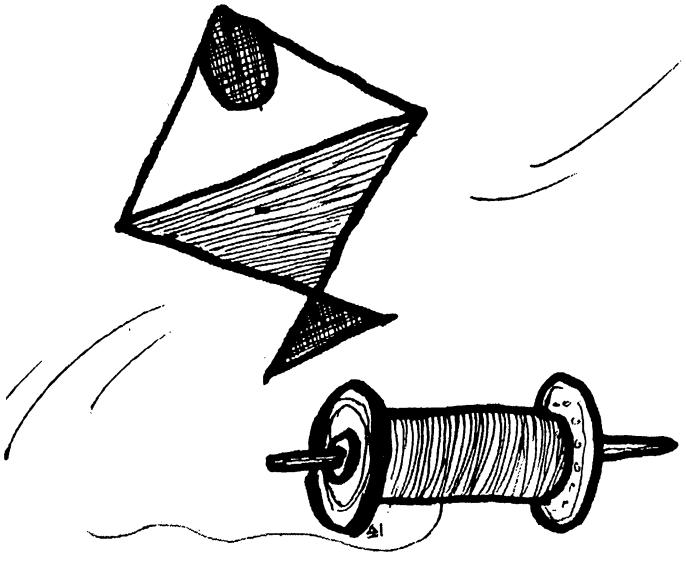

ছবি : রাহুল মজুমদার

নির্দোষ

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমরা যখন গল্প করো ছেলেবেলার কথা
আমরা তখন হিংসে করি জানো,
আবার ভাবি মিথ্যে সে সব
সবকিছু বানানো...!

তোমরা বলো—খেলার মাঠ, পুকুরপাড়, ব্যাঙ্গমা-ব্যঙ্গমী
আমরা তখন অবাক হই জানো,
আমরা ভাবি, কি জানি ভাই
সে কোন দেশের জমি...!

তোমরা বলো—এক্কাদোক্কা, লাট্টু, ঘুড়ি-লাটাই
আমরা তখন থমকে যাই জানো,
বুঝতে পারো, এসব খেলা
আজকে কেমন হারানো পুরানো...!

আমরা শুধু ছুটে মরি সূর্য্য থেকে চাঁদ
একটু এদিক ওদিক হলেই ভীষণ প্রতিবাদ
মানুষ নয় গড়ছো রোবট যে যার ইচ্ছেমতো
বয়েসকালে মেশিনটাকে সামলাতে পারবে তো?

আমরা তখন দমের পুতুল ইঁদুর-ছুট খেলা
তোমরা দেখে ঘাবড়ে যাবে জানো,
তোমরা আমার মধ্যে পাবে বিশাল রকম ফাঁক
দোষ দিও না, সে পৃথিবী তোমাদেরই বানানো!!

আঁকন বাঁকন

শৈলেনকুমার দত্ত

সকালে নদীর জলে কুঁজো বক তাকিয়ে থাকে
কীভাবে আকাশখানা ভোরে লাল আবির মাখে!
রঙীন ওই মাছরাঙাটি জলেতে যেই দিল ঝাঁপ
দু-ঠোঁটে চকচকে মাছ নিখুঁতই ছিল যে সাপ।
কোলাব্যাঙ হ্যাংলা ভীষণ তাকিয়ে দেখছে তাকে
ছোটো এক কাঠবেড়ালী কেবলই খুঁজছে মা-কে।
হাওয়া দেয় নদীর জলে কাঁপনে ফুটছে ছবি
সহসা থমকে দাঁড়ায় কোনও এক মুগ্ধ কবি!
শালিকের কিচির মিচির, টিয়ারা ডিগবাজি খায়
চড়াইয়ের ছোট্ট বাসা সকালেই দুলছে হাওয়ায়।
সাদা এক হামদো বেড়াল পাঁচিলে চুপটি বসে
থাবাতে নখগুলি তার কখনও নিচ্ছে ঘষে।
হাওয়াতে হাততালি দেয় কে কে তা শুনতে পারে?
সকালের রক্তজবা দেখে ঠিক হাতটা নাড়ে।
আকাশে দোয়েল পাখি সুমধুর কণ্ঠ ছড়ায়
এ হেন আঁকন বাঁকন কার না মনটা ভরায়!

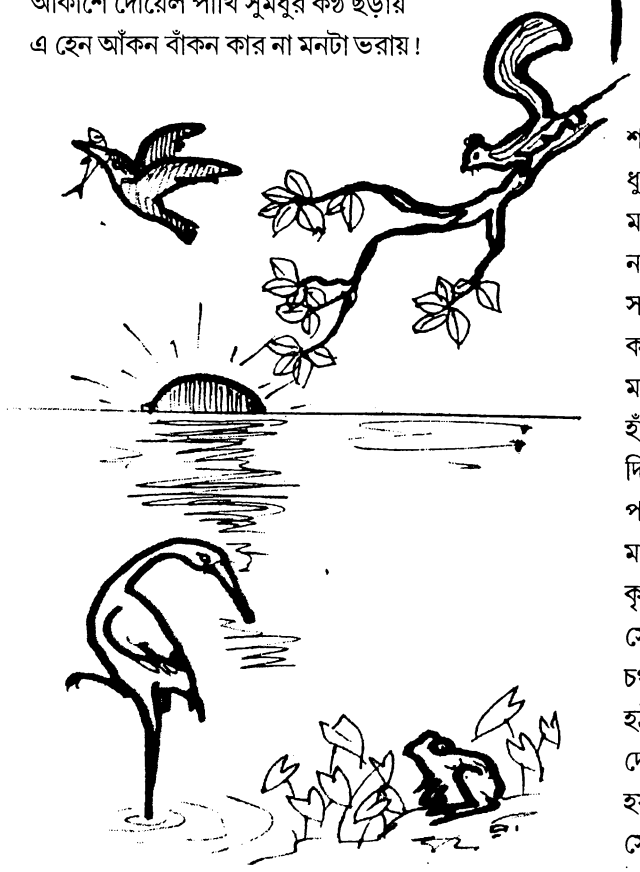

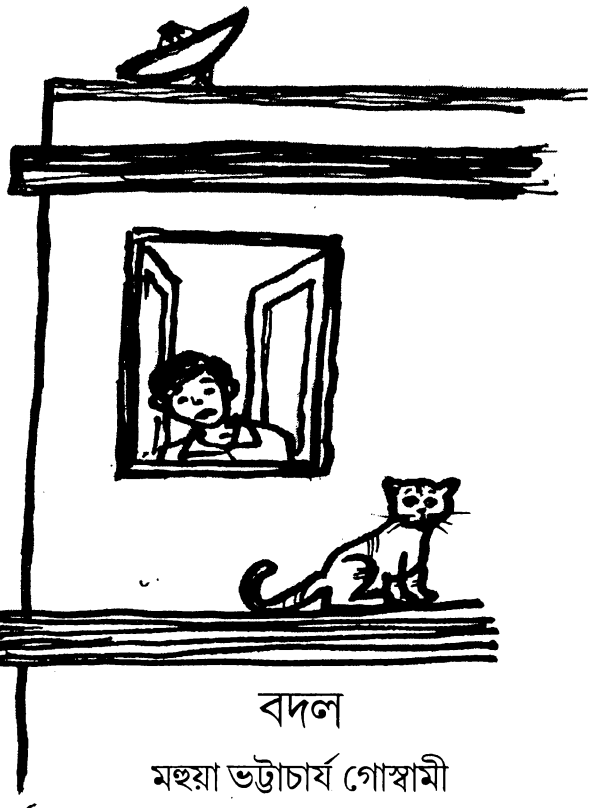

বদল

মহুয়া ভট্টাচার্য গোস্বামী

শহরতলির ফ্ল্যাটবাড়িতে যে ছেলেটার বাস
ধুলো-ধোঁয়ায় ভিড়ভাট্টায় কাটায় বারোমাস—
মায়ের কাছে রোজ রাতে সে গ্রামের কথা শোনে,
না-দেখা সেই গ্রামটি দেখার সাধ জাগে তার মনে।
সারাটা দিন ভাবে বসে সেই গাঁয়েরই ছবি—
কল্পনাতে দেখতে সে পায় পথ-নদী-মাঠ সবই।
মাটির দালান ঠিক পাশে তার ছাতিমগাছের তলে
হাঁসের সারি সার বেঁধে যায় শ্যামলাদিঘির জলে,
দিঘির বুকে শাপলা-শালুক ভাসছে শতদল,
পাড় জুড়ে তার নাম না-জানা জংলাফুলের দল।
মাথার ওপর মস্ত আকাশ, ব্যস্ত পাখির ঝাঁক
কৃষ্ণচূড়ায় লালচে রাঙা মেঠো পথের বাঁক।
সেই পথেরই বাঁকে বাঁকে ঘোরে সারাক্ষণ
চঞ্চলতায় উচ্ছলতায় ছোট্ট ছেলের মন।
হঠাৎ করে বায়না ধরে তাই সে মায়ের কাছে—
দেখতে যাবে স্বপ্নে-ঘেরা সে গ্রাম কোথায় আছে?
হয় যে অবাক ছোট্ট ছেলে শুনে মায়ের মুখে
সে গ্রাম নাকি ঘুমিয়ে আছে এই শহরের বুকে!

আয়রে পাখি লেজ ঝোলা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

মা বলল, 'তুই একটা বোকা।

দিদি বলল, 'হাঁদা কোথাকার।'

বাবা বলল, 'না না, একটু হাবলা গোছের।'

কেবল সুধাকাকু বলল, 'আমাদের খুকুমণি, সোনামণি, আলতাবাটি, চাঁদনি রাতের দুধ মাখানো তারা।'

তখন আমার বয়স কম। চাঁদ চিনেছি, তারা চিনেছি, ভালো করে চিনিনি বাবার ঘরে অনেক মোটা মোটা বই। সব বাঁধানো। হাত দেওয়া বারণ। কেবল বাবা হাত দেয়।

দিদির পড়ার টেবিলে অনেক বই। আমি জানি ওসব পড়ার বই।

মার কাছে কেবল রঙিন সুতো। ছুঁচ আর কাঁচি। সাদা কাপড়। মা খুব সুন্দর সেলাই করে। টেবিলের ঢাকনা, আলমারির ঢাকনা, বিছানার চাদর। কাছের দূরের সব লোক মায়ের হাতের কাজ খুব ভালোবাসে। তারা মাকে ফরমায়েশ করে। মা বানিয়ে দেয়। সে জন্য মা টাকা পয়সা নেয় কি না আমি জানি না।

বাবা উকিল। দুষ্টু বদমাইসদের যাতে ভারী সাজা হয় তা-ই জজসাহেবকে বোঝাবার কাজ করে। সহজ কাজ নয়। বাবার ওপর সবার খুব ভরসা আছে। সকাল বিকেল লোক আসে। বাবা তখন মোটা, বাঁধানো বইগুলো নামায়। পাতার পর পাতা পড়ে। তা থেকে কী জানি সব লেখে। আর আদালতে গিয়ে ঠিক বে-ঠিক লড়াইয়ে ঠিককে জিতিয়ে দেয়।

সুধাকাকুর কথা একটু বলি। সে আমাদের কাকু। বাবাদের গাঁয়ের বাড়িতে থাকে। গাঁয়ের ঘরদোর বাগান দেখাশোনা করে। একটু-আধটু জমিজমা আছে, ধান আনাজ হয়। গাছের নারকোল, ডাব —সব বেচে। যা পয়সাকড়ি হয় তা দিয়ে ঘরদোর সারায়। পুকুর সাফাই করে। সেখানে মাছের চাষ করে। আর আমাকে খুব ভালোবাসে।

ঘরে একটা পাখি ঢুকে পড়েছিল। সকালে সে বাথরুমে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছিল। একটুখানি বাইরে তাকিয়েছে- কি— তাকায়নি, অমনি দেখে একটা হলুদে সবুজে মেশানো লেজঝোলা পাখি ফুড়ুৎ করে ঘরে ঢুকে গেল। দাঁত মাজা তাড়াতাড়ি সেরে সে ছুটল পিছন পিছন। পাখি ধরতে। না, না। তাহলে কী করতে? আরে সেটাই তো বলা হল না। বলতে গিয়েও বলা হল না। সকলে মিলে তাকে নিয়ে

হাসাহাসি শুরু করল। কেবল সুধাকাকু তাকে আদর করে কত ভালো ভালো কথা বলল। আর অমনি সবাই বলে উঠল, 'হয়ে গেল, আজকের মতো পড়াশুনা সব ডকে উঠল।'

আহা! তা নয় একটু উঠলই। সুধাকাকু তো আর রোজ আসছে না! বছরে একবার। যে কদিন থাকে সে কদিনই তার ভালো লাগে। তো তাকে জানতে চাইলুম, 'পাখিটা'?

'পাখি গো, ফিঙে পাখি পড়নি—আয়রে পাখি লেজ ঝোলা/ তোর সাথে করি খেলা!'

'ও ফিঙে কোথায় গেল। একটুখানি দেখা দিয়ে কোথায় লুকোল?'

'ঘরে তো নেই। তাহলে কোথায় গেল?'

'মনে হয় বাগানে।'

'বাগানে কোথায়?'

'কোথায় আবার, গাছে!'

'কোন গাছে?'

'শিউলি গাছে। চল চল চল। দেখে আসি।'

মা ডাকল, বাবা ডাকল, দিদি ডাকল, 'পড়বি আয় সোনা। কেবল ফাঁকবাজি! ও সুধা, কেন গো ওকে পাগল করছ?'

সুধাকাকু বলে, 'পাগল না হলে ও মানুষ হবে কী করে? সামনে শরৎ। পুজোর কাজে এখন থেকে লেগে পড়তে হবে কি না?'

'সে কী? এখনও পুজোর ছুটি শুরুই হল না।'

'হল না তো কী? আমাদের খুকুর জন্যে পুজোর বাজনা বেজে গেছে।'

আমি তখন শিউলি গাছের আড়ে পাখিটাকে দেখছি। দারুণ মিঠে, দারুণ পাখি!

আমি ডাকছি, 'আয় রে পাখি লেজ ঝোলা।' সে লেজ ঝুলিয়ে বসে থাকে। কাছে আসে না। আমার খারাপ লাগে। সুধাকাকু তখনও বোঝায়, 'তোমাকে নিতেই তো এসেছে।'

'নিয়ে কোথায় যাবে?'

'ওই যে পুজোর মাঠে—ভুবনডাঙায়। যাবে না?'

'যাব তো। যাবই। আমি শুধু যাই একটিবার...। তবু যাব কী করে?'

'কেন?'

'এখনও ছুটি হয়নি যে!'

'না হোক, তবু যেতে হবে।'

তখন ভাবি এমন করে কেবল সুধাকাকুই বলতে পারে। অথচ সবাই তো তাকে ভালোবাসে। মজা করে ওসব কথা বলে। সে জানে। এটাও জানে যে এখন পাখি পাখি করলে চলবে না। সেটা সুধাকাকুও চোখটিপে বোঝাবার চেষ্টা করে।

পাখি ছেড়ে আমি পড়তে বসি। পড়তে পড়তে বইখাতা আর রঙিন সব মোমকাঠিগুলোর ওপর চোখ বোলোতে বোলাতে আবার নিজেকে হারাই। দেখি একটা কাঁচাপাকা চুলওয়ালা লোক ঢাক কাঁধে করে আলপথে হেঁটে চলেছে। তার ঢাকটায় আবার পালকের ঝাড়ন। তার সঙ্গে কাঁসি বাজাতে বাজাতে চলেছে তার কেউ। তাকে চিনি না। তাদের কাউকে চিনি না। তবু কত যেন চেনা।

আর ওই যে কাশফুল। হাওয়ায় দুলছে। মাথার ওপর নীল একটা গোলক। তার কোলে ভাসছে সাদা মেঘের টুকরো।

আমি সব ফেলে বাবা-মা-দিদি-সুধাকাকুকে ফেলে পড়াশুনো ফেলে ছুটে চলেছি। ঘুরপাক খেয়ে খুশি। আমি যা চাই তা যেন এখন ঘুড়ি হয়ে আকাশে উড়ছে। আর একটা চিল। মনে পড়ছে একটা-দুটো মুখের কথা। গভীর কাজল- কালো চোখ, জটপড়া একরাশ চুলের বোঝা। একটু একটু দেখতে দেখতে আবছা হয়ে হারিয়ে গেল। একটা বইয়ের ভেতর মুখ লুকোল ওরা। আমার পাশ করার খুশিতে বইটা বাবা আমায় উপহার দিয়েছিল।

এবার যেন কানে লাগছে। কান ধরে আলতো করে মা টানছে। দিদি-বাবা ঝুঁকে তাকিয়ে আছে, 'এই তো ঘুম থেকে উঠলি খুকি! এর মাঝখানে আবার ঘুম? কী ঘুমেই না পেয়েছে। বাপ্‌রে বাপ্। আসলে না পড়ার তাল।'

কেবল সুধাকাকু বলল, 'ঘুমোয়নি। ঘুমুবে কেন? ও তো ঘুমপরীদের দেশে একটু উঁকি মেরে এল। কী বল খুকি?

আমি অবাক হই। সুধাকাকু কী করে এসব জানতে পারল। কই, ওরা তো বুঝতেও পরল না? ওরা তো কেবল আমার ঘুমটাই দেখল।

সুধাকাকু সব গুছিয়ে দিল। মা স্নান করিয়ে দিল, দিদি পোশাক পরাল। বাবা কেবল বেরোনোর আগে একটা হামি খেল। আমাদের দরজায় গাড়ি এসে দাঁড়াল। আমি এবার পড়তে যাব। যেতে হবে দশ মিনিট। তারপর সেই পড়ার বাড়ি।

সেখানে গেলেই পড়তে হয়। উঁচু টেবিলে বই রেখে নীচের সিটে বসতে হয়। গোলমাল করলেই নানা রকমের গোলমেলে ঘটনা ঘটে। সে এসব করে না। তবে পাশে যে বসে অনেকসময় সে কিছু করলে তার দায় তার ঘাড়ে পড়ে।

সেদিন কেবল কানমলা খেতে হয়েছিল। আর একদিন হাঁটুমুড়ে মেঝেতে বসতে হয়েছিল।

পড়ার বাড়ির দোরগোড়ায় আমি। অমনি দেখি সেই পাখিটা উঁকি মেরে কী যেন বলছে। কান পেতে শুনি সে বলছে, 'পড়ে নাও মন দিয়ে। এখন থেকে রোজ তোমার কাছে আসব। আর ঘরে ঢুকে তোমার ভালোবাসার সবকিছু ছুঁয়ে যাব। শেষে গিয়ে বসব শিউলির ডালে। আর তোমার চোখে এমন রঙিন কাজল পরিয়ে দেব যে রোজ রাতে একটা করে দেশে বেড়াতে যাবে। কেমন?' বলে সে উড়ে গেল।

আমি খেয়াল করিনি। এবার দেখলুম পড়ার বাড়ির মাসির পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুটো ছেলে-মেয়ে। ছেলেটা ছোট। মেয়েটা বড়ো। মন ভারী খারাপ হল ওদের দেখে। অতি সাধারণ জামাকাপড়। কাল রাতে ওদের দেখেছি ঘুমে। ভালো করে বোঝার আগে ওরা হারিয়ে গেছে।

মাসিকে বড় দিদিমণি বলছে, 'না না। পুজোর বোনাস দিয়েছি। আবার ছেলেমেয়েকে নতুন জামাকাপড় দিতে পারব না। তুমি কিছু মনে কোরো না বাপু।'

মাসি কোনও কথা বলল না। তবে চুপচাপ চলে গেল। একটু পরে আমি ইশারায় মাসিকে ডাকলুম, 'তুমি আমাদের বাড়ি চেন?'

'হ্যাঁ, চিনি। একবার একটা চিঠি সই করাতে গিয়েছিলুম।'

'কাল এসো। আমি মা বাবাকে বলে রাখব।'

বাড়ি ফিরেই বলেছি সব কথা। মা-বাবা-দিদি এবার আর বোকা, হাঁদা বলেনি আমাকে। সুধাকাকুও হাবলা বলেনি। কেবল মিটিমিটি হেসেছে। বলেছে, 'সোনামণিটা কত চওড়া বুকের মানুষ বল তো!'

জানি না লেজঝোলা কাল এসে সব জেনে কী বলবে।

ছবি : নীতিশ মুখোপাধ্যায়

লোলো ডাকাত

সঞ্জয় সাহানা

যতদূর চোখ যায় সবুজ আর সবুজ। চা গাছগুলো এক সমতলে ছাঁটা। একে অন্যের গায়ে ঠাসা। দেখে মনে হয় নরম সবুজ গালচে, তার উপরে গড়াগড়ি দিলে বেশ লাগবে।

আঁকাবাঁকা রাস্তা চলে গেছে বাগানের বুক চিরে। বৃত্তের মতো সে রাস্তা আবার একই জায়গায় মিশেছে। হানাপাড়া চা-বাগান। দশ হাজার বিঘে তার আয়তন। ডুয়ার্সের পুরোনো বাগানগুলোর মধ্যে একটা। খুব ভালো চা তৈরি করে। বিদেশে রপ্তানি করে। ম্যানেজার ফ্রান্সিস এলেক্স। বিলেতি নয় একদম দেশজ। গায়ের রং তামাটে। চোখে চশমা, চওড়া গোঁফ, ছ-ফুট লম্বা। টি শার্টের ভিতর থেকে ফুঁড়ে বেরিয়েছে একটা কুমড়োর মতো ভুঁড়ি। খুব রাশভারী। এলেক্সের সঙ্গেই দেখা করতে চলেছে সুব্রত দত্ত। সবে মোহনপুর থেকে পাস করে যোগ দিয়েছে কোম্পানিতে। এই প্রথম এতবড়ো একজন ম্যানেজারের সঙ্গে মিটিং করতে চলেছে। তাই চাপা উত্তেজনা। বাগানে কাজ করছে অনেক লোক। সুব্রত রাস্তা জেনে জেনে চলেছে। একটা জায়গায় এসে ব্রেক কষে থামাল গাড়িটাকে। সামনে নদী। এক ফোঁটা জল নেই তাতে। কিন্তু নদীর বুক দিয়ে চালাতে গিয়ে গাড়ির চাকা বসে যাবে না তো?

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই একজন হাফ প্যান্ট পরা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের সাথে দেখা। উনি বললেন, চিন্তার কিছু নেই। শয়ে শয়ে গাড়ি যাচ্ছে। শুধু ভুটানের পাহাড়ে বৃষ্টি হলে এই নদী মুহূর্তের মধ্যে ভরে ওঠে। আবার শুকিয়েও যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই।

সুব্রত বাঁদিকে তাকিয়ে দেখল ভুটানের পাহাড়। বিকালের মিঠে আলোয় কী মনোরম! আটকে গেল চোখ। গড়িয়ে গেল কিছুটা সময়।

খেয়াল হতেই আবার গাড়িটা স্টার্ট দিল সে।

অফিস ও চা তৈরির ফ্যাক্টরি একসঙ্গে। ঢোকার মুখে চেক পোস্ট। সুব্রত তার ভিজিটিং কার্ড দিল। ওয়াকি টকিতে এল সাহেবের নির্দেশ।

এলেক্সের চেম্বার বিশ ফুট বাই বিশ ফুট। কাচের পরিষ্কার টেবিলে টুকটুকে লাল ফুল। দেয়াল আলমারিতে সার সার বই। সুব্রত মনে মনে ভাবল—সাজানো আছে, পড়ে কি?

প্ল্যান্ট প্যাথোলজি সুব্রতর প্রিয় বিষয়। তার উপর গতকাল রাত দুটো পর্যন্ত হোম ওয়ার্ক করেছে এই মিটিংটার জন্য।

প্রথমে সৌজন্য বিনিময়। তারপর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা। মিনিট পনেরো আলোচনার পর মিস্টার এলেক্স বললেন, 'মিস্টার ডাট্, লেটস্ গো টু দ্য ফিল্ড।'

তারপর যা হল তা সুব্রত কল্পনাও করতে পারেনি। একজন এগ্রিকালচার না-পড়া মানুষ এত গভীরে জানতে পারে গাছকে! পোকাকে!

শেখাতে এসেছিল। শিখে ফিরছে সুব্রত। ম্যানেজারের বাংলোয় চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে খেয়াল হল রাত আটটা বেজে গেছে। রওনা হল সে। ভুটানের পাহাড়ের মাথায় বিদ্যুতের চমক। গতি বাড়াল গাড়ির।

মিনিট দশেক পরে এল সেই নদী। জানাই আছে সমস্যা নেই। বালি। তাই গাড়িকে সেকেন্ড গিয়ারে রেখে নামল নদীর বুকে। কিন্তু এবার যেন অন্যরকম লাগছে সুব্রতর। বালির উপর অল্প অল্প জল। গাড়ি চলার স্বাভাবিক রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে না। একটা জায়গায় গিয়ে স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। আবার স্টার্ট দিয়ে খুব চেষ্টা করল। এক ইঞ্চিও এগোল না গাড়ি। এদিকে হু-হু করে জল বাড়ছে নদীতে। অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজারের কথাটা মনে পড়ে গেল সুব্রতর। ল্যাপটপটা পিঠে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সে। হাঁটু সমান জল। ছপাক্ ছপাক্ করে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে থাকল। ধীরে ধীরে জল কোমর ছুঁয়ে ফেলল। কোনও রকমে পাড়ে এল সুব্রত। খুব বেঁচে গেছে। সে তো সাঁতার জানে না। আর একটু দেরি হলেই—

অমাবস্যার রাত। ঘন অন্ধকার। নিজের হাত-পা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। জল নাকি একটু পরেই নেমে যায়। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কী হবে ভাবলে খুব কষ্ট হচ্ছে। তাই আকাশের তারা দেখে সময় কাটছে। বসে বসে কোমরে ব্যথা করতে লাগল। কত সময় কেটে গেছে কে জানে! হয়তো দু-ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা। জল বোঝার জন্য সুব্রত আস্তে আস্তে নামতে থাকল নদীর বুকে। মাত্র জুতো ভেজা জল। গ্রেট! আনন্দে লাফিয়ে সে। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে পেল তার গাড়িটা।

ইস। জল-কাদা-বালিতে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে সেটা। বহু কষ্টেও স্টার্ট নিল না। এবার কী উপায়? ভাবছে—ঘামছে সুব্রত।

'কেউ আছ...! কেউ আছ!'

কোনও সাড়া নেই। ভাবল বসে থেকে লাভ নেই। রাস্তা ধরে হেঁটে যাই। এক সময় তো হাইওয়েতে পৌঁছব।

হাঁটতে থাকল সে। কয়েকবার নালায় পড়ে গেল। পায়ে মোচড় লাগল। আবার উঠে হাঁটতে লাগল। খিদেও পেয়েছে খুব। কোনও খাবার নেই সাথে। ব্যাগের সাইড পকেটে ছিল জলের বোতল। সেটা বের করে জল খেল।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর আবার নদীর পাড়ে এসে হাজির হল। কান্না পেয়ে গেল তার। সব চেষ্টা বৃথা। নামিয়ে রাখল ব্যাগ। জামাটা খুলে মাটিতে বিছিয়ে শুয়ে পড়ল তার উপর।। ক্লান্তিতে চোখ বুজে এল।

প্রচণ্ড শব্দ। তীব্র আলো। কারা যেন আসছে। দুটো পালকি। পিছনে ব্যান্ড বাজাচ্ছে একদল। সামনে লাঠি হাতে জনা দশেক ষণ্ডামার্কা লোক।

সামনের পালকিতে একটি বছর দশেকের ছেলে। কী সুন্দর তার চেহারা। থাক কাটা চুল, আপেলের মতো গায়ের রং। জমিদারি পোশাক। গয়না।

পিছনের পালকিতে বছর পঞ্চাশের এক ভদ্রলোক। বেশ গণ্যমান্য কোনও জমিদার বলেই মানায়। পালকির গায়ে লেখা —জমিদার সূর্যকান্ত শর্মা।

নদীবাঁধের কাছাকাছি আসতেই ঝোপের ভিতর থেকে সাঁ করে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এল গেঁটে বাঁশের টুকরো। পালকির সামনে ষণ্ডামার্কা লোকগুলো হোঁচট খেয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের আড়াল থেকে 'রে-রে' করে বেরিয়ে এল জনা কুড়ি লোক। পাকানো গোঁফ, লোমশ বুক, ফুলে ওঠা হাতের পেশি। হাতে বল্লম, টাঙ্গি, তলোয়ার ...দেখলেই রক্ত হিম হয়ে যায়।

ব্যান্ড পার্টির লোকেরা বিপদ দেখেই চম্পট দিয়েছে। বেহারাগুলো পড়েছে বিপদে। ঘাড়ে মালিক, সামনে মৃত্যু। তাদের পা কাঁপছে।

একজন তো মাথা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে। হড়কে

গেল পালকি। বাকিরাও তখন দে ছুট—ওরে পালা, লোলো ডাকাত!

জমিদার পালকি থেকে নেমে নিজের গয়নাগাটি খুলল। ছেলেটির গা থেকেও খুলে নিল সব। একটা রুমালে বেঁধে লোলো ডাকাতের হাতে দিল। হাত ধরে বলল, 'সব নাও, শুধু আমার ছেলের গায়ে হাত দিও না বাবা।' অবাক করে লোলো ডাকাত ছুঁড়ে ফেলে দিল গয়না বাঁধা রুমাল। লাথি মেরে সরিয়ে দিল জমিদারকে। এগিয়ে গেল সামনের পালকিটার দিকে। সেখানে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে ছোট্ট ছেলেটা। 'বা-বা-' বলে শেষ শব্দ করে চুপ হয়ে গেল ছেলেটা।

চোখে আলো পড়তেই ধড়ফড় করে উঠে বসল সুব্রত। চোখের জল মুছে সে হাতড়াতে থাকল ঝোপের এধার ওধার।

একটি বুড়ো লোক তাকে ডাকে, 'বাবু, কিসু খুঁজতাসেন?'

'কাল রাতে এখানে একটা ভয়ংকর ডাকাতি হয়েছে।'

'কী বোলতাসেন বাবু! একেনে গত দশ বসরে একটা চুরিও হয় নাই। ডাকাতি হব ক্যামনে?'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি। লোলো ডাকাত জমিদারের ছেলেকে আছড়ে মারল এই ঝোপের ধারে। এখানে...এই এখানে!'

'ওহ্, বুঝতাসি। আপুনি হপোন দ্যাকসেন। ওটা হইসিল। তবে কাল নয়। তা একশত বিশ বসর আগে। আমাগো টাকুর্দার আমলে। ওই জমিদারের ভাই এটা করাইসিল। নিজের সেলেরে জমিদার করনের লাইগ্যা লোলো ডাকাতেরে লাগাইসিল।'

'কী বলছেন? কাল নয়? অত দিন আগে!'

'আইজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর ওই জমিদার পুরা জায়গা ইংরেজ সাহেবদের জলের দরে দিই দেয়। তেনারাই এই বাগান বনাইসিলেন। নারায়ণগুড়ির নাম হইসিল 'হানাপাড়া চা-বাগান।'

ম্যানেজারের কাছে খবর যেতেই নিজের গাড়ি পাঠিয়ে সুব্রতকে নিয়ে যান বাংলোতে। মিস্ত্রি পাঠিয়ে গাড়ি ঠিক করিয়ে আনেন। লাঞ্চ করিয়ে তবে ছাড়েন।

সুব্রত দুপুরের ঝকঝকে আলোয় গাড়ি চালিয়ে ফিরছে। নদী পেরোল। ঝোপটা পার হতেই একরাশ হাওয়া কানে এসে বিঁধল—'বা...বা...বা...বা...।'

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

With best Compliments from :

A
WELL
WISHER

কাকস্য পরিবেদনা

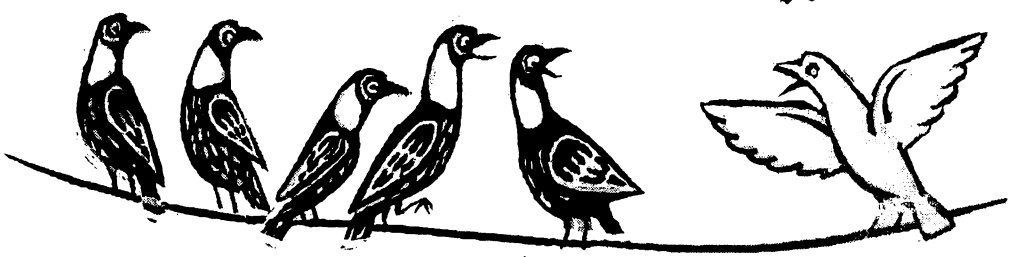

তাপস মৌলিক

গরমের ছুটিতে মামার বাড়ি গেছি। সকালবেলা কাপড় কাচার জন্য এক বালতি জলে সার্ফ এক্সেল গুলে ছোটমামি বারান্দায় রেখেছে। এমন সময় কার্নিস থেকে পা পিছলে একটা কাক ঝুপ্পুস করে বালতির জলে পড়ে গেল। ঝটাপটি করে যখন সে উঠল তখন সে ধবধবে সাদা।

ফের কার্নিসে উঠে কিছুক্ষণ সে নিজের দিকেই ভোম্বল হয়ে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে উড়ে চলল নিজের পাড়ার দিকে।

পাড়ার মোড়ের মাথায় পাঁচ-ছটা কাক ইলেক্‌ট্রিকের তারে বসে আড্ডা মারছিল। ওকে দেখে তারা বলে উঠল, 'তুই কে রে? এখানে কী চাই?'

ও অবাক হয়ে বলল, 'সে কী! আমি তো কাগা। আমায় চিনতে পারছ না?'

শুনে কাকগুলো প্রায় মারতে আসে। 'তবে রে? কোথাকার একটা বেঁটে বক এসে বলছে আমি কাগা। আমাদের কাগা বলে কী সুন্দর কুচকুচে কালো! ভাগ্ শিগ্‌গির বলছি এখান থেকে। ফের বে-পাড়ায় ঢুকতে এলে মেরে ডানা খোঁড়া করে দেব।'

কাগা তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসে হাইওয়ের ধারে একটা ল্যাম্পপোস্টের ওপর বসল। তার খুব দুঃখ হল। তাকে ওরা চিনতে পারল না? বক ভাবল? তবে কি সে সত্যি বক হয়ে গেল?

হাইওয়ের দু-ধারে ধানক্ষেত। দূরে দেখা যাচ্ছে দেকুলের বিল। সেখানে অনেক বক চরছে। কাগা ভাবল তবে বকেদের দলে ভিড়ে গেলেই হয়। সে উড়ে গিয়ে বিলের ধারে একটা ঠ্যাং তুলে বসল।

কাছেই একটা বক চরছিল। ওকে দেখে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কে?'

কাগা বলল, 'আমি বগা।'

বকটা বলল, 'এররুম চেহারা করলি কী করে? খেতে পাসনি নাকি?'

কাগা বানিয়ে বানিয়ে বলল, 'অনেক দূর থেকে আসছি। পথে একটাও বিল পড়েনি। বড্ড খিদে।'

বকটা বলল, 'আহা রে, বেচারা। এই নে, একটা মাছ খা।' বলে কাগার দিকে একটা মাছ ছুঁড়ে দিল।

কাগা আর কী করে। ডান পা-টা ব্যথা হয়ে হয়ে গেছিল। তাই বাঁ-পা নামিয়ে ডান পা তুলে মাছটায় ঠোক্কর দিল। খিদেও পেয়েছিল একটু।

তবু ভালো যে বকেরা ওকে সন্দেহ করেনি। এই বকটা তো খুব ভালো। কাগার সঙ্গে আরও অনেক গল্প করল। কাগাও বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলল। বলল তার বাবা-মা জাপানে ছিল, তাই সে বনসাই হয়ে গেছে।

বকটা কিছু সন্দেহ করল না। কাগাকে আরও দু-তিনটে মাছ ধরে দিল। বলল, 'আহা, তুই ক্লান্ত, আজ আর তোকে কষ্ট করে মাছ ধরতে হবে না। কাল থেকে ধরবি।'

কাগার এদিকে চিন্তা সে বাড়ি ফিরবে কী করে! এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো পা ব্যথা হয়ে গেল। ওদিকে মা চিন্তা করছে।

সন্ধ্যে হল। কাগা দেখল তার ডানাগুলো আর অত সাদা লাগছে না। তারপর যখন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে গেল, কাগা দেখল তার গা একদম আগের মতো কালো। কাগা নির্ভয়ে বাড়ি ফিরে চলল।

বাড়ি ঢুকতেই মা একেবারে কা-কা করে উঠল। 'এই যে, এতক্ষণে বাবুর বাড়ি ফেরার সময় হল। বলি কোথায় টহল দিচ্ছিলি সারাদিন?'

কাগা বুঝল মা কিছু ধরতে পারেনি। সে কথা না বাড়িয়ে

চুপচাপ নিজের খুপরিতে ঢুকে শুয়ে পড়ল।

তুমি জিজ্ঞেস করতে পার, এত কথা আমি জানলাম কী করে? তা আমার মামার বাড়ির কাক। আমি জানব না তো কি তুমি জানবে?

যাইহোক, কাগা তো শুয়ে শুয়ে খালি ভাবছে, কাল সকালে কী হবে! আলো ফুটলেই তো সব ধরা পড়ে যাবে। তখন একটা মহা গণ্ডগোল হবে। কতকিছু কৈফিয়ত দিতে হবে তাকে। বাবার যা রাগ, হয়তো তখনই ত্যাজ্যপুত্র করে দেবে।

সাদা রং নিয়ে কী করে আর সমাজে সে গা দেখাবে। অন্ধকার থাকতেই তাই কাগা ফের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। এসে বসল বিলের ধারে।

আলো ফুটতে কালকের বকটা এল। বলল, 'কী রে, মুখ গোমড়া কেন?'

'আর বোলো না ভাই। ভীষণ সমস্যা।'

'আবার কী সমস্যা? জেলেরা মাছ ধরতে আসছে।'

কাগা ভাবল বকটা তো বন্ধু হয়ে গেছে। একে সবকিছু খুলে বলা যায়। বক মন দিয়ে সব শুনল। শুনে বলল, 'হুম্‌ম্‌। সমস্যাই বটে। তুই এক কাজ কর, ঘুঘুর কাছে যা। ওর পেটে যা বুদ্ধি।'

কাগা চুপিচুপি উড়ে এসে ঘুঘুর বাসায় হাজির হল। ঘুঘু তখন হিসেব লেখার খাতার নতুন পাতায় মার্জিন টানছিল। সব শুনে বলল, 'হু, বুঝলাম। বুদ্ধি তো দেব, কী দিবি?'

কাগা কত কিছু অফার করল, ঘুঘুর কিছুতেই মন ওঠে না। শেষে গত বছর দোলের মেলায় বাবার কিনে দেওয়া দশ টাকা থেকে একশো টাকা বানানোর ম্যাজিকটা দিয়ে দেবে বলায় রাজি হল। বলল, 'দাঁড়া, একটু ভাবতে দে।'

কিছুক্ষণ পেট চুলকে ঘুঘু জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোরা হিন্দু না মুসলিম?'

কাগা বলল, 'আমাদের ওসব হিন্দু মুসলিম নেই, সবাই কাক।'

ঘুঘু বলল, 'ঠিক আছে, একটা আইডিয়া বেরিয়েছে। তুই বাবুইয়ের কাছে গিয়ে একটা বোরখা বানিয়ে বানিয়ে নে। বোরখা পরে থাকবি।'

কাগা বলল, 'ধ্যাৎ, আমি বোরখা পরব কেন? আমি তো ছেলে।'

'তাহলে কোনও সী বিচে চলে যা। দেহ মেলে শুয়ে থাকবি। দেখবি ফের কালো হয়ে যাবি।'

'সী বিচ কোথায় পাব?'

'কেন? তোর বন্ধু বককে জিজ্ঞেস কর। বকখালি তো আছেই। ওখানে খালি বক আর বক। তারা কেউ সন্দেহও করবে না। কাছেই কাকদ্বীপ আছে। মাঝে মাঝে সেখানে উড়ে এস যাচাই করে যাবি পুরো কাক হলি কি না।'

'বকখালি কতদূর? মর্নিং ফ্লাইটে, মানে সকালে উড়ে গিয়ে সন্ধেবেলা ফিরে আসা যাবে?'

'ধুর বোকা। একদিনে কী হবে? কালো হতে হলে মাসখানেক ওখানে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে হবে।'

'তাহলে তো হবে না। মা চিন্তা করবে। পুলিশে ডাইরি করবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে নিরুদ্দেশ বলে। স্কুলে নাম কেটে দেবে।'

'ধুর! কোনও কিছুই তো দেখছি তোর পছন্দ নয়। তাহলে এক কাজ কর। কথায় বলে বিষে বিষে বিষক্ষয়। আবার যা সেই বাড়িতে। সেই বালতিতে আবার একটা ডুব দিয়ে আয়। সাদা রংটা ধুয়ে যদি আবার কালো বেরোয়!'

কাগার এই আইডিয়াটা মন্দ লাগল না।

ছোটমাসি সেদিন কাপড়ে দেবে বলে বালতিতে নীল গুলেছিল। কাগা এসে ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেখানে। ঝটাপটি করে উঠল যখন তখন সে পুরো নীল। প্রায় ময়ূরকণ্ঠী রং বলা যায়।

কিছুক্ষণ কার্নিসে গা শুকিয়ে কাগা ফের গেল ঘুঘুর বাসায়। ঘুঘু দেখে বলল, 'বাঃ, অনেকটা হয়েছে। আজকের দিনটা পায়রাদের সঙ্গে কাটা। কাল সকালে ফের ডুব দিবি।'

ছোটমামা আমাকে দশটা জলরঙের শিশি কিনে দিয়েছিল। পরদিন সকালে ছোটমামি জলভরা বালতিটা বারান্দায় রাখতেই আমি কালো রঙের শিশিটা থেকে পুরোটা রং জলে জলে ঢেলে ভালো করে গুলে দিলাম।

একটু পরেই কাগা এসে ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল বালতিতে। উঠল যখন তখন সে কুচকুচে কালো।

ডানাটানা ঝাপটে কাগা সোজা উড়ে গিয়ে বসল মোড়ের মাথায় ইলেকট্রিকের তারে। একটা কাক ওকে দেখে বলল, 'কী রে কাগা, দু-দিন দেখিনি যে? কোথায় ছিলি?'

গরমের ছুটির শেষে মামাবাড়ি থেকে চলে এলাম। ইস্কুল খুলে গেল। তার প্রায় মাসখানেক পরে বর্ষা এল। বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির জলে কাগার কী হল সেটা এখনও জানি না। পুজোর ছুটিতে আবার মামাবাড়ি গেলে জানতে পারব।

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রকৃতি পড়ুয়াদের সঙ্গে দিনভর দাবুতে

জীবন সর্দার

দাবু যাবার আবদার ছিল প্রকৃতি পড়ুয়াদের। তারা উঁচু ক্লাসে উঠেছে।

দাবু মাতলা নদীর ধারে। বন বিভাগ, নাকি সেচ বিভাগ সুন্দর একটি অবসর কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টায় ছিল সেখানে তখন। একটা নিকাশি খাল ধীর গতিতে মাতলায় মিলেছে দাবুর পাশ দিয়ে। এই সবকিছু মিলে দাবুর আদল। খালের শেষ মাথায় সোনাঝুরি গাছের ফিকে ছায়ায় আমরা দম নিতে বসলাম। আমাদের ধারেকাছে কোনও সচল প্রাণী দেখলাম না। নদীর দিকে তাকিয়ে বসে থাকা ছাড়া আমাদের যেন আর কোনও কাজ নেই। তখন হঠাৎ মনকে ডাক দিল, 'হেই-রে প্রকৃতি পড়ুয়া বসে থেকে করছটা কী? ওঠো, চারধার দ্যাখো।'

উঠিনি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম পাশে তওফিক নেই। খালের ধারে একটা নৌকোর পাশে দাঁড়িয়ে। হাতে নোটবই, পেনসিল। কিছু লেখা-আঁকার রসদ পেয়েছে নাকি? জাহানারা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'নদীর ধারে শামুক-ঝিনুকের খোঁজ নিয়ে আসি।'

সে চলে গেল, সঙ্গে গেল টুয়া। আসলে ওরা গেল গ্রামের মেয়েদের চিংড়ির মিন ধরা দেখতে। বুঝে নিয়েছি শাহেদ আর রিয়া দূরবিনে চোখ রেখে নদীর বুকে পাখির খোঁজে পাথর হয়ে রয়েছে। আমি তবে কী করি?

খালের ধার দিয়ে পাকা পথ—যেপথে এসেছি। কাউকে কিছু না বলে ওই পথ ধরলাম। হঠাৎ কিছু দেখার আশায় কিছুটা হেঁটে, আর কিছু না, একটা বকের দেখা পেলাম। মেছোবক, নাকি কোঁচবক। ভালোভাবে দেখার আশায় একটু এগোলাম তার দিকে। অমনি সে বকটা 'কোয়াক-কোয়াক' করে ডেকে ডানা মেলে দিল। কী সাদা রঙের ঝলকানি! যখন বসেছিল, মাটির রঙের সাথে মিশে ছিল তার গা। উড়তেই তার ডানা, লেজ, পেট সাদা রঙে ঝলমলিয়ে দেখা দিল। ভাবলাম বকপরিবারের এমন রঙদার কেউ-না-কেউ ধারেকাছে ওত পেতে বসে আছে। খুঁজলেই দেখা পাব। অনেকটা ঘুরেও কিছুই নজরে এল না বলার মতো। তাই ফিরলাম। এ পথে আমি একা। প্রকৃতি পড়ুয়াদের কাছাকাছি যেতেই শাহেদ বলল নদীর বুকে পায়রার মতো পাখিদের ভেসে যেতে দেখেছে এইমাত্র।

রিয়া বলল, 'ওরা আসলে কেমন পাখি? পায়রা তো জলে নামে না।' দুরবিনে চোখ রেখে বললাম, 'ঠিক। পায়রা জলে ভাসে না। ওটা গাংচিল।' একটা নয়, আশেপাশে কয়েকটা। সব স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। আরও একটু দক্ষিণে একঝাঁক যাযাবর হাঁস। আমার দূরবিনটা রিয়ার হাতে দিয়ে বললাম, 'দু-জনে এবার দূরবিনে চোখ রেখে হাঁসগুলো দেখে দেখে ওদের রং, গড়ন কেমন আমাকে বলে যাও, আমি সেটার নাম বলে দেব।'

ওরা দূরবিন তাক করল হাঁসের দিকে। রিয়ার ধারাভাষ্য শুরু হল, 'পায়রার মতো কিন্তু পায়রা নয়। গাংচিলও নয়। কিন্তু তার মতো সাদা, অবশ্য পিঠটা বাদামি। গলার কাছে কালো রেখা, ঠোঁটটা ছোটো। ঝাঁকের মধ্যে অন্যান্য হাঁসও রয়েছে। ওর বিবরণ আর এগোল না। দূরবিন নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী পাখি ওটা?'

ওর বর্ণনা কতটা ঠিক দেখতে আমি যন্ত্রটা নিলাম। গুণে দেখলাম ঝাঁকে আটটা বালি হাঁস রিয়া ঠিক বলেছে, বাদামি পিঠ, সাদা বুক-পেট, গলার নীচে কালো রেখা—বালিহাঁস। দলের সঙ্গে রয়েছে তিনটি বালি হাঁস। যাদের পিঠের বাদামি রং একটু ফ্যাকাসে। গলার কালো রেখাটিও নেই। আমিও আমার কথা শেষ করে শাহেদকে দূরবিনটা দিলাম। ওর দেখা শেষ হতে না হতেই তৌফিক আমাদের

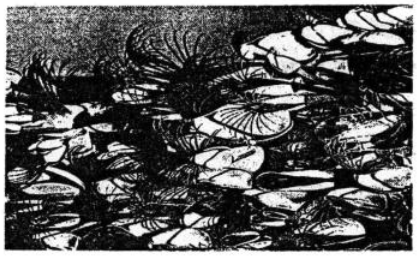

পেছনে হাজির। সে কিছু বলবে বলে এসেছে।

অনুরোধের সুরে তৌফিক বলল, 'একবার নৌকোর কাছে যাবেন? ওটার গায়ে গেঁড়ির মতো কী যেন আটকে আছে বোঝা যাচ্ছে না।' ওর অনুরোধ রাখতেই হল। এবং আমাদের সঙ্গী হল রিয়া ও শাহেদ।

নৌকোর গায়ে আটকে ছিল 'বার্‌নাকল্'— ইংরাজি শব্দ। ঝিনুকের মতো খোল আর চিংড়ির মতো পা। নৌকো, জাহাজ এমনকী গাছের গায়েও আটকে থাকে, সহজে ছাড়ানো যায় না। তাই আমরা ওটার বাংলা নাম ঠিক করলাম— 'নাছোড় চিংড়ি'। তৌফিক অনেকক্ষণ ধরে এদের দেখেছে। এঁকেছে তাদের আকার-আদল। বুঝেছে ওদের প্রাণ আছে। কিন্তু নড়াচড়া দেখেনি। জোর করে তুলে ওটার জীবনে ছেদ টানতে চায়নি।

'কী মনে হয় ওটাকে দেখে তৌফিক?' আমার প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'ঝিনুক বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু সরু খুদি-খুদি ওগুলো কী, খোলের বাইরে বেরিয়ে আছে? চুল না আঙুল? ঝিনুকের অমন থাকে না, চিংড়ির পেটের কাছে এমনটা আছে।'

ওটা চিংড়ি শ্রেণির প্রাণী। চিংড়ির পায়ের মতোই ওদের পা গাঁটে গাঁটে জোড়া।' আমার পেছন থেকে টুয়া বলল। কখন যে টুয়া-জাহানারা আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝিনি। সে তৌফিককে বলল, 'কয়েক আঁজলা জল ছিটিয়ে দে ওদের গায়ে, দেখবি মজা।' তা করতেই ওদের মুখ খুলে শুঁয়ো শুঁয়ো পা দেখা দিল নড়েচড়ে। কিন্তু নাছোড় চিংড়িগুলো আটকে রইল। টুয়া বাদাবনে অনেক ঘুরেছে, অনেক দেখেছে। তৌফিককে বুঝিয়ে দিল, শুঁয়োর মতো পা-গুলো দিয়ে ওরা খাবার টেনে মুখে দেয়। দ্যাখ ব্যাপারটা। সবাই নজর দিল সেদিকে।

জাহানারা বলল, 'আমরা অন্য জিনিস দেখে বলতে এসেছি। চলুন রঙিন বক দেখাব।' নদীর ধারে ঝোপের পাশে মাছের জন্য ওত পেতে বসেছিল হয়তো। আমি বললাম, 'আমিও দেখেছি একটা কোঁচবক—বাদামি পিঠ।

'না, সে রঙের নয়', টুয়ার স্বরে আপত্তি। 'আমরা দেখেছি একটা লালচে, আর একটা সবজে।'

'তাহলে তো চিনেই ফেলেছ—একটা লাল বক, অন্যটা সবুজ বক। সবুজটার মাথায় সবুজ টিকি—তাই না? সবুজ রঙের পা, কিন্তু দেহের তলার পালক, বুক আর পেটের রং কালচে ছাই-ছাই সাদা। ঠিক কি না?'

জাহানারা একটু চোখবুজে ভেবে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো! আমার পরের প্রশ্ন: ঠিক করে বলো দেখি, পালকের রং আসলে গাঢ় বাদামি, নাকি টকটকে লাল? এবার উত্তর এল টুয়ার কাছ থেকে। সে বললে, 'না, টুকটুকে লাল নয়, বরং বাদামি বলাই ঠিক, ভেজা বাদামের রং। সেটার পিঠের দিকের পালক গলা-বুক, পেটের রং একটু ফ্যাকাসে বলে মনে হল। পায়ের রং অবশ্য সবুজ। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, ওদের গলা সাধারণ সাদা বকের গলার মতো সরু লম্বা নয়। ছোটো আর মোটা।

ওরা সব ঠিকঠাক লক্ষ্য করছিল। আমার আর কিছু বলার ছিল না। দুপুর পেরিয়ে গাছের ছায়ারা লম্বা হতে শুরু করেছে। আমরা ফিরে এলাম আমাদের প্রথম ঠাঁইয়ে। সোনাঝুরি গাছের হালকা ছায়ায় বসে দুপুরের খাবার নিয়ে বসলাম।

খেতে খেতেই চোখ গেল দূরে মাঠের দিকে। একটা গাছের খুঁটির কাছে একঝাঁক চড়ুই এসে জুটেছে। না, চড়ুই নয়, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখি একঝাঁক ভারুই। কারও কারও মাথায় ঝুঁটি। তাহলে ভারুই বটে। ভাবতে ভাবতেই একটা পাখি সুরেলা ডাক ডেকে সোজা শূন্যে উঠে গেল। সব প্রকৃতি পড়ুয়ার নজর সেদিকে ফেরাতে বললাম। পাখিটা শূন্যে অনেকটা উঠে ডানা বুজে নেমে এল গাছের খুঁটিটার ওপর। তারপর আরও একটা অমন করে সোজা উঠে গেল ডেকে ডেকে। মাটির কাছাকাছি ডানা বন্ধ করে নেমেই আবার শূন্যে পাড়ি দিল। আমাদের সবার চোখ সেদিকে, হাতে খাবার। কেউ দেখিনি ঈশান কোণে মেঘ জমেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘের ডাক শুনতেই আমরা নিজেদের ফিরে পেলাম। ঘরে ফেরার টান বুঝে তৈরি হয়ে নিতে দেরি হল না।

শেষের কথা: সেদিন সবাই ছিল কিশোর-কিশোরী। এখন শাহেদ বিলেত থেকে ফিরে একটি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক। রিয়া আর্কিটেকট্ দিল্লিতে স্থিতু। টুয়া চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চপাঠ নিয়েছে বিলেতে। তৌফিক শিল্পকলায় উচ্চতর পাঠ নিয়ে অঙ্কনশিল্পে মত্ত। জাহানারা ইতিহাসের উচ্চতর পাঠ নিয়ে দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত। কোনও প্রকৃতি পড়ুয়ার নাম কাল্পনিক নয়।

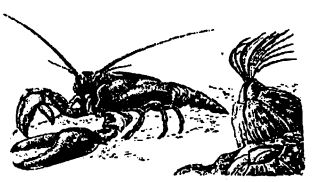

বই চেনো

আকাশ-চোর

লেখক : রতনতনু ঘাটী
প্রকাশক : শিশু সাহিত্য সংসদ
দাম-৪৫টাকা

ছড়া-কবিতার জগতে রতনতনু ঘাটী অতি পরিচিত নাম।

কোনও মহান বস্তু চুরি হয়ে গেলে চোরের ওপর বাটপাড়ি করা অন্যায় কিছু নয়। এই যেমন রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজটা যদি বাটপাড়ি করা যেত! শহরের ধূলো-ময়লা স্পর্দ্ধিত বিষের ধোঁওয়া আকাশভরা সূর্য তারাকে ম্লান করে দিচ্ছে। কেড়ে নিচ্ছে শিশুর উদার মনের সম্ভার। কবি রতনতনু ঘাটীর 'আকাশ চোর' 'চুপকথা'য় বলে

সেই যে ছেলে দিগন্তকে
নামিয়ে আনে ছবির খাতায়
তারই জন্য এই রাখলাম
সবুজ রংটা হলুদ পাতায়।

যে চোরেরা আকাশ পথে লুটে নিয়ে শিশু বয়সের অদম্য ইচ্ছাকে দাবড়ে স্কুলের রুটিনে ফেলে কষ্ট দেয় তাদের জন্য কবি বললেন,

সেই ছেলেটা শ্যামলা বেঁটে
আমরা তাকে সবাই চিনি
ছবির পাতায় নামিয়ে আনে
স্বর্গ থেকে মন্দাকিনী।

তার জন্য উথাল পাথাল
ঢেউ রেখেছি পাঁচটা ছ-টা
আর রেখেছি হলদি নদী
মোহনপুরের আকাশ ক-টা।

সেই ছেলেটার জন্মদিনে কবি এনেছেন একটা গোটা রামধনু।

অপরদিকে আছে গাবু নামে বালক, যে 'অঙ্কে ছ-বার গোল্লাপাওয়া', সে নিজের চেষ্টায় বিজ্ঞানী হবার ইঙ্গিত দিয়ে দাদুর স্বপ্ন পূরণ করে। এই শিশুরা যেমন ইস্কুলে যায় তেমনি মনকে মুক্তি দিতে বলে,

'নেমেই দেখি হলদি-জলে মেঘরা ভেসে আসে।' কলকাতায় অন্য অনেক কিছু আছে ভুরি ভুরি, কিন্তু আকাশ তো নেই!

'তাই দু-মুঠো আকাশ করছি চুরি।'

এই চুরি মহান করেছে ছড়ার বইটাকে। আছে আরও অনেক গ্রাম শহরের টানাপোড়েনের কথা যে সব সার সার মিলের লাইনে, ছন্দের টানে ছেলে বুড়ো সবাইকে অবাক করবে।

ধ্রুব এষের আঁকা ছবিগুলি নিয়মের বাঁধাধরা গতে ধরা পড়ে না। কোনও কোনওটির অর্থই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। এগুলি প্রচলিত আর্টের ভাবভঙ্গি নয়, শিল্পীর এক আশ্চর্য মনোজগৎ। কল্পনার বিশেষ ছাঁচে তাদের কিন্তু গতি অবাধ। ছবির বাঁধাধরা লাইন মিশেছে রহস্যের কুয়াশায়। আর ওইখানেই ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

সূর্যমন্দিরের শেষ প্রহরী

লেখক : হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত
প্রকাশক : পারুল। দাম-১২৫টাকা

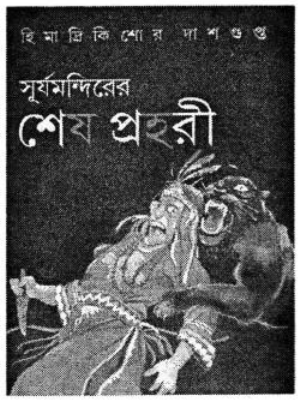

অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীর আকর্ষণে বাঙালি কিশোর-কিশোরীরা সেই কবে থেকেই বইয়ের পাতায় আটকে রয়েছে। ভুল বললাম—আটকে নেই, নায়কদের সঙ্গে ওরাও বছরের পর বছর পাড়ি দিয়েছে চাঁদের পাহাড়ে, মঙ্গল গ্রহে, আমাজনের গহনে। শঙ্কর, বিমল, ঘনাদা, শঙ্কু, মামাবাবুদের সঙ্গে ওরা একাত্ম হয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে।

বাংলা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর সম্ভার যথেষ্ট সমৃদ্ধ। হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনির্মল বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, থেকে শুরু করে সত্যজিৎ রায়, অদ্রীশ বর্ধন, শিশিরকুমার মজুমদার, অজেয় রায় প্রমুখ...লিখে গেছেন অজস্র রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। সাম্প্রতিক অতীতে কিশোর সাহিত্যে অবশ্য অ্যাডভেঞ্চারের চেয়ে রহস্য গোয়েন্দা কাহিনীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, যদিও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু এবং সমরেশ বসুর অর্জুনের কাহিনীতে রহস্যভেদের থেকেও অ্যাডভেঞ্চারের প্রাধান্য পেয়েছে (আমাদের দুর্ভাগ্য গত পুজোয় কাকাবাবুও তাঁর অভিযানের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন)। বুদ্ধদেব গুহর 'ঋজুদা' অবশ্য মূলতঃ জঙ্গলকেন্দ্রিক অ্যাডভেঞ্চার।

সাম্প্রতিক এই গোয়েন্দা কাহিনীর তান্ডবের মাঝখানে কয়েক জন লেখক ফিরিয়ে এনেছেন অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর ধারাকে। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত। প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কয়েকটি অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর একাধিক উপন্যাস। (সম্পূর্ণ এবং ধারাবাহিক)। সন্দেশের পাঠকরাও তাঁর লেখনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। এই মুহূর্তে সন্দেশে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী 'বুরুন্ডির সবুজ মানুষ'। ক্রিপ্টোজুলজিস্ট হেরম্যান ও সুদীপ্ত আফ্রিকার বুরুন্ডির রিফ্‌ট্ ভ্যালিতে এক অজানা প্রাণীর অনুসন্ধানে গেছে। এই জুটি পৃথিবীর আরও বেশ কিছু দুর্গম স্থানে অভিযানে অংশ নিয়েছে।

আলোচ্য উপন্যাস 'সূর্যমন্দিরের শেষ প্রহরী'তে হেরম্যান, সুদীপ্ত জুটি নেই ঠিকই, কিন্তু অনেকটা একই আদলে গড়া বিদেশী-স্বদেশী জুটি মার্কেজ-সুজয় আছে। ওদের দলে রয়েছে ইতিহাসের অধ্যাপক মার্কেজের বছর দশেকের নাতি সুজান এবং ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার বিল।

উপন্যাসের নামকরণেই পটভূমির আঁচ পাওয়া যায়। হারিয়ে যাওয়া ইনকা সাম্রাজ্য, রহস্যময় সূর্যমন্দির অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের কাছে চিরকালই আকর্ষণীয়। আন্দিজ পর্বতমালা, আমাজনের গহীন জঙ্গলের প্রতি আমাদের টান চিরকালীন। দুর্ধর্ষ কালো বাঘ, মাংসাসী ভয়ংকর অ্যানাকোন্ডা এবং আরও চেনা-অচেনা পশুপাখি ছড়িয়ে আছে ওই ভয়ংকর জঙ্গলে। সেখানেই নাকি রয়েছে এক প্রাচীন ইনকা নগরী। সূর্যনগরীর এক পুরোহিত ইল্লাপা মার্কেজদের নিয়ে সেই নগরীর উদ্দেশে রওয়ানা হন। ওদের সঙ্গে আছেন এক স্পেনীয় ধনকুবের পিনচিও। ট্যুরিস্টস্পট মাচুপিচু থেকে ওরা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করার পর থেকেই শুরু হয় একের পর এক শিহরণ জাগানো ঘটনাবলী। এক নিঃশ্বাসে পড়ে যেতে হয় শেষ পাতা পর্যন্ত।

অ্যাডভেঞ্চারের শিহরণ বজায় রাখার পাশাপাশি লেখক কিন্তু প্রচুর তথ্যও সংযোজন করেছেন তাঁর লেখায়। ইনকা সভ্যতার ইতিহাসের পাশাপাশি ইনকা নগরী, সূর্যনগরীর বর্ণনা নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়। শুধু প্রাচীন ইতিহাস নয়, বর্তমান পেরুভিয়ান খাবার থেকে শুরু করে জঙ্গলের গাছ-পালা, নদী, প্রাণীদের ছবিও নিখুঁতভাবে এঁকেছেন তিনি। তবে ইতিহাসের বর্ণনায় আরেকটু সংযত হলে ভালো হ'ত। প্রথম দিকে মার্কেজের দীর্ঘ ভাষণে কাহিনীর গতি সামান্য স্লথ হয়েছে।

অনুপ রায়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ বেশ ভালো। মুদ্রণ-বাঁধাই চমৎকার। মুদ্রণপ্রমাদও খুব একটা চোখে পড়েনি। সব মিলিয়ে বলা যায় একটি খুব ভালো বই আমাদের উপহার দিয়েছেন, প্রকাশক-লেখক-শিল্পী।

গ্রন্থবিমুখ গোস্বামী

চাঁদির টাকা

সুনির্মল চক্রবর্তী

এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে ছিল বড়োই গরিব। থাকত এক নগরে। ভিক্ষে করেই তার সংসার চলত।

সারাদিন চারদিক ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করে ব্রাহ্মণ যা পেত তাই নিয়ে বাড়ি ফিরত। চাল-ডাল কিছুটা রাখত নিজের জন্য। বাকিটা হাটে বিক্রি করে পয়সা পেত।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছল এক মস্ত বড় বাড়ির সামনে। সেটা ছিল এক রাজার বাড়ি। রাজার খুব দয়ামায়া ছিল। রাজার কাছে খবর গেল এক ব্রাহ্মণ এসেছে ভিক্ষে নিতে। রাজা কাউকে ফেরাতেন না। ডেকে পাঠালেন তাকে।

ব্রাহ্মণকে দেখে রাজামশাই খুশি হয়ে একশোটি টাকা দিতে গেলেন। আশপাশে যারাই ছিল, খুব অবাক হয়ে দেখল ব্রাহ্মণ সে টাকা হাতে নিলই না। বরং বিনীতভাবে বলল, 'রাজামশাই, আমাকে একটা পয়সা দিলেই হবে। আমি খুশি মনে নেব। তবে সে পয়সা আপনার খাটুনির পয়সা হওয়া চাই।'

গরিব এক ব্রাহ্মণের মুখে একথা শুনে রাজা ভীষণ অবাক হলেন। পরিশ্রম কাকে বলে রাজামশাই জানেন না। তাছাড়া পরিশ্রম করে কোনওদিন কিছু উপার্জনও করেননি। কাজেই খাটুনির পয়সা তিনি কোথায় পাবেন? তবুও ব্রাহ্মণকে বললেন, 'বেশ, দু-দিন পরে আসুন দেখছি।'

পরদিন রাজামশাই খুব সকালে ঘুম থেকে উঠলেন। রাজপোশাক ছেড়ে খুব সাধারণ পোশাক পরলেন। রাজাকে চিনেফেলার সম্ভাবনা রইল না। তারপর সবাইকে না জানিয়ে হেঁটে চললেন এক গ্রামের দিকে। তাঁকে যে এখন একটা কাজ জোগাড় করতে হবে।

কিছুদূর গিয়ে দেখলেন একদল লোক কাজে ব্যস্ত। তারা একসঙ্গে মিলে রাস্তা তৈরির কাজ করছে। তাদের মধ্যে ছিল মাতব্বর গোছের এক সর্দার, সে-ই কাজ দেখাশোনা করছিল। তারকাছে গিয়ে বললেন, 'আমাকে একটা কাজ দিতে পার?'

সর্দার একবার ভালো করে রাজাকে দেখে বলল, 'মাটি খুঁড়তে পারবে?'

রাজা মাথা নেড়ে বললেন, 'পারব।'

'বেশ বেশ, তবে ওই কোদালটা নাও। গর্ত খুঁড়ে মাটি রাখো রাস্তার ওপরে।'

আর দেরি না করে রাজামশাই কোদাল তুলে নিলেন হাতে। তারপর মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। কোনওদিন এত পরিশ্রম করেননি। মাটি কাটতে কোনওদিন হয়নি তাঁকে। কাজেই খুব অল্পেই রাজামশাই ঘেমেনেয়ে উঠলেন। দু-হাতে ছোটো-বড়ো ফোসকা পড়ে গেল। দু-হাতে কোদালটা ধরে রাখতেও পারলেন না।

সর্দারের চোখ এড়াল না। রাজাকে বলল, 'তুমি বাপু একটুতেই ঘেমেনেয়ে উঠেছ। তোমার দ্বারা কোনও কাজ হবে না। চারআনা দিচ্ছি ভালোয় ভালোয় কেটে পড়।'

সর্দার তখনই একটা চারআনা পয়সা রাজার দিকে ছুঁড়ে দিল। রাজা আর কী করেন? সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে চললেন রাজবাড়ির দিকে।

পরদিন রাজা রাজসভায় এসে বসেছেন। জামার পকেটে চারআনা পয়সা রেখে অপেক্ষা করছেন ব্রাহ্মণের জন্য। কিছু পরেই ব্রাহ্মণ এল সেখানে। তারপর হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইল। রাজামশাই তার হাত বাড়ালেন জামার পকেটের দিকে। তারপর পকেট থেকে থেকে পয়সা বের করে ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এটা কিন্তু খাটুনির পয়সা আমার।'

রাজার দেওয়া চারআনা পয়সা হাতে নিয়ে ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরে এল। ভেবেই পেল না এই চারআনা দিয়ে সে কী করবে।

সাত-পাঁচ ভেবে বাড়ির পেছন দিকে এল সে। দেওয়াল ঘেঁষে রয়েছে এক তুলসী মঞ্চ। তার কয়েক হাত দূরে মাটি খুঁড়ে সে পয়সাটা পুঁতে রাখল।

কী আশ্চর্য! কিছু পরেই সেখানে একটা ছোট্ট চারা দেখা দিল। কয়েকদিনের মধ্যেই চারাগাছ একটা বিশাল গাছের রূপ নিল। আর কী আশ্চর্য! সেই গাছে একদিন ফল হল— টাকার ফল। দেখতে দেখতে সেই গাছ ভরে গেল টাকার ফলে। টাকার ভারে গাছটার ডাল মাটিতে নুয়ে পড়ল।

একদিন রাজার লোকেরা ফুল খুঁজতে বেরিয়েছে। রাজার বাড়িতে পুজো হবে। রাজার বাড়ির পুজো বলে কথা! অনেক অনেক ফুল চাই যে তাদের! খুঁজতে খুঁজতে এসে পৌঁছেছে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ি। চোখ পড়তেই দেখে একটা বড় গাছ, কী আশ্চর্য, সেই গাছে কোনও ফুল নেই তার বদলে ঝুলছে টাকা! এক টাকা নয়। রাশি রাশি টাকা। সব চাঁদির টাকা!

তাদের তো ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা! তখনই ছুটল রাজার বাড়ি। রাজাকে যে এখনই সব কথা বলতে হয়।

হাঁপাতে হাঁপাতে তারা এসে পৌঁছল রাজার বাড়ি। রাজার কাছে এসে যখন দাঁড়াল, তখনও হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে রাজাকে বলল, 'রাজামশাই-রাজামশাই, আপনার বাগানে ফুল-ফল হয় দেখেছি, সে আর এমন কী কথা! ফুল তুলতে গিয়েছিলাম বামুনঠাকুরের বাড়ি। তার বাগানে গিয়ে যা দেখলাম, তাতে তো আমাদের চক্ষু চড়কগাছ! একটা গাছে কোনও ফুলফল নেই, ঝুলছে শুধুই টাকা আর টাকা। টাকাগুলি আবার কাগজের নয়। চাঁদির টাকা, রোদ লেগে ঝকমক করছে।'

কাজের লোকেদের মুখে এতসব শুনে রাজামশাই অবাক! মনে মনে ভাবলেন, কী সব বলছে এরা। এটা কি সত্যিই হতে পারে?·তখনই পেয়াদাকে ডেকে বললেন, 'লোকজন নিয়ে যাও দেখি বামুনের বাড়ি। টাকার গাছটা তুলে নিয়ে এস।'

রাজার আদেশ। অমনি ছুটল পেয়াদারা। সঙ্গে লোকজন, লাঠিয়ালরা।

বামুনঠাকুর তাদের দেখে একটুও ভয় পেল না। গাছ স্পর্শ করতেও দিল না। বরং বুঝিয়ে বলল, 'রাজামশাই যদি চান, তিনি নিজে এসে গাছটাকে তুলে নিয়ে যেতে পারেন। কিছু বলব না।'

রাজার কাছে খবর পৌঁছল। বামুনঠাকুরের তো কম স্পর্ধা নয়! তিনি নিজেই এলেন সেখানে। আশ্চর্য গাছটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

বামুনঠাকুর বলল, 'আপনি আমাকে দিয়েছিলেন চারআনার একটি মুদ্রা, মনে আছে তো? ওই চার আনা আপনার কষ্টার্জিত আয়। ওটা মাটিতে পুঁতেছিলাম। আজ তা বড় গাছে পরিণত হয়েছে। এই গাছটা তাই আপনার।

তবু বলতে চাই, আপনি আমাকে মাত্র চার আনাই দিয়েছিলেন। এখন এই গাছটা যদি পেতে চান, অবশ্যই পেতে পারেন। তার মানে আপনি আমাকে ভিক্ষেয় যা দিয়ে ছিলেন, তা সবই আবার ফিরে পেতে পারেন।'

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজামশাই কী বলবেন ভেবে পেলেন না। ভিক্ষের জিনিস কেউ কি ফিরিয়ে নিতে পারে? রাজাও পারলেন না।

মন খারাপ করে ফিরে চললেন রাজবাড়ির দিকে।

(মহারাষ্ট্রের লোককথা)

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

ছায়াবতী

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজকন্যার নাম ছায়াবতী। না সে কুঁচবরণ কিনা জানা যায় না, কেন না তার কোনও শরীর নেই। যদিও সে ভূত-প্রেতের মতো অশরীরী নয়। চাঁদনি রাতে সে আসে। আর তার ছায়া তিরতির করে কাঁপে রাজবাড়ির ছাদের পাঁচিলের গায়ে। এমনটা বরাবর ছিল না। সমুদ্রপারের সেই দেশে, পাহাড়ের কোলে আনন্দে হেসেখেলে দিব্যি বড় হচ্ছিলেন রাজার সেই মেয়ে। এক রাতে তুফান এল, রাজবাড়ির প্রতিটি অলিন্দে তার বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ল। ধুয়ে-মুছে সব নিয়ে গেল সে। শুধুই দিয়ে গেল একটিমাত্র ছায়া। পূর্ণিমার রাতে চাঁদ উঠলে সেই ছায়া ঘুরে বেড়ায় রাজবাড়ির মস্ত ছাদে। একা একা।

ঠাকুমার মুখে এই অবধি শুনে ভীষণ মন খারাপ হল দুখুর। তারও ঠাকুমা ছাড়া ত্রিভুবনে কেউ নেই কিনা। ছায়াবতীর কথা শুনতে শুনতে আর ভাবতে ভাবতে একদিন দুখু বড় হয়। ঠাকুমাকে বলে, 'তুমি তো বলো সেই পাহাড় আছে, সমুদ্র আছে আর আছে বিশাল প্রাসাদে সত্যি সত্যিই আছে সেই ছায়াবতী রাজকন্যা।'

ঠাকুমা বলেন, 'হুঁ।'

দুখু বলে, 'আমি যাব। সেই কন্যেকে নিয়ে আসব তোমার কাছে।'

ঠাকুমার মুখ ভয়ে শুকিয়ে যায়, 'চুপ যা বাছা, সে কি একটুখানি পথ! কত পাহাড় ডিঙিয়ে, কত নদীতে সাঁতার কেটে, কত রাস্তার ধুলো মেখে তবে সেখানে পৌঁছোনো যায়। যাব বললেই যাওয়া হয় নাকি?' দুখু বেঁকে বসে, 'আমি যাবই। তুমি পথের হদিশ দাও।'

ঠাকুমা কাঁদতে কাঁদতে দুখুর পুঁটলি গোছান। নিজের হাতে চিত্রবিচিত্র খানদুয়েক করা নকশি কাঁথা দেন। বড় একখানি জামবাটি ভরা নাড়ু, মোয়া, তক্তি দেন। আর দেন পুরনো বাক্স খুলে একটি অপূর্ব ময়ূরের পালক।

দুখু আবার হাত পাতে, 'ঠাকুমা সবই তো দিলে, কিন্তু আমার অস্ত্র কই? পথে বিপদের সাথে লড়ব কী দিয়ে?'

ঠাকুমা তখন পুটুস্ করে মাথার দু-গাছি চুল ছিঁড়ে দুখুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেন, 'এই তোমার অস্ত্র।'

দুখু অবাক চোখে তাকায়। ঠাকুমার হাসিমুখ দেখে পরম বিশ্বাসে সে দু-গাছি চুল জড়িয়ে নেয় দু-হাতের কব্জিতে।

পরদিন ভোরে সূর্য ওঠার আগেই দুখু রওনা দেয়। একহাতে তার সেই পুঁটলি, অন্যহাতে সাপ ব্যাঙ তাড়ানোর লাঠি। মাথায় লাল গামছার পাগড়ি, আর পরনে বাবার সবুজ রঙা ঢলঢলে জামা আর ফর্সা একখানি ধুতি।

দুখু যাবে বলে সারারাত ঠাকুমা আকাশের তারাদের ডেকেছেন, ঠাকুমার কুলুঙ্গির দেবতাদের কাছে মাথা খুঁড়েছেন। দুখু ভুলচুক যাই করুক না কেন তোমরা মাপ করে দিও আর দুখুর মাথায় হাত বুলিয়ে শতশত আশীর্বাদ করেছেন। তার বংশের একমাত্র সলতেটিকে বিপদের পথে ছাড়তে কি মন চায়।

সাতসকালে একবাটি পান্তা, পিঁয়াজ আর টুকটুকে লাল লঙ্কা দিয়ে মেখে, খুব আয়েস করে পেটভরে খেয়েছে দুখু। পথে যেতে যেতে খিদে পেলে গাছের ফল আছে। আর আছে ঠাকুমার দেওয়া খাবার ভরা বাটি। অন্ধকারকে সে আর ভয় পায় না। চকমকি পাথর কোমরে গোঁজা, ঘষলেই একবুক আলো দেবে।

যাবে বলে দুখু যেই চৌকাঠ ডিঙোয়, ঠাকুমা একগাল হেসে চোখের জল লুকিয়ে, দুখুকে চুমু খান আর বিড়বিড়য়ে বলেন, 'আমার দুখুসোনা, ঠিক আনবে চাঁদের কণা।'

অমাবস্যার ভোরে দুখুর যাত্রা শুরু। সেদিন রাজবাড়ি একেবারে শুনসান অন্ধকার। প্রতি পূর্ণিমায় ছায়াবতী

রাজকন্যা রাজবাড়িতে আসেন। পুরীতে সুগন্ধ ভাসে, রাজবাড়ির বাগানে ফুটে থাকা বেল, জুঁই, চামেলিরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে।

রাজকন্যা ছুটে তাদের কাছে যান, তার ভাষা শুধু ওরাই বোঝে। ব্যাকুল হয়ে তিনি জানতে চান, 'সখি, তোরা কী বলিস?'

তারা কিছু উত্তর দেয় না, শুধু হাসির মাত্রা বাড়ে। রাজকন্যা অভিমান করে দূরে সরে যান। আসলে কি হয়েছে, দুখুর পা যেই পথে পড়েছে ফুলেরা খবর পেয়েছে। তবে সে খবর কাউকে দিতে মানা।

একটি একটি করে দিন যায়। চাঁদের আলো মলিন হয়। তার ছায়াশরীর নিভতে নিভতে অমাবস্যায় ডুবে যায় অন্ধকারের কোলে।

পথে যেতে যেতে দুখু কত কি ভাবে। না দেখা রাজকন্যার কথা, ফেলে আসা ঠাকুমার কথা, ছোটবেলায় হারানো বাপ-মায়ের কথা, পাড়ার খেলা করার মাঠ, পোষা ময়না আর ভুলু কুকুরের কথা। দিনের বেলায় ঘাসেরা, প্রজাপতিরা, পোকামাকড়রা তার সঙ্গী হয়। রাতে তারারা মিটমিট করে হাসে। পাখিরা নরম পালক দিয়ে গাছের ডালে দুখুর বিছানা পেতে দেয়।

অমাবস্যার দিন ফুরোলে চাঁদ একটু একটু করে আকাশে উঁকি মারে। ছায়াবতী রাজকন্যা সমুদ্র থেকে টুপ করে ভেসে উঠে তার আবছা ছায়াশরীর নিয়ে রাজবাড়ির দিকে হাঁটা দেন। সমুদ্রের ঢেউ যখন রাজপুরীর সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সেই প্রচন্ড জলের ঝাপটায় মারা যায় রাজারাণী, দাসদাসী, মন্ত্রী-সান্ত্রী, সৈন্যসামন্ত সকলে। শুধু বেঁচে ছিলেন রাজকন্যা। তবে তার সবটুকু নুনের জলে গলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তখন সমুদ্র রাজার মায়া হয়। তিনি বলেন, 'তোমার নষ্ট রূপের জন্য দুঃখ কোরো না কন্যে। ছায়া হয়ে বাঁচ, কেউ যদি সত্যিসত্যি ভালোবেসে তোমায় পেতে চায়, তুমি আবার তোমার রূপ ফিরে পাবে। সেদিন ছায়াই ফিরিয়ে দেবে কায়াকে। এখন দিনের আলোয় তোমাকে দেখা যাবে না। পূর্ণিমার দিন যত এগিয়ে আসবে, চাঁদের আলো তত জোরালো হবে, তুমিও একটু একটু করে ফুটে উঠবে। সমুদ্রের রাজার কথা তো আর মিথ্যে হতে পারে না। ছায়াবতী কন্যা তাই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অপেক্ষা করেন।

এদিকে দুখুর পথ আর ফুরোয় না। কত যে পাহাড় সে ডিঙিয়ে যায়, কত নদী সাঁতরে পার হয়, তার ইয়ত্তা নেই। পথে যেতে যেতে তার পাগড়ি ধুলো মেখে ময়লা হয়। জামায় কালোর ছোপ ধরে। মলিন গা, ফুটিফাটা পা, তবু সে গোঁ ছাড়ে না। অবশেষে এক বণিকের কাছে রাজকন্যার হদিশ পায় আর জাহাজে চেপে সমুদ্র ডিঙিয়ে হাজির হয় রাজপুরীতে।

সেখানে তখন রাত নেমেছে। চাঁদের আলোয় ছায়াবতী তার সমুদ্রে ভেজা ছায়াচুল মেলে দিয়ে ভাবছেন ডুবে যাওয়া বাপ মা-র কথা, ফুরিয়ে যাওয়া সুখের দিনের কথা। রাজকন্যার ছায়াশরীরের দীর্ঘশ্বাস হা-হা শব্দ করে মিশে যাচ্ছে বাতাসের সঙ্গে। বাতাস দুঃখে শিউরে উঠে বয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে।

দুখু যখন রাজবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল তখন ভোর হতে আর কয়েক প্রহর বাকি। প্রকাণ্ড খোলা ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে সে হুঙ্কার ছাড়ল, 'কে আছ?' কেউ সাড়া দিল না। কেবল এক রাতজাগা প্যাঁচা পাক খেতে খেতে উড়তে লাগল তার মাথার ওপরে। তাকে লক্ষ্য করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দুখুর শরীরে মনে আনন্দের সাড়া জাগে। হাওয়া তাকে ফিসফিসিয়ে বলে, 'এতদিনে তোমার সব কষ্টের শেষ। এক দৌড়ে রাজকন্যার পাশে পৌঁছে যায় দুখু। রাজকন্যা যেই ছায়াহাত বাড়িয়ে দুখুর হাত ধরতে যান প্রকাণ্ড এক দৈত্য এসে তাকে আড়াল করে দাঁড়ায়। সমুদ্র থেকে উঠে আসা বিকট বিকট সাপ আর বীভৎস প্রাণীর দল দুখুকে ঘিরে নৃত্য করতে থাকে।

এই দৈত্য আর কেউ নয়, সমুদ্র রাজার দুষ্টু ছেলে। রাজকন্যাকে পাবে বলে রাজা-রাণী আর রাজত্বের সবাইকে জলের নীচে টেনে নিয়েছিল। দুখু শান্ত মুখে কব্জি থেকে ঠাকুমার চুলের গুছি খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় দৈত্যের দিকে। সেগুলো ধনুকের ছিলার মতো ছিটকে গিয়ে বাড়তে বাড়তে দৈত্যকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধে। অমনি সব নিমেষে অদৃশ্য! সে দৈত্যও নেই, ভয়ংকর প্রাণীরাও নেই।

শাঁখ বেজে ওঠে। উলু দেয় কারা? রাজা-রাণী, পাত্রমিত্র, সৈন্যসামন্ত সবাই হাজির হয়ে জড়িয়ে ধরেন দুখু আর সেই কন্যেকে। দুখু দেখে ছায়াবতীর ছায়ার বদলে তার সামনে দাঁড়িয়ে এক চোখজুড়োনো কন্যা। পুঁটলি খুলে দুখু তখন পালক তুলে দেয় চাঁদের আলোর মতো রূপবতী রাজকন্যার হাতে। কন্যা হাসেন, 'শুধু পালক দিয়ে ঠকালে হবে না! পুঁটলিতে খাবারদাবার থাকলে দুটি দাও। বড় খিদে পেয়েছে। ছায়াশরীরে অনেক বছর কিছু খাইনি তো।'

নামাঙ্কন : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

লা ল মা টি র ব ই

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পসমগ্র ৫০০/
সম্পা- প্রশান্তকুমার পাল

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (বিরূপাক্ষ) রচনা সমগ্র ১ম ৫০০/

মৌমাছি (বিমল ঘোষ) রচনাসমগ্র ৪০০/

লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র ১-৫ প্রতিটি ৪০০/ এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড ৫০০/

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের
সঞ্জীব রচনাবলি ৩য় খণ্ড ৪০০/
পরম প্রসঙ্গ ১০০/
উত্তাল এই সময় ১০০/
লৌকিক- অলৌকিক ৪০/
সুধীর চক্রবর্তীর রচনাবলি ২য় খণ্ড ৬০০/

দেখা না-দেখায় মেশা ৪০০/
ছ ড়া নো এ ই জী ব ন ১৫০/

প্রমদারঞ্জন রায়ের **বনের খবর** ১০০/

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
চিত্রকরের রোজনামচা ১০০/
আঁকা শেখো ১০০/

রাখাল চন্দ্র সেনের সপ্তপর্ণ ১০০/

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের
বৃষ্টি নামার পরে ১০০/

বিজন কুমার ঘোষের
বাজার সরকারের ডায়েরি ৮০/

অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত
শার্লক হোমস-সমগ্র চিত্রসহ সটীক সংস্করণ ১ম ৪০০/ ২য় ৫৫০/

অসিত কুমার হালদারের
অজন্তা ৪০০/ চিত্রসহ সটীক সংস্করণ

৫৬ জন খ্যাতনামা লেখিকার
সই গল্প সংকলন ৩০০/
সম্পাদনা নবনীতা দেব সেন

জগন্নাথ বসু ও ঊর্মিমালা বসু সম্পাদিত
রবীন্দ্র শ্রুতিনাটক ১৫০/

নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের বাতিল জঞ্জাল ১০০/

শোভনলালের গল্প ৮০/

অনিতা অগ্নিহোত্রীর ছোটোদের গল্পসমগ্র ২০০/

লীলা মজুমদারের
পদিপিসির বর্মিবাক্স ৬০/
হলদে পাখির পালক ৬০/

আশাপূর্ণা দেবীর
এক ডজন ছোটোদের উপন্যাস ১৫০/

কার্লো কলোদির **পিনোচিও** ১০০/
অনুবাদ কৃষ্ণেন্দু চাকী

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাসলে ভালো বাসলে ৪০/

— ক মি ক্‌ স —

কাফী খাঁ সমগ্র ৫০০/

অহিভূষণ মালিকের **নোলেদা** ৮০/

ময়ূখ চৌধুরী কমিক্‌স-সমগ্র ২য় ৪৫০/

নারায়ণ দেবনাথ কমিক্‌স-সমগ্র ১ম ও ২য় প্রতিটি ৫০০/ এবং ৩য় ৫৫

বাহাদুর বেড়াল ১ম ৬০/ ২য় ৮০/

ডানপিটে খাঁদু সমগ্র ৮০/

রবিছবি ১০০/ (মৌমাছি রচিত নারায়ণ দেবনাথ অঙ্কিত)

গৌতম কর্মকার কমিক্‌স-সমগ্র ১ম ৩০০/

মানুষের সব জেনে ফেলার লোভের একটা সীমা থাকা উচিত কথা বলছেন সিধু জ্যাঠা... আসছে **বিশ্বজিৎ রায়ের**
প্রফেসর শঙ্কুর শেষ ডায়েরি ১০০/

লা ল মা টি প্র কা শ ন
৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭৩
৯৮৩১০২৩৩২২/ ২২৫৭ ৩৩০০
Email : lalmatibooks@gmail.com

ছাপাখানার ভূতের দৌরাত্ম্যে তো আমাদের নাজেহাল দশা । শারদীয়া সংখ্যা সন্দেশে দুষ্টু ভূতগুলো বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। লেখকেরা খুব চটে গেছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় নবম লাইনে 'মানুষ' শব্দটা ছাপা হয়েছে 'নামুষ'। একই পাতায় রঞ্জনপ্রসাদের কবিতায় তৃতীয় লাইনে 'প্রখর জ্যৈষ্ঠ মাসে'র বদলে দেখা যাচ্ছে 'প্রথম জ্যৈষ্ঠ মাস'। মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতায় ছন্দের ওলটপালোট। সুনীল জানার গল্পের নাম 'এক যে ছিল'র পরিবর্তে হয়ে গেছে 'এক যে রাজা'। ইন্দ্রনীল সান্যালের গল্পের প্রথম লাইনটা বেমালুম উধাও। শিবানী রায়চৌধুরীর গল্পেও বেজায় গোলমাল। এছাড়াও ছোটোখাটো প্রচুর ভুল আমাদের চোখে পড়েছে। পাঠক এবং লেখকেরাও জানাচ্ছেন অভিযোগ। সূচিপত্রেও ভূতের হাত। ২০১২ সাল হয়েছে ২০১১ আর ২৯ নম্বর পাতায় যে দু-জন কবির লেখা ছাপা হয়েছে (অপূর্বকুমার কুণ্ডু ও শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁদের নামই বাদ পড়েছে সূচিপত্র থেকে।

আমরা সবার কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী। একই সঙ্গে আমরা শ্রীমতী মন্দাক্রান্তা সেনের চিঠিটা নীচে ছেপে দিলাম।

সন্দেশ

সম্পাদক সমীপেষু,

আপনাদের পত্রিকার শারদীয়া ১৪১৯ সংখ্যায় ২৪০ নং পৃষ্ঠায় 'পুরনো রূপকথা' নামে আমার একটি কবিতা /ছড়া প্রকাশিত হয়েছে। তাতে এমন কিছু ভুল রয়েছে যা আমার প্রকৃত লেখাটিতে আদৌ ছিল না। 'সন্দেশ'-এর মতো পত্রিকায় লেখা ছাপার ক্ষেত্রে আরও একটু মনোযোগ আকাঙ্খিত ছিল। আমি পত্রিকাটি ফেরত দেবার পাশাপাশি আমার লেখা আসল কবিতা/ছড়াটি আপনাদের দপ্তরে প্রেরণ করলাম। দয়া করে একটু মিলিয়ে দেখবেন। পরবর্তীকালে এরকম ভুল যেন না হয় সেদিকে আশা করি বিশেষ নজর রাখবেন।

ধন্যবাদান্তে, বিনীত

মন্দাক্রান্তা সেন

১৫/১/১৩

পুরনো রূপকথা

মন্দাক্রান্তা সেন

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি কই সব-এ
আমরা কি ফেলেই এলাম শৈশবে?
আকাশ জুড়ে টগবগানো পক্ষীরাজ
দেখছ কেমন মেঘের কোলে লক্ষ্মী আজ!
গাছের ডালে ব্যাঙ্গমী আর ব্যঙ্গমা
আর কি তারা রাজকুমারের সঙ্গে না!

এসব ছেড়ে যাস না ছেড়ে ছোট্টরা
যদি পারিস বক্ষে রাখিস তুই, তোরা...

সোলার ফটোভোল্টিক ও থার্মাল সরঞ্জাম এবং বিকল্প জ্বালানী বায়োগ্যাস

সৌরলণ্ঠন

১২ ভোল্ট ৭ এ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি ১০ ওয়াট মডিউলে চার্জ হয়। সঙ্গে মোবাইল চার্জারও থাকবে।

সোলার হোম লাইটিং সিস্টেম

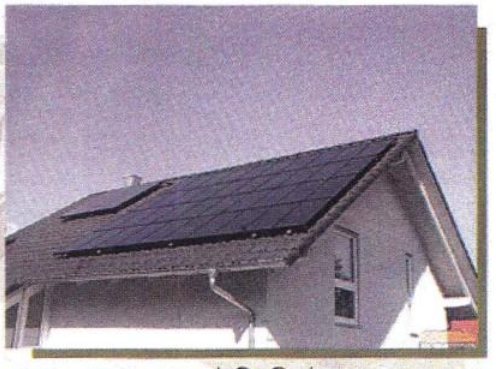

নানা মডেলের হোম লাইটিং সিস্টেম পাওয়া যায়, যা থেকে লাইট, পাখা, টিভি ইত্যাদি চালানো যায়।

সোলার ওয়াটার হিটিং সিস্টেম

সোলার কুকারে রান্না করুন বাঁচবে জ্বালানীর খরচ অক্ষুণ্ণ থাকবে নির্মল পরিবেশ

সোলার কুকার

বিকল্প জ্বালানী বায়োগ্যাস

এলাকা	সিস্টেমের ক্ষমতা	খরচ	ভর্তুকির পরিমান
দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকা এবং সুন্দরবন অঞ্চল	১ ঘনমিটার	১০,০০০/ থেকে ১২,০০০/	৪,০০০/.
ঐ	২ ঘনমিটার	২০,০০০/ থেকে ২৪,০০০/	১০,০০০/
অন্যান্য এলাকায়	১ ঘনমিটার	৮,০০০/ থেকে ১০,০০০/	৪,০০০/
ঐ	২ ঘনমিটার	১৬,০০০/ থেকে ২০,০০০/	৮,০০০/

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিভিত্তিক বিভিন্ন সিস্টেম,তাদের দাম ও ভর্তুকীর পরিমান

সিস্টেম	কার্যকারিতা	দাম(টাকা)	ভর্তুকীর পরিমান (টাকা)
সৌরলণ্ঠন	প্রতিদিন ৪/৫ ঘন্টা আলো পাওয়া যায়	২১৭৬/	৫০০/
সৌর হোম লাইটিং সিস্টেম	প্রতিদিন ৪/৫ ঘন্টা আলো, পাখা, টিভি চালানো যায়।	২৭০/ প্রতি ওয়াটপিক্	সিস্টেমের দামের ৩০ শতাংশ
সৌর পথ আলোক ব্যবস্থা	প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে ভোর পর্য্যন্ত আলো পাওয়া যায়।	২০,০০০/	৯৬০০/
সৌর গরম জল ব্যবস্থা	প্রতিদিন ১০০ লিটার গরম জল পাওয়া যায়।	২৩,৩৫০/	৫০০০/
সোলার কুকার	৬-১০ জনের জন্য যেকোন রান্না ৩০/৪০ মিনিটে করা যায়।	৫০০০/	৫০০/
ব্যাটারী চালিত বাইক	সরকার নানারকম সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন।		

সাবসিডি এবং স্কিম সময়ে সময়ে বদলে যায় সঠিক এবং সাম্প্রতিকতম তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট দেখুন ঃ এবং ভর্তুকীর অনুমোদন পাওয়ার আগেই সিস্টেম বসিয়ে/কিনে নিলে; ভর্তুকী পাওয়া যাবে না।

সরকারী অনুদানপ্রাপ্তির নিয়মাবলী, যাবতীয় কারিগরী তথ্যাদি ও বিশদ অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

পশ্চিমবঙ্গ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা

জ-১/১০, ইপি ও জিপি ব্লক, সেক্টর-৫ সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১, ফোন ঃ ০৩৩-২৩৫৭-৫০৩৮ / ৫৩৪৮ / ৬৫৬৯

ANMOL®
The Right Bite
BISCUITS

www.anmolbiscuits.net

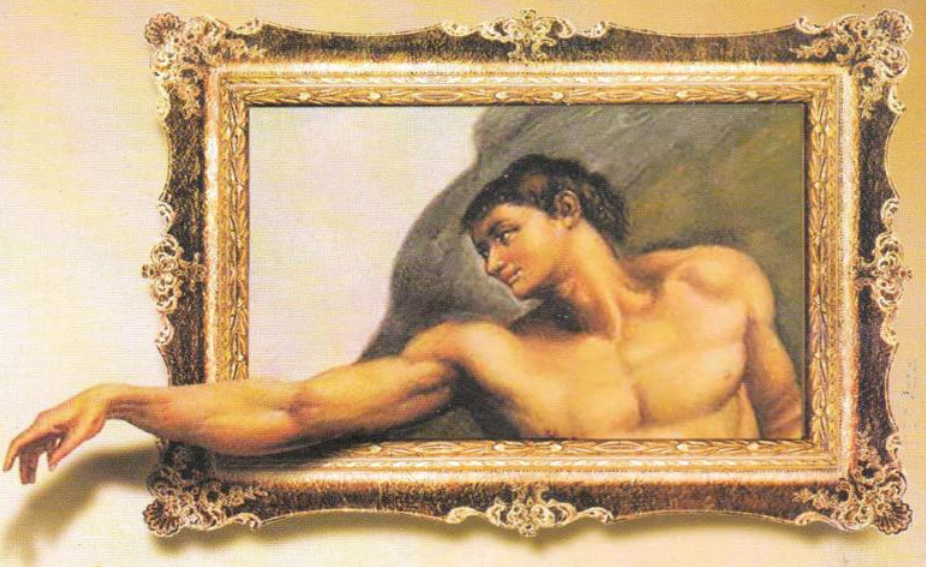

সুস্বাদু মাখনের
মোলায়েম প্রলোভন

সেই স্বাদ এবার নতুন প্যাকে